

দেবযান

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা



বি. র—(৮২)

ভূমিকা

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ গিরীজশেখর বসু একবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, লেখকরা যত চরিত্রই সৃষ্টি করুন না কেন—তা তাঁর নিজেরই চরিত্রের বা মনের এক একটা দিক। নিজের মানসিক গঠনের বাইরে কিছু কল্পনা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। Authors always re-create themselves. সুতরাং—একথা যদি সত্য বলে মানতে হয়, আর মানাই উচিত—বিভূতিভূষণের রচনাকে বুঝতে হ’লে আগে সে মানুষটাকে বোঝা দরকার।

বিভূতিভূষণ অবশ্য তাঁর রচনাতে কোথাও এ সত্য অস্বীকার করেন নি। লেখকরা সাধারণত নানারকম প্যাঁচ কষে নিজের চরিত্রের আড়ালে আত্মগোপন করার চেষ্টা করেন—যাতে তাঁকে এদের মধ্যে থেকে চিনে নিতে না পারা যায়, এইটাই হয় তাঁদের প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু বিভূতিভূষণ সে চেষ্টা আদৌ কোথাও করেন নি। আরণ্যকের সত্যচরণ তো সোজামুজিই তিনি—সে ছাড়াও কাল্পনিক চরিত্রের ক্ষেত্রেও তিনি পরিষ্কার ধরা দিয়েছেন। তাঁর অপু লেখকের নিজের চরিত্রের যতগুলি দোষ ও গুণ—আশা আকাজক্ষা—কল্পনা ভ্যানিটী দুর্বলতা নিয়েই গড়ে উঠেছে—শিশু থেকে বড় হয়েছে। শিশুর মতো উৎসুক ও সরল, জ্ঞানপিপাসু, সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত, বেহিসেবী, যে নির্দোষ মিথ্যা কথা বলতে ভালবাসে, যার নানারকম ছোট খাটো ভ্যানিটী আছে (তার মধ্যে রূপের গর্ব বা নিজের রূপ সম্বন্ধে উচ্চারণ প্রাধান্য), নারী-হস্তের সেবার প্রতি যার লোভ দৈহিক আকর্ষণের থেকে অনেক বেশী প্রবল, নারীর কল্যাণীরূপই যাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছে—এমন একটি মানুষই তাঁর উপন্যাসে গল্পে বার বার দেখা দিয়েছে—তা কে জানে পথের পাঁচালী, অপরাজিত আর কে জানে বিপিনের সংসার, দৃষ্টিপ্রদীপ, অথৈজল, ইছামতী!

অবশ্য কিছু কিছু বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা যে না করেছেন তা নয়—কেদার-রাজায় লম্পট বেশাঙ্গ রমণীলোভাতুর চরিত্র দেখানোর চেষ্টা করেছেন, বিপিনের সংসারের বিপিন প্রথম যৌবনে ফুটি করে পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়েছে—কিন্তু এ সব আত্মগোপনের ক্ষীণ প্রচেষ্টা নিতান্তই ছেলেমানুষীতে পর্যবসিত হয়েছে, আসল মানুষটি আসল চরিত্রের মধ্যে লম্পট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মুংশিল্লীরা যেমন একই ছাঁচের মুখে লক্ষী সরস্বতী শীতলা সব মূর্তিই তৈরী করেন—বিভূতিভূষণের কলমে গড়া মূর্তিদের মধ্যেও আদলটা একই থেকে গেছে। মূর্তির ক্ষেত্রেও যেমন এতে কোন অসুবিধা হয় না—বিভূতিভূষণের রচনার ক্ষেত্রেও তেমনি কোন অসুবিধা হয় নি, আদল বা মুখের ছাঁচ এক হ’তে পারে—তবু মূর্তিতে মূর্তিতে তফাৎ আছে বৈকি!

এর ব্যতিক্রমের মধ্যে আছে হাজারী ঠাকুর। তবু খুব একটা ব্যতিক্রম কি? লক্ষ্মীর ছাঁচে মুখটা তৈরী করে তাতে সিঁথে-চেরা চুল ও গৌর লাগিয়ে কার্তিক করলে যা দাঁড়ায়, তাই নয় কি? অশিক্ষিত রাঁধুনী বামুন—যার আশা আকাজক্ষা অবশ্যই সীমিত, তার স্বভাবকে

স্বাভাবিক করতে গেলে যেটুকু তকাং করতে হয় সেইটুকুই করেছেন লেখক—কিন্তু মূল আদলটার বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে কি? সবচেয়ে বড় কথা, সাধারণ দরিদ্র বা নিম্নমধ্যবিত্ত, অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি ভালবাসা, তাদের দারিদ্র্য-জর্জর জীবন-যাত্রার প্রতি লোভ। হ্যাঁ, আমি ইচ্ছে করাই এই শব্দটা ব্যবহার করছি—এই জীবনের প্রতি একটা লোভই ছিল তাঁর—নস্ট্যাগিজিয়া ছিল। দরিদ্র সংসারের কষ্টে সংগৃহীত আনাজে রান্না ডাঁটা-চচ্চড়ি, ডুগুর-কি খোড়-ছোটকি, কি স্বল্প তেলে পোড়া-পোড়া-করে-ভাজা পাকা কাঁচকলা তাঁর কাছে ধনীর গৃহের কালিয়া পোলাওর থেকে বেশী লোভনীয় ছিল। বাল্যে অভাবের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন বলেই তাঁর সুখাত্তের দিকে আকর্ষণ হয়ত একটু বেশী ছিল—পথের পাঁচালীর ‘সুখাত্তাধক্চি লুটির’ সৌরভ সবকে উচ্ছ্বাস অপূরনয়, লেখকের নিজেরই অন্তরের কথা—তাঁর সুখাদ্য-লোলুপতা নিয়ে তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে যথেষ্ট পরিহাসও করতেন, কিন্তু তবু আমি জানি, তাঁর কাছে এসব সুখাত্ত প্রিয় হ’লেও প্রিয়তর ছিল দরিদ্রের অতিকষ্টে অতি-যত্নে রান্না করা আপাত-সামান্য খাত্ত সামগ্রী! এর মধ্যে যে আন্তরিকতা সেইটেই তাঁর কাছে বেশী মূল্যবান ছিল।

নিম্নবিত্তদের প্রতি সহানুভূতি বা ভালবাসাই তাঁর সৃষ্ট কাহিনী—গল্প বা উপন্যাসের বড় কথা। শুধু তাই বা কেন, তাঁর দিনলিপি—যার মধ্যে তিনি নিজের সত্যের ধরা দিয়েছেন, তাতেও এই ভালোবাসাটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষদের প্রতি ভালবাসা আর ঈশ্বর-বিশ্বাস। কিন্তু শেষোক্ত কথায় আরও পরে আসছি।

ধনী-হুহিতা উচ্চশিক্ষিতা লীলার প্রতি প্রেম—অথবা বলা যায় অপূর প্রতি লীলার প্রেম—রোমান্সের রাজ্যে লেখকের বিধা-জড়িত সমস্কোচ পদক্ষেপ। সেই জন্তেই তা পূর্ণ-মুকুলিত হতে পারে নি। অন্তরঙ্গতা? তাও কি রাহুদি বা লীলাদি—কি অতলীর সঙ্গে যতটা স্বাভাবিক, সহজ, স্বতর্ক—ততটা? না। অপর্ণার সঙ্গে প্রণয়-সম্পর্ক যত মধুর—এই অপর্ণা যদি ধনীকন্যা হ’ত তাহলে ততটা হ’ত কিনা সন্দেহ। জানি না এই অপর্ণার সঙ্গে তাঁর প্রথমা স্ত্রী গৌরীর কোন সাদৃশ্য আছে কিনা, মানে চরিত্রগত—অথবা সবটাই কল্পনা, তবে পরবর্তী কালে শুনেছি সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রেী—সুন্দরী শিক্ষিতা বলেই তাঁর অপছন্দ হয়েছিল।

এই ব্যাপার সর্বত্রই কিন্তু। যেমন জীবনের ক্ষেত্রে তেমনই তাঁর সাহিত্যেও। দৃষ্টিপ্রদীপের আখড়ার মোহান্তকন্যা মালতী—যে পরে আখড়ার সর্বময়ী কত্রী হ’ল—রূপে গুণে চরিত্রের দৃঢ়তার শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মতোই বাস্তবীয়া, তার প্রতি জিতুর প্রেমের ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতেও চেয়েছেন লেখক, কিন্তু জিতুকে সেখানে বাঁধা যায় নি শেষ পর্যন্ত। ছোট-বৌ ঠাকরনের মতো মেয়েও জিতুর সহানুভূতি পেয়েছে, কিন্তু প্রেম পায় নি—পেয়েছে অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে হিরন্ময়ী। সহানুভূতিও ঢের বেশী পেয়েছে তার বৌদি—দীনদরিদ্র ঘরের মেয়ে। বই শেষ করতে গিয়ে বোধ হয় লেখকের মনে হয়েছে মালতীর প্রতি বড় অবিচার করা হয়ে গেল—তাই সর্বশেষ পরিচ্ছেদে একটা উচ্ছ্বাস দিয়ে বই শেষ করেছেন, অবিচারের ওপর একটু রঙের তুলি বুলিয়েছেন।

ঐশ্বর্য বা উচ্চশিক্ষাই শুধু নয়—কোন আড়ম্বর বা সমারোহই পছন্দ ছিল না বিভূতিভূষণের। সাধারণ দরিদ্র মানুষের ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষা ছোট ছোট আশা তাঁর কাছে অনেক বেশী মূল্যবান ছিল। যে কারণে তিনি দেশ থেকে কলকাতা আসার সময় সযত্নে পরিচিত ভদ্রলোকদের পরিহার করে ট্রেনের ভেড়ার কামরায় উঠে অনায়াসে সবজীওলাদের কাছে বিড়ি চেয়ে খেতেন, তাদের স্বথ-দুঃখের গল্প শুনে ভ্রমণের দুটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন সেই কারণেই তিনি ‘দ্রবময়ীর কাশীবাস’ গল্পে কাশীবাসিনী নিষ্ঠাবতী সেই ভদ্রমহিলাটির প্রতি অত অকরণ্য হ’তে পেরেছেন। সাধারণ ঘরোয়া বুদ্ধা দ্রবময়ীর দরিদ্র ঘরের সামান্য কলফুলুরী গাছপালা গোবর প্রতি আকর্ষণের জন্তেই বুদ্ধাটি তাঁর কাছে অসামান্য, ঐ পণ্ডিত অতিরিক্ত ‘ভক্তিমতী’ নীরজার থেকে বেশী অপন ও শ্রদ্ধেয়।

তাই বলে বৈষয়িক আসক্তিও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এই সব বন্ধ-জীবনের কথা লিখতে বসলেই তাঁর লেখনী ব্যঙ্গ ফুরার হয়ে উঠত। কেবলরাম কুণ্ড থেকে শুরু করে ‘কবি কুণ্ড মশাইয়ের’ সেই আড়তদার, যার বড় দুঃখ যে কিছু হজম হয় না—কাউকেই রেহাই দেন নি তিনি।

‘দেবযান’ বইটি বিভূতিভূষণের সমস্ত রচনার মধ্যে একেবারে দলছাড়া গোত্রছাড়া। এই-ই প্রথম একটা কাল্পনিক কৃত্রিম অবাস্তব পৃষ্ঠপট নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন তিনি। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্তও তাঁর প্রিয় জগৎকে এ থেকে বাদ দিতে পারেন নি, তাঁর নিজস্ব জীবন-দর্শনকেও না। বহু তথাকথিত বিদগ্ধ লেখক আছেন যারা বই পড়ে বই লেখেন, যারা পৃথিবীকে দেখেছেন অপরের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার মধ্য দিয়ে—বিভূতিভূষণ এ দলের লেখক ছিলেন না কোন কালেই। কিন্তু ব্যতিক্রম দিয়েই নাকি নিয়ম প্রমাণিত হয়—দেবযানও তাঁর সেই ব্যতিক্রম।

বিভূতিভূষণের প্রথম জীবনের জ্ঞান-পিপাসা ও কৌতূহল—সীমাবদ্ধ বলব না—প্রবলতর ছিল দুটি বিষয়ে, উদ্ভিদবিজ্ঞা ও জ্যোতিষতত্ত্ব। প্রকৃতির প্রতি তাঁর যে অমুরাগ—শৌখিন নয় তাও, বহুপ্রকৃতি—আশ-শাওড়া, ঘেঁটুফুল, তিপ্পল্লা, বনসিম, কৈয়োকাকা প্রভৃতি অখ্যাত অনাদৃত বনফুলের প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রেমের মতোই আবেগময়—এই অমুরাগই তাঁকে সমগ্রভাবে উদ্ভিদতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। বিভূতিবাবু যত রকম উদ্ভিদের ল্যাটিন নাম জানতেন, তত এই বিজ্ঞার কোন অধ্যাপকেরও মুখস্থ থাকে কিনা সন্দেহ। জ্যোতিষতত্ত্ব সম্বন্ধে আগ্রহ ও কৌতূহলও অত্যন্ত প্রবল ছিল তাঁর। অসীম অনন্ত বিশ্বের রহস্য তাঁকে বিম্বিত ও মুগ্ধ করত। বহু রাত্রির বিন্দ্র প্রহর আমাদের কেটেছে তাঁর সঙ্গে আলোচনায়—সে সময় লক্ষ্য করেছি, জ্যোতিষমণ্ডলীর-রহস্যের কথা বলতে বলতে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন, তখন যেন নিজেই নিজে বলতেন, বোঝাতেন, দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সেখানে বাঙলা হয়ে পড়ত।

এই অনন্ত বিশ্বের রহস্য উপলব্ধি করতে করতেই, সম্ভবত যতই এ রহস্যে প্রবেশ করেছেন

ততই মুগ্ধ বিস্মিত—শেষ পর্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, মনে হয়েছে এই ধারণাভীত বিপুল (—কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় একে ?) বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা কে, বীর ইচ্ছার ও নির্দেশে সীমাহীন পরিধিহীন বিশাল নীহারিকা এই লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র, কোটি কোটি তারকাপুঞ্জের জন্ম দিচ্ছে অথচ যে সব নক্ষত্রের মধ্যেও অযুত অযুত ঘোজনের ব্যবধান ! মন আপনিই বার বার নত হয়েছে তাঁর চরণে ।

এবং এই ঈশ্বর-বিশ্বাসই ক্রমে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে পর্যবসিত হয়েছিল ।

এ প্রেম যত দৃঢ় হয়েছে, ততই পার্থিব সমস্ত কামনা বাসনা লোভ থেকে তাঁর মন সরে এসেছে । তার চেয়েও বড় কথা—অভিমান-শূন্য হ’তে পেরেছেন । তাঁর কোন প্রধান রচনাকে কেউ নিন্দা করলে অনারসে হেসে ‘চান করুক গে যাক্’ বলে উড়িয়ে দিতে পেরেছেন । বোধকরি চোদ্দটি তালি দেওয়া কেড্‌স্‌ জুতো পায়ে দিয়ে তাঁর জন্তে বিশেষ-ব্যবহার-প্রেরিত গাড়িতে উঠে সভাপতিত্ব করতে যেতে পেরেছেন ; কয়েক হাজার টাকার নোট কীটদষ্ট হয়েছে, হাজার দুই-তিন টাকার চেক তারিখ পেরিয়ে বাতিল হয়ে গেছে, সে ঘটনাকে স্মিত হাস্তে পরমুহূর্তেই মন থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছেন ; তাঁর আমলে টাকার অনেক মূল্য ছিল ভবু পয়তাল্লিশ টাকা বেতনের ইন্সপেক্টর মাস্টারের পকেটে সাতশ টাকার নোট সাত মাস পড়ে থেকেছে—সেটা তুলতে বা কাঁকেও বলতে মনে পড়ে নি ।

জ্যোতিষতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্বের মতো আরও একটি বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ছিল, সেটা হচ্ছে পরলোকতত্ত্ব । এ বিষয়ে বিস্তর পড়াশুনো করেছেন, যখনই খেখানো কোন বই বা প্রবন্ধের সন্ধান পেয়েছেন—তা সংগ্রহ ক’রে পাঠ করেছেন, ফলে কৌতূহল নেশায় পরিণত হয়েছে । মাহুঘের মৃত্যুর পরও তার সেই বিশেষ আত্মার অস্তিত্ব থাকে, সে আত্মার সঙ্গে এই পৃথিবীর যোগাযোগ থাকে, এবং কেউ কেউ আবার জন্মান্তর গ্রহণ করে—এটা তিনি সম্ভবত বিশ্বাস করতেন । ‘সম্ভবত’ বলছি এই জন্তে যে, এই জিনিসগুলো ঠিক কেউ নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে পারে কিনা সন্দেহ আছে । শুনেছি যে বিখ্যাত নাস্তিক হার্বার্ট স্পেন্সার, ঈশ্বর যে নেই সারা জীবন এই সভ্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, সেই ব্যক্তিই মৃত্যুকালে ‘যদিই ঈশ্বর থাকেন তো’ তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন । বিভূতিবাবুও আমাদের কাছে যে পরিমাণ উৎসাহ সহকারে বিভিন্ন পুঁথিপত্র নজিরের সাহায্যে পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন—তাতে মনে হয় তাঁর নিজের মনে একটু সন্দেহের বীজ কোথাও থেকেই গিয়েছিল । যা মাহুঘ তর্কাতীতভাবে সত্য বলে জানে তা প্রমাণ করার জন্তে এত কাণ্ড করে না । আর, এ সন্দেহ তো স্বাভাবিকও ।

সে যাই হোক, জ্যোতিষতত্ত্ব আলোচনা এবং পরলোকতত্ত্ব ও ঈশ্বরে বিশ্বাস এই তিনেরই কলঙ্ক—‘দেবদান’ গ্রন্থের সৃষ্টি । তাঁর ডায়েরী পড়লে জানা যায় যে দেবদানের পরিকল্পনা বহুদিন থেকেই বীজাকারে তাঁর মাথায় ছিল হয়ত সেই ‘পথের পাঁচালী’ রচনার আমল থেকেই, শুধু—বোধকরি ভাল করে ভেবে-চিন্তে লিখবেন বলেই—দীর্ঘকাল ভাবনার মধ্যে এই কল্পনাটাকে জীইয়ে রেখেছিলেন, অথবা অন্ত অপেক্ষাকৃত সহজ রচনার তাগিদেই এই রচনা

ক্রমাগত পিছিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত বর্তমান নিবন্ধকারের নির্বন্ধেই তিনি এই রচনার হাত দেন।

কারও কারও মতে—তার মধ্যে বিভূতিবাবুর ভক্তরাও আছেন অনেকে—এই বই লেখা তাঁর উচিত হয় নি। এ তাঁর মতো লেখকের অল্পপযুক্ত, এ বই লিখে তিনি নাকি হাশাস্পদ হয়েছেন।...

আমি সামান্য ব্যক্তি, তবু ভরসা করে ইতিপূর্বেও প্রতিবাদ করেছি, এখনও করছি। আমার মতে এ বই তাঁর এক অপূর্ব সৃষ্টি।

কল্পনার বিশালতা ও বৈচিত্র্য ছাড়াও এর মধ্যে তিনি যে কারিগরির পরিচয় দিয়েছেন তা এক মহান লেখকের পরিণত লেখনী ছাড়া সম্ভব হ'ত না। কী অনায়াসেই তিনি এর মধ্যে স্বর্গমর্ত্যকে মিলিয়েছেন, সম্পূর্ণ বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য ভাবে। কত সহজে ছুটি সুরকে একই যন্ত্রে ধরেছেন! মৃত্যুর পরেও মানুষ্যের মানসতা বদলায় কিনা এ সত্য প্রমাণ করা সম্ভব নয় কিন্তু লেখক যে ছবিগুলি আঁকেছেন—যেমন পুষ্পের প্রেমের একনিষ্ঠতা এবং যতীনের দোলাচল-চিন্তিতা, কেবলরাম কুণ্ডুর কাশবান্ধর পাশে বসে থাকা, রামলালের স্ত্রীলোক অন্বেষণ—তাতে পাঠকদের এ মত সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করতে কোন অস্ববিধা থাকে না। যতীন জীবিতকালে যা ছিল মরার পরও তাই অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত যখন পুষ্পের কাছে থাকে তখন একরকম, পুষ্প সরে গেলেই পৃথিবী ও অবিশ্বাসিনী স্ত্রী আশা তাকে দুর্বীর আকর্ষণে টানে, সে স্থির থাকতে পারে না। আশা তাকে ত্যাগ করে এসেছিল, খবর নিতে গেলে দেখা করে নি—এক লম্পটের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে মা ছেলে-মেয়ে সব ছেড়ে অকূলে ভেসেছে—ওৎসঙ্গেও—হয়ত বা সেই জন্তেই—আশার প্রতিই তার আকর্ষণ সমধিক। পুষ্পকে সে ভালবাসে—কিন্তু পুষ্প তার মানসতার অনেক উর্ধ্বে, ওকে যেন ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে পায় না যতীন। আশা তার মানসিক স্তরের মানুষ, আশাকে তাই কামনা করা যায়, সন্তোষ করার কথা কল্পনা করা যায়। যে কারণে ‘শেষের কবিতা’র লাভণ্যকে ঘরে আনা যায় না, সে সরোবর, তাতে মন সাঁতার কাটতে পারে কিন্তু ঘর করার জন্তে কেটির মতো ঘড়ায় তোলা জল দরকার—সেই কারণেই পুষ্পকে ভালবাসলেও ঘর করার জন্তে, কামনা করার জন্তে আশাকে দরকার।

এই বইতেও বিভূতিবাবুর সেই দরিদ্র সংসারের প্রতি লোভই যতীনের মনোভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মোক্ষ নয়—জন্মান্তর-গ্রহণেই তার আগ্রহ বেশী, কোলাবলরামপুরের দুঃখিনী মা, যে নিজেই খেতে পায় না, কলাইয়ের ডাল, মোচা ছেঁচকি ও কাঁচকলা ভাজা যার রাজভোগ—গেরস্তালী বলতে যার সখল ময়লা কাঁথা, ছেঁড়া মাদুর ও মাটির হাঁড়িকুড়ি—তার কোলেই পুনরায় জন্ম নিয়ে সুখে দুঃখে বড় হয়ে উঠবে, বড় হয়ে রোজগার করে ভান্সাবাড়ি সারাবে, সজ্জনতলায় পাকা রান্নাঘর করে দেবে, মাকে ছল গাড়িয়ে দেবে, তাঁর সেবা করবে—যতীনের এই ইচ্ছাই প্রবল। তার মনে হয়, ‘পুষ্প তাকে যতই টানুক, উচ্চস্বর্ণের উপযুক্ত নয় সে। মাটির পৃথিবী তাকে স্নেহময়ী মায়ের মত আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় শত বন্ধনে। তার মনে

অহুভূতি জাগায় এই সংসারের শত শত সুখ দুঃখ, আশাহত অসহায় নরনারীর ব্যথা।' যতিনের এ মনোভাব লেখকের নিজেরই।

‘তাই এই মাত্র অন্ধকারে কাছারীর পথ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিলাম, ভগবান আমি তোমার অস্ত্র স্বর্গ চাই না—তোমার দেবলোক পিতৃলোক বিষলোক—তোমার বিশাল অনন্ত নক্ষত্রজগৎ তুমি পুণ্যাত্মা মহাপুরুষদের জন্তে রেখে দিও। যুগে যুগে তুমি এই মাটির পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে এস, এই ফুলকল, এই ছুখছুখের স্মৃতি, এই মুগ্ধ শৈশবের মায়াজগতের মধ্যে দিয়ে বার বার যেন আশাযাওয়ার পথ তোমার আশীর্বাদে অক্ষয় হয়।’ (স্মৃতির রেখা)

‘এই পঞ্চাশ বাট বছরের এবারকার মতো জীবনেই কি সারা জীবন ফুরিয়ে গেল? এই ছুপুর, এই প্রথম বসন্তের আবেশ, এই নীল আকাশ, এই বাঁশের শুকনো পাতা ও খোলার আছান, তেলাকুচোলতার ছলুনি—এসব যে বড় ভাল লাগে।’ (স্মৃতির রেখা)

‘কোথায় লেখা থাকবে তার তিন হাজার বৎসর পূর্বের এক বিস্মৃত অতীতের সেসব আনন্দভরা জীবনযাত্রা, বছরদিন পরে বাড়ি ফিরে মায়ের হাতে বেলেরপানি খাওয়া মধুময় অপরাহুটি, বাঁশবনের ছায়ায় অপরাহুের নিজা ভেঙ্গে পাপিয়ার সে মনমাতানো ডাক, গ্রাম্য নদীটির ধারে শ্রাম তৃণদলের উপর বসে বসে কত গান গাওয়া, কত আনন্দকল্পনা, এক বৈশাখের রাত্রিতে প্রথম বর্ষণসিক্ত ধরণীর সেই মুহূক্ষুগন্ধ যা তার নববিবাহিতা তরুণী পত্নীর সঙ্গে সে উপভোগ করেছিল?’ (স্মৃতির রেখা)

কে জানে এই জন্মের এই জীবনের প্রতি লোভ ও নষ্টাল্জিয়াই তাঁকে পরজন্মে বিবাসী করেছিল কি না। আবার ফিরে আসবেন, পাঁচশো বছর পরে হোক কি তিন হাজার বছর পরেই হোক, একদিন আবার অন্তত এমনি এক পল্লীবধুর ঘরে জন্মগ্রহণ করে সামান্ত সাধারণ জীবনের রসাস্বাদ করবেন—এ আশ্বাস অবলম্বন না করলে বোধকরি হাঁপিয়ে উঠতেন—তাই নিজের গরজেই সেই আশাটিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন হয়ত—

‘আমি এই যাওয়া-আসার স্বপ্নে ভোর হয়ে বড় আনন্দ পাই। আবার যে আসতে হবে তার পর, তাও আমি জানি।...আবার বছর জন্মান্তরে হয়তো ফিরতে হবে। পাঁচশো বছর পরের সূর্যের আলোকে একদিন অসহায় অবোধ শিশু-নয়ন ছুটি মেলবে। পাঁচশো বছর পরের পাখীর গান, ফুলবন, জ্যোৎস্না আবার আমাকে অভির্থনা করে নেবে। কোন্ অজানা দেশের অজানা পর্ণ-কুটিরের কোন্ অজ্ঞাত দেশের অজ্ঞাত ছায়াঝোপের তলে মাঠে বনে মুগ্ধ শৈশব কাটিয়ে—অনাগত মা-বাবার স্নেহের স্রাব্য মাছুষ হবে।’ (স্মৃতির রেখা)

এদিক দিয়ে লেখকও হয়ত ছিলেন ঘোর বদ্ধ-জীব, এই জীবনের আসক্তিতেই বদ্ধ।

বিভূতিভূষণের আর একটি জীবনশর্ত ছিল—গতি।

অচল অনড় স্থাপু জীবন তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। অনেক দেখব, কেবল ঘুরে বেড়াব, আরও দেখব, আরও। দেশ বিদেশ, বিশ্ব—এই ছিল বাল্যকাল থেকে তাঁর

স্বপ্ন, তাঁর ধ্যান। সেই স্বপ্ন-কল্পনা তার রচনার ছত্রে ছত্রে তাঁর কল্পিত চরিত্রের স্বভাবে—
তাঁর নিজের জীবনেও প্রতিকলিত হয়েছে।

ছেলেমেয়েদের অটোগ্রাফের খাতায় চিরদিন তিনি একই motto লিখে গেছেন—‘গতিই
জীবন, গতির দৈন্তই মৃত্যু’। তাঁর পথের পাচালীও শেষ হয়েছে সেই অসীম পথের ইঙ্গিত
দিয়ে—‘পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে... দেশ ছেড়ে বিদেশের
দিকে, স্বর্ষ্যোদয় ছেড়ে স্বর্ষ্যাস্তের দিকে, জানার গভীর এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে... চল
এগিয়ে যাই।’

তাঁর দিনলিপিতেও এই এগিয়ে চলার সুর পাই বার বার :

‘মাল্লুসকে শুধু চলতে হবে, চলাই তার ধর্ম। পথের নেশা তোমাকে আশ্রয় করুক।
যুগে যুগে তোমাকে আসতে যেতে হবে—পথের বাঁকে বাঁকে ডালি সাজিয়ে তোমার জন্তে
অপেক্ষা করছে—অনন্ত জীবনপথে কতবার তুমি তাদের পাবে, আবার পেছনে কেলে চলে
যাবে—আবার পাবে।... চরণ বৈ মধু বিন্দুতি।... জীবনে অনন্তকে চিনতে হবে... গতির মধ্যে
দিয়ে অনন্তের স্বরূপ চোখে ধরা দেবে। হে জীবন পথের পথিক পথের ধারে ঘুমিয়ে পড়ো না।’

‘নির্জন গ্রহের নির্জন পর্বতে যুগ যুগ অক্ষয় তরুণ দেবতার কথা মনে পড়ে... সম্মুখে তার
বিশাল অজানা বিশ্ব। দেবতা হয়েও সব জানে নি।’

‘অশান্ত প্রাণ-পাখী আর মানে না—সব দিকের বন্ধনহীন, নিঃসঙ্গ, উদাস, অনন্ত, অকুল
নীলব্যোমে মুক্তপক্ষে ওড়বার জন্তে ছটফট করছে—উড়তে চায় উড়তে চায়—পরিচিত বহুবার-
দৃষ্ট একঘেয়ে গতাল্লগতিক গভীর মধ্যে আর নয়,..... হয়তো দূরে দূরে কত শ্যামসুন্দর
অজানা দেশ সীমা—তুহিন শীতল ব্যোমপথে দেবলোকের মেরু পর্বত। আলোর পক্ষে
ভর দিয়ে শুধু যেখানে পাওয়া যায়, অজ্ঞতাবে নয়।..... জীবনটাকে বড় করে উপভোগ
করো, খাঁচার পাখীর মতো থেকো না।’

[উপরের উদ্ধৃতিগুলি ‘স্মৃতির রেখা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত]

লেখকের এই মানসব্যক্তিত্ব, এই আশা ও আকুতিই দেবযানের পথিক দেবতা হয়ে দেখা
দিয়েছে। যে দেবতা লক্ষ লক্ষ আলোক-বর্ষ ধরে শুধুই ঘুরে বেড়াচ্ছেন :

‘দেবতা তাঁর ভ্রমণের কাহিনী বলতে লাগলেন।... কত লক্ষ বৎসর পূর্বে তিনি বেরিয়ে-
ছেন বিশ্বভ্রমণে। কত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রজগৎ, কত ছায়াপথ, নীহারিকাপুঞ্জ মানসগতিতে
ভ্রমণ করেছেন। আলো বা বিদ্যুতের যেখানে পৌঁছতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগে—সে সব
সুন্দর নক্ষত্রমণ্ডলী পার হয়েও লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের অঞ্চলে চলে গিয়েছেন। তখনও
দেখেছেন বহু দূরে আর এক অজানা বিশ্বের সীমা মহাশূন্যের প্রান্তে আবছায়া দেখা যায়।
আবার সে বিশ্বেও পৌঁছেছেন... আবার দূরে দেখতে পেয়েছেন আর এক রহস্যময় অজ্ঞাত
বিশ্বের ক্ষীণ সীমান্তবর্তী ক্ষীণালোক তারকামণ্ডলী।’ (দেবযান ১ম সংস্করণ ৩৯ পৃঃ)

এছাড়াও আর একটি জিনিস আছে দেবযানের মধ্যে, ধর্মীচরণ ও উপাসনা সম্বন্ধে তাঁর
নিজস্ব ধারণা। সাধারণ অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ধর্মীচরণে বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি। প্রেম

ভক্তিতে তাঁর আস্থা ছিল বেশী; সেদিক দিয়ে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীকে তাঁর ক্ষেমদাস বার বার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন তাই, পাঠক তথা পুস্তকে বার বার নিয়ে গেছেন আচার্য রঘুনাথ দাসের কল্লনাফট আশ্রমে, নিয়ে গেছেন বৃন্দাবনে—গোপালমন্দিরে।

(বৃন্দাবনের প্রধান মন্দির যদিচ গোপালমন্দির নয়—গোবিন্দর মন্দিরই। লেখক সম্ভবতঃ বৃন্দাবনে যান নি, গোপালমূর্তির প্রতি তাঁর নিজের আকর্ষণই গোপালমন্দির কল্লনা করিয়েছে। বৃন্দাবনের যা প্রধান দর্শন—গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, বন্ধু বিহারী, কৃষ্ণচন্দ্র, শৃঙ্গার বট, বংশীবট, নিকুঞ্জবন, রাধাবল্লভ, রাধারমণ—সব কটিতেই বংশীধারী কৃষ্ণমূর্তি আছেন। সম্ভবত লেখকের পুত্রাকাজ্জাই ভগবানকে গোপাল মূর্তিতে কল্লনা করতে চাইত। পুরীতে একটি মঠ দর্শন করতে গিয়ে গোপাল মূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, বর্তমান নিবন্ধ-লেখককে বলেছিলেন, ‘আমার বড় ইচ্ছে করছে ওর গালে আঁস্তে একটি চড় মারি।’ সময় পেলেই এই মঠে যেতেন গোপালমূর্তি দর্শন করতে।)

অবশ্য এ ব্যাপারে মনে হয় লেখকের চিন্তার কিছু অস্বচ্ছতা আছে। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের মধ্যে পড়ে তিনি যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, ঠিক কোনটিকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করবেন তা স্থির করতে পারেন নি। এই দ্বিধা, চিন্তার এই অস্বচ্ছতা, তাঁর পরবর্তী প্রধান উপস্থাপন ইছামতী গ্রন্থেও দেখতে পাওয়া যায়। ইছামতীর ভবানী বাঁড়ুঘো লেখকেরই পরিণত মানসমূর্তি। ভবানীর তিন স্ত্রী গ্রহণও যদি তাঁর মানসিক চিন্তারই কিছুটা বহিঃপ্রকাশ বলি, খুব বোধহয় অসমসাহসিক ভাষণ হবে না। অবধূত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু যখন সংসারাত্মম নির্দেশ করেন তখন নিতাই একই সঙ্গে দুটি বোনকে বিয়ে করেন। ভবানী বাঁড়ুঘোও সন্ন্যাসী ছিলেন, পঞ্চাশ বছর বয়সে বিয়ে করতে এসে একই সঙ্গে তিনটি বোনকে বিবাহ করে ফেললেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ভবানীচরিত্র সৃষ্টি করার সময় নিত্যানন্দের কথাই তাঁর মনে ছিল।

কিন্তু বিভূতি বাঁড়ুঘোও দীর্ঘকাল অবিবাহিত (বিপত্নীক বলা উচিত নয়—এতই অল্পদিনের প্রথম বিবাহিত জীবন) ভবঘুরে জীবন যাপন করার পর সাতচল্লিশ বছর বয়সে বিবাহ করেন। কে জানে, নিজের বিবাহের সময় জীবনসঙ্গিনী বাছবার প্রস্নে মেয়েদের তিনটি মূর্তি—সেবিকা, গৃহিণী ও নর্মনহচরী—তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে চিন্তিত ও দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছিল কিনা, কোনটি তাঁর জীবনে শান্তি এনে দেবে স্থির করতে না পেরে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন কিনা! অথবা সেই সময়কার সমাজ-জীবন দেখাবারই নিছক প্রচেষ্টা এটা। কিম্বা বিশুদ্ধ রসিকতা।

আমরা অবশ্য আলোচনা করছিলাম দার্শনিক অস্বচ্ছতার কথা। কিন্তু তবু মনে হয় এ বইতে লেখক প্রেমভক্তির দিকেই আরও বেশী করে ঝুঁকেছেন। যিনি ভাবেছেন—

‘আজ নিভৃত নিশুর রসে তাঁর অন্তর অমৃতময় হয়েছে বলে তাঁকে বার বার মনে হতে লাগল। রহস্যময় ও বটে মধুর ও বটে। মধুর ও রহস্যময় ও বিরাট ও সুন্দর ও বড় আপন

সে দেবতা। একমাত্র দেবতা, আর কেউ নেই। যিনি অশব্দ অস্পর্শ অব্যয় অরস ও অগন্ধ, অনাদি ও অনন্ত, তাঁর অপূর্ব আবির্ভাবে নৈশ আকাশ যেন থম থম করচে।’

‘ভবানী বাঁড়ুযো মুখ হয়ে ভাবেন, কোন মহাশিল্পীর সৃষ্টি এই অপরূপ শিল্প, এই শিশুও তার অন্তর্গত। এই বিপুল কাকলীপূর্ণ অপরাহ্নে, নদীজলের স্নিগ্ধতার শ্রীভগবান বিরাজ করছেন জলে স্থলে উর্ধ্বে অধে, দক্ষিণে উত্তরে, পশ্চিমে পূর্বে। যেখানে তিনি সেখানেই; এমন সুন্দর শিশু অনাবিল হাসি হাসে, এমন সুন্দর বসন্তবোরী পাখীর হলুদরঙের দেহের ঝলক ফুটে ওঠে।... তাঁর বাইরে কি আছে? জয় হোক তাঁর।’

তিনিই আবার বলছেন—

‘কেবল থাকবেন তিনি। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তনীয়, সমস্ত গতির মধ্যে স্থিতিশীল তিনি। ঈশ্বর, ব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, এ মানুষের মনগড়া কথা। সেই জিনিস যা এমন সুন্দর অপরাহ্নে, ফুলে, ফলে, বসন্তে, লক্ষ লক্ষ জন্মমৃত্যুতে, আশায় স্নেহে, দয়ায় প্রেমে আবছায়া ধরা পড়ে, জগতের কোন ধর্মশাস্ত্রে সেই জিনিসের স্বরূপ কি তা বলতে পারে নি, ...তবু মনে হয় তিনি যত বড় হোন, আমাদের সগোত্র। আমার মনের সঙ্গে এই শিশুর মনের সঙ্গে সেই বিরাট মনের কোথায় যেন যোগ আছে। ভগবান যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন শুধু, তা নয়—আমি তাঁর আত্মীয়—খুব আপন ও নিকটতম সম্পর্কের আত্মীয়। কোটি কোটি তারার ছাতিতে ছাতিমান সে মুখের দিকে আমি নিঃসঙ্কোচে ও প্রেমের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবার অধিকার রাখি, কারণ তিনি যে আমার বাবা।’

জ্ঞানী ভবানী বাঁড়ুয্যের পক্ষে প্রেম-ভক্তিতে এর থেকে বেশী বিহ্বল হওয়া সম্ভব নয়।

‘দেবদান’ প্রসঙ্গে ‘ইছামতী’র উল্লেখ হয়ত একটু অবাস্তব হুয়ে পড়ল, তবে এই দুই বইয়ের মধ্যে সামান্য একটু যোগসূত্রও আছে। আমার বিশ্বাস—‘দেবদান’ লেখার পরও লেখক নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি, তাঁর মনে হয়েছে যে সব কথা এখনও বলা হয় নি—তাই ‘ইছামতী’র গ্রাম্য পৃষ্ঠপটে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে তথা লেখকের মানসমুতিকে টেনে এনেছেন।

এই খণ্ডে যে তিনটি গল্পগ্রন্থ স্থান পেয়েছে ‘উপলব্ধ’, ‘বিধু মাষ্টার’ ও ‘ছায়াছবি’, তার মধ্যে ‘ছায়াছবি’ লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত। যে গল্পগুলি এদিক ওদিক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ছড়িয়ে পড়েছিল—যে সম্বন্ধে তিনিও সত্যটা সচেতন ছিলেন না বোধহয়—সেইগুলিই প্রধানত তাঁর আত্মীয় শ্রীমান চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের উত্তম সংগৃহীত ও ছায়াছবি নামে প্রকাশিত হয়। এর গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখ্য এক ‘মরকোলজী’—বাকীগুলি পড়লে মনে হয় কিছুটা অবহেলায় অনাদরে লেখা—নিতান্তই পত্রিকা-সম্পাদকদের কড়া তাগিদে, সমরভাবে মধ্যে দ্রুত লিখতে হয়েছে। এক আখটি গল্পে—যেমন ‘অভয়ের অনিদ্রা’—তাঁর বৈশিষ্ট্য বা মূদ্রাদোষগুলিরও চিহ্ন দেখা যায় না।

কিন্তু ‘উপলখণ্ড’ তা নয়। এর বেশির ভাগ কাহিনীতে বিভূতিভূষণের পরিণত লেখনীয় ছাপ আছে। বিশেষ করে ‘আত্মান’ গল্পটি বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্ততম বলেই গণ্য হবে চিরকাল। গ্রন্থপঞ্জী-লেখক বলেছেন এমন একটি স্ত্রীলোককে তিনি জানতেন; কেউ কেউ বলেন হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্তই বিশেষ ভাবে এটি লেখা—তবে কল্পনাই হোক আর সত্যই হোক, রচনাটি যে প্রথম শ্রেণীর গল্প হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। বিভূতিভূষণের সহজাত মানবতা-বোধ ও দরিদ্র সরল সাধারণ মানুষদের প্রতি ভালবাসা এতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এই কাহিনী অবলম্বন করে পরে একটি পূর্ণাঙ্গ সার্থক চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছিল।

‘একটি ভ্রমণ কাহিনী’ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মুহূর্ত কৌতুক-বোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন! একটা কথা বলা এক্ষেত্রে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই গল্পটির বীজচিন্তা আমাদের সামনেই পরিকল্পিত হয়। দিক-ঘোষের স্নহৃদগোষ্ঠির মধ্যে সেই সময়টা প্রায়ই বিদেশ ভ্রমণের জল্পনা হ’ত, কাগজ কলম নিয়ে বসে নানা হিসাব ও কর্দ হ’ত প্রত্যেক দিন। বেশির ভাগ সে ভ্রমণই কল্পনাতে থেকে যেত শেষ পর্যন্ত। একদিন এমনি এক আলোচনার মধ্যে—এই শেষ অবধি না যাওয়ার কথা নিয়ে কে একজন বিজ্ঞপ করাতে বলে উঠলেন, ‘ঠিক হয়েছে, আমি একটা গল্পের প্লট পেয়ে গেলাম “একটি ভ্রমণ কাহিনী” বলে একটা গল্প লিখব।’

এইভাবেই একদিন এক বন্ধুপত্নীর সঙ্গে কৌতুক প্রসঙ্গে তিনি ‘তাঁর ভালো মনোহরপুর খারাপ মনোহরপুর’ কল্পনা করেন।

উপলখণ্ডের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিচিত্র কাহিনী হল—‘নম্রামা ও আমি’। এতে বিভূতিভূষণের সমস্ত ভঙ্গী বজায় থেকেও এটি ভিন্ন স্বাদের গল্প হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তারাকঙ্করের ‘হাসুলী বাঁকের উপকথা’র যে পুরুষটি মেয়ে সেজে ঘুরে বেড়ায়— সেও নিজেকে পরিচয় দেয় নম্রালা বলে।...

এই গ্রন্থের শেষ গল্প ‘আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা’ আর একটি কৌতুক-রসের গল্প। কিস্টারদের দেখার জন্ত ভীড় ও মারামারি দেখেই এই ধরনের গল্প লেখার কথা মনে আসে। একদিন এমনি এক ভীড়ের প্রসঙ্গেই তিনি প্রথম বলেছিলেন “অথচ দেখুন এর মধ্যে এখানে যদি স্বয়ং আইনস্টাইনও এসে দাঁড়ান, কেউ পুঁছবে না!” তার অল্প কদিন পরেই এই গল্প লেখা হয়।

মোটের ওপর ‘উপলখণ্ড’ তাঁর কয়েকটি সার্থক—এবং নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গীর গল্প-সঙ্কলন।

অখ্যাত, অপেশাদার লেখক, যাদের রচনার কোন দিন পাঠকদের চোখের আলো পড়ল না, যারা কি লিখেছে, কী তার মূল্য তাও বোঝে না—তাদের প্রতি মাঝে মাঝে কোথাও সন্নেহ কৌতুক কি সপ্রশ্রয় বিরক্তি প্রকাশ করলেও—তাদের সেই নির্ভা ও সাহিত্যপ্ৰীতিকে বিভূতিবাবু আন্তরিক শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন। ‘বিধু মাষ্টার’ গ্রন্থের ‘কবিকুণ্ড মশায়’ সেই মনোভাবেরই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ‘বেচারী’ ও ‘অসমাপ্ত’ দুটিই লেখকের টিপিক্যাল গল্প।

‘অভিশাপ’ বিভূতিবাবুর লাইন ছাড়া, এ ধরনের গল্প তিনি লিখতেন না, হয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হিসেবেই লিখতে শুরু করেছিলেন। ‘সুলোচনার কাহিনী’ লেখকের নিজের প্রিয় গল্প ছিল, গল্প হিসেবেও এটি এবং ‘সুহাসিনী মাসীমা’ উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের কাহিনী যে গল্প হয় তা বিভূতিবাবু ছাড়া কেউ ভাবতেও পারত না। ‘মুলো—র্যাডিশ—হর্স র্যাডিশ’ তাঁর তামাশা-প্রিয়তার নিদর্শন। যার কথাবার্তা বা আচরণে বিরক্ত হতেন—তাঁর সম্বন্ধেও লেখকের মনে একটু স্নেহের স্থান থাকত—এই-ই বিভূতিবাবু। ‘বাক্স-বদল’ নিতান্ত সাধারণ কাহিনী এবং অতি পুরাতন ‘টুক’—দৈব-যোগাযোগের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এই ধরনের কাহিনী বিভূতিবাবু ছাড়া আর কারও হাতে গল্প হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ। বিভূতিবাবুর অনাড়ম্বর রচনাকৌশল, যা পড়লে একবারও মনে হয় না যে তিনি কোন গল্প লেখার চেষ্টা করছেন—অথচ যে সম্বন্ধে তিনি অতি সচেতন ছিলেন (যাঁরা তাঁকে অসচেতন শিল্পী বলেন—Unconscious artist—তাঁরা বিভূতিবাবুকে কিছুই বোঝেন নি), তা ছিল বিভূতিবাবুর ব্রহ্মান্দ, সেইখানেই বিভূতিবাবু সিদ্ধ শিল্পী। সে ধরনের লেখা আর কেউ এ দেশে আজ পর্যন্ত লেখেন নি, অন্য দেশে লিখেছেন বলেও জানি না, নাটকীয়তা না থাকা সত্ত্বেও মনে গভীর দাগকাটার মতো গল্প। এই শ্রেণীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্প হ’ল ‘তুচ্ছ’ (৭ম খণ্ড রচনাবলী দ্রষ্টব্য)।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

দেবযান

সৰ্ব্বাজীবে সৰ্বসংস্থে বৃহতে
অগ্নি হংসো ব্রাহ্মতে ব্রহ্মচক্রে...

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ব্রায়ং ভূত্বা ভবিষ্য বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ॥

—ভগবদ্গীতা

But Mind, Life and Matter, the lower trilogy, are also indispensable to all cosmic beings not necessarily in the form or with the action and conditions which we know upon earth or in this material universe, but in some kind of action however luminous, however puissant, however subtle. For Mind is essentially that faculty of super-mind which measures and limits, which fixes a particular centre and views from that the cosmic movement.

SRI AUROBINDO'S
The Life Divine, Vol. I.

Beyond these subtle physical planes of experience and the life-worlds there are also mental planes to which the soul seems to have an internal access...but it is not likely to live consciously there if there has not been a sufficient mental or soul development in this life....

We know that he creates images of these superior planes which are often mental translations of certain elements in them and erects his images into a system, a form in actual worlds ; he builds up also desire-worlds of many kinds to which he attaches a strong sense of inner reality.

Vol, III, p. 77.

We arrive then necessarily at this conclusion that human birth is a term at which the soul must arrive in a long succession of rebirths and that it has had for its previous and preparatory terms in the succession the lower forms of life upon earth....

"God is Love and object of Love. Divine Love is not a thing of God : it is God Himself. God needs us just as we need God. This universe is the mere visible tangible aspect of Love and of the need of love."

HENRI BERGSON

কুড়ুলে-বিনোদপুরের বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী রায়সাহেব ভরসারাম কুণ্ডুর একমাত্র কন্যার আজ বিবাহ। বরপক্ষের নিবাস কলকাতা, আজই বেলা তিনটের সময় মোটরে ও রিজার্ভ বাসে কলকাতা থেকে বর ও বরযাত্রীরা এসেচে। অমন ফুল দিয়ে সাজানো মোটর গাড়ী এদেশের লোক কখনো দেখেনি। পুকুরের ধারে নহবৎ-মঞ্চ নহবৎ বসেচে, রং-বেরঙের কাপড় ও শালু দিয়ে হোগলার আগর সাজানো হয়েছে। খুব জাঁকের বিয়ে।

রাত সাড়ে নটা। রায়সাহেবের বাড়ীর বড় নাটমন্দিরে বরযাত্রীদের খেতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা সকলেই কলকাতার বাবু, কুড়ুলে-বিনোদপুরের মত অজ্ঞ-পাড়াগাঁয়ে যে তাঁদের শুভাগমন ঘটেছে, এতে রায়সাহেব কৃতার্থ হয়ে গিয়েছেন, বার বার বিনীতভাবে বরযাত্রীদের সামনে এই কথাই তিনি জানাচ্ছিলেন। সভামণ্ডপ থেকে নানারকম শব্দ উঠিত হচ্ছিল।

—ও কি পাণ্ডশায়, না-না—মাছের মুড়োটা ফেললে চলবে না—

—ওরে এদিকে একবার ভাতের বালতিটা (অর্থাৎ পোলাওএর বালতি—পোলাওকে ভাত বলাই নিয়ম, তাতে সভ্যতা, স্মৃতি ও বড়মাছুষী ঢালের বিশিষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়) নিয়ে আয় না—এঁদের পাত যে একেবারেই খালি—সন্দেশ আর তুটো নিতেই হবে—আজ্ঞে না, তা শুনবেনা—বাটাছানার না হলেও পাড়াগাঁয়ের জিনিসটা একবার চেখে দেখুন দয়া করে—

ওদিকে যখন সবাই বরযাত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত, নাটমন্দিরের সামনের উঠানে একপাশে বিভিন্ন গ্রামের কতকগুলি সাধারণ লোক খেতে বসেচে। তাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র—সে অল্প লোকদের সঙ্গে নিজের পার্থক্য বজায় রেখে একটু কোণ ঘেরে বসেচে। বসলে কি হবে, এদের দিকে পরিবেশনের মাহুয আদৌ নেই—কলে এরা হাত তুলে খালি-পাত কোলে বসে আছে।

ব্রাহ্মণযুবকের নাম যতীন। পাশের গ্রামের বেশ সৎ বংশের ছেলে। বয়েস তার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। লোকটি বড়ই হতভাগ্য। বেশ সুন্দর চেহারা, লেখাপড়া ভালই জানে, এম্-এ পর্যন্ত পড়ে গান্ধীজীর নন-কো-অপারেশনের সময় কলেজ ছেড়ে বাড়ী আছে। বিবাহ করেছিল, কয়েকটি ছেলেমেয়েও আছে, আজ কয়েক বৎসর তার স্ত্রী তার সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে উঠেচে। এখানে নিজেও আসে না, ছেলেমেয়ে-দেরও আসতে দেয় না। যতীনের বাপ-মা কেউ জীবিত নন—সুতরাং বড় বাড়ীর মধ্যে ওকে নিতান্তই একা থাকতে হয়, তার ওপর ঘোর দারিদ্র্যের কষ্ট। একজনের খরচ, তাই চলে না।

ভরসারাম কুণ্ডুর ছোটভাই ওদের পাতের সামনে দিয়ে যেতে যেতে ওকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো—খারে এই যে যতীন, পাচ্চ-টাচ্চ তো সব? ওরে কে আহিস্ এদিকে পাত লুচি দিয়ে যা—

যতীনের মনটা খুশি হ'ল। এতক্ষণ সত্যিই তাদের এখানে দেখবার লোক ছিল না। আয়োজন খুব বড় বটে কিন্তু পরিবেশন করবার ও দেখাশুনো করবার লোকের অভাবে সাধারণ নিমন্ত্রিতদের অদৃষ্টে বিশেষ কিছু জুটে না।

আহারাদি শেষ হয়ে গেল। এখুনি পুকুরের ধারে বাজি পোড়ানো হবে, কলকাতা থেকে বরপক্ষ ভাল বাজি এনেচে, এসব পাড়াগায়ে অমন কেউ দেখেনি। বাজি দেখবার জন্তে পুকুরের ধারে লোকে লোকারণ্য হয়েছে। যতীনও তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো।

হুন্ শব্দে একটা হাউই আকাশে উঠে গিয়ে প্রায় নক্ষত্রের গারে ঠেকে ঠেকে তারপর লাল নীল সবুজ ফুল কেটে আশ্বে আশ্বে নিচের দিকে নামতে লাগলো।

দলের অনেকে চীৎকার করে উঠলো, আগুন লাগবে। আগুন লাগবে।

দু-চারবার এরকম তারাবাজি উঠলো নামলো, কারো ঘরের চালে আগুন লাগলো না দেখে উদ্বিগ্ন লোকদের মন শান্ত হোল।

তারাবাজি একটার গায়ে একটা হুন্ করে আকাশে উঠছিল, আর যতীন আশ্চর্য হয়ে সে দিকে চেয়ে দেখছিল একদৃষ্টে উর্দ্ধমুখে। বহুদিন ধরে সে পাড়াগায়ে নিতান্ত ছুরবহ্বার পড়ে আছে, অনেকদিন ভাল কিছু দেখে নি। কলকাতার সে ছাত্রজীবন এখন আর মনে পড়ে না যেন—সে সব যেন গত জন্মের কাহিনী।

হুতোরগাছির মেঘনাথ চক্ৰিওকে দেখে বস্লে—এই যে যতীন। আজ রায়সাহেবের বাড়ী খেলে নাকি? তোমার নেমস্তন্ন ছিল; তা তোমাদের বলতে সাহস করে—কই আমাদের বলুক দিকি? ছোট জাত তিলি-তামলি, না হয় দুটো টাকাই হয়েছে, তা বলে ব্রাহ্মণদের নেমস্তন্ন করে খাওয়াবে বাড়ীতে!...তোমরা গিয়ে গিয়ে নিজেদের মান খুইয়েচ তাই তোমাদের বলতে সাহস করে—ছিঃ—

যতীন যখন বাড়ী পৌঁছলো তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বাশবনের মধ্যে শূঁড়ি পথ পেরিয়ে ওর পৈতৃক আমলের কোঠা। অনেকগুলো ঘরদোর, বাইরে চণ্ডীমণ্ডপ, তবে এখন সবই শ্রীহীন। একটা ধানের বড় গোলা ছিল, অর্ধকণ্ঠে পড়ে গত মাঘমাসে সে সাড়ে সাত টাকার গোলাটা বিক্রী করে ফেলেচে। গোলার ইটে-গাঁথুনি-সিঁড়ি ক'খানা মাত্র বর্তমান আছে।

আলো জ্বলে নিজের বিছানাটা পেতে নিয়েই সে আলোটা নিভিয়ে দিলে—তেলের পরস্রা জ্বোটে কোথা থেকে যে আলো জ্বালিয়ে রাখবে? অন্ধকারে শূন্ত বাড়ীতে একা বসলেই মনে পড়ে আশালতার কথা।

আশালতা কি করে এত নিষ্ঠুর হতে পারলে? বিয়ের পরে প্রথম পাঁচ বছরের কথা মনে হোলে তার বৃকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। এই ধরনের কত আশা-রাগিতে ঐ ছাদে সে কত নিভৃত আনন্দ-মুহূর্তের কাহিনী এই বাড়ীর বাতাসে আজও বাজে, কত মিষ্টি কথা, কত চাপা হাসি, কত সপ্রেম চাহনি।

মনে পড়ে তারা দুজনে একসঙ্গে তারকেশ্বর গিয়েছিল একবার, তখন যতীনের বড় ছেলেটি আট মাসের শিশু। যাবার আগের দিন রাত্রে আশা রাত একটা পর্যন্ত জেগে থাকার তৈরী করলে। বস্লে, তোমায় কোথাও বাজারের খাবার খেতে দেবো না। নানারকম

অসুখ করে যা-তা খাবার খেলে। তার চেয়ে তৈরী করে নিলুম, সস্তাও হবে কেনা খাবারের চেয়ে। ওখানে গিয়ে বাবার প্রসাদ খেলেই চলবে, পথে এই যা করে নিলুম এতেই কুলিয়ে যাবে।

পথে ছুটুমি করে যতীন সব খাবার খেয়ে ফেলেছিল নৈহাটি খাবার আগেই, আশাকে ঠিকবার জঙ্গে। নৈহাটি স্টেশনে খাবার খেতে চাইলে আশা অপ্রতিভ হয়ে পড়লো, খাবার একটুকরোও নেই। যতীন হেসে বলে—কেমন, বাজারের খাবার কিনতে হবে না যে বড়! এখন কি হয়?

হয় তো অতি তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাই পরের পাঁচ-ছ'মাস তাদের দুজনকে অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা জুগিয়েছিল।—মনে আছে সেই নৈহাটি স্টেশনের কথা? কি হয়েছিল বল তো?

—যাও যাও, পেটুক গণেশ কোথাকার! আমি কি করে জানবো যে—ইত্যাদি ইত্যাদি.....

আহা প্রথম ঘোবনের স্বপ্নে রঙিন রাগ-সাগরের লীলাচঞ্চল বীচিমালায় সে কত চপল নৃত্য! কোথায় মিলিয়ে গিয়েচে, মিশিয়ে গিয়েচে, অতলতলে তলিয়ে গিয়েচে সে সব দিন—তার ঠিকানা নেই, খোঁজ নেই, খবর নেই।

সেই আশালতা আছে তার বাপের বাড়ীতে। আজ পাঁচ বছরের মধ্যে একখানা চিঠি দেয়নি যে তার স্বামী বেঁচে আছে না মরেচে। সেও স্বস্তরবাড়ী যায় না; একবার বছর-তিনেক আগে গিয়েছিল, নিতান্ত না-থাকতে পেরে। আগে থেকে একখানা চিঠি দিয়েছিল যে সে যাচ্ছে।

দুপুরের আগে সে গিয়ে পৌঁছুলো। অনেক আগ্রহ করে গিয়েছিল। শাশুড়ীঠাকুরপা রান্নাঘরের দাওয়ার বসে কুটনো কুটছিলেন, তাকে দেখে যেন ভূত দেখলেন। যতীন গিয়ে তাকে প্রণাম করে পায়ে ধুলো নিতেই তিনি উদাসীন স্বরে বলেন—থাক্ থাক্ হয়েছে, তারপর, এখন কি মনে করে এখানে?

—এই সব দেখাশুনো করতে এলাম। ছেলেমেয়ে সব ভাল আছে? কোথায় সব?

—ঐ যে বাইরের দিকে খেলা করচে—ডেকে দিচ্ছি।

যতীন স্ত্রীর কথাটা লজ্জায় উল্লেখ করতে পারলেন না।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা করলে। তাদের মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে যতীনের মনে হোল তারি কি একটা যেন ঢাকচে। ছেলেমেয়েও সব পর হয়ে গিয়েচে, ওর কাছে বড় একটা ঘেঁষতে চায় না আর। ছোট মেয়েটা তো তাকে দেখে নি বলেই হয়, আশা যখন চলে এসেছিল তখন খুকীর বয়েস এক বছর মাত্র।

খাওয়া-দাওয়ার সময়েও আশাকে দেখা গেল না। তার ঘরেও নয়। ওর মনে ভয় হোল, আশা বেঁচে আছে তো? লজ্জা ও সঙ্কোচ কাটিয়ে শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করলে—ওদের মা কোথায়? দেখচি নে যে?

শাশুড়ী তাড়াতাড়ি বলেন—সে এখানে নেই বাপু। সে আজ দিন-দশেক হোল গিয়েচে তার দিদির স্বশুরবাড়ী বারাসতে। তারা অনেকদিন থেকে নিয়ে যাবে নিয়ে যাবে করছিল, তা আমি বলি যাক বাপু দুদিন একটু বেড়িয়ে আসুক। জীবনে তো তার সুখের সীমে নেই!

যতীন ভীষণ নিরাশ হোল। সে যে কত কি মনে ভেবে এসেচে, আশাকে বলবে—চল আশা, যা হবার তা হয়ে গিয়েচে—ঘরের লক্ষী ঘরে চলো। কাকে নিয়ে কাটাই বলো তো তুমি যদি এমন করে থাকবে?

তারপর শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করলে—কবে আসবে?

—আসা-আসির এখন ঠিক নেই। এ মাসে তো নয়ই, পূজোর সময় পর্যন্তও থাকতে পারে। এখানে রাখবার লোক নেই, বুড়োমামুষ এতগুলো লোকের ভাতজল করচি দুবেলা, প্রাণ বেরিয়ে গেল।

শেষের কথাটি যে তাকে চলে যাবার ইঙ্গিত, যতীনের তা বুঝতে দেয়ি হোল না। বিকেলের দিকেই সে ভগ্নমনে বাড়ীর দিকে রওনা হোল। পথে তার খুড়তুতো শালী আন্না, দশ বছরের মেয়ে, অশখ-তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে দেখে কাছে এসে বলে—দাদাবাবু, আজই এলেন, আজই চলেন যে! রইলেন না?

—না, সব দেখাশুনো করে গেলুম। তা ছাড়া তোর দিদি তো এখানে নেই, অনেক দিন পরে এলুম, প্রায় বছর দুই পরে, দেখাটা হোল না।

আন্না কেমন এক অদ্ভুত ভাবে ওর দিকে চাইলে—তারপরে এদিক ওদিক চেয়ে সুর নিচু করে বলে—একটা কথা বলবো দাদাবাবু, কাউকে বলবেন না আগে বলুন।

যতীন বলে—না, বলছি নে। কি কথা রে আন্না?

—দিদি এখানেই আছে, কোথাও যায় নি। আপনার আসবার খবর পেয়ে চৌধুরীদের বাড়ী ওর সহ-মার কাছে লুকিয়ে আছে। জ্যাঠাইমা আমাদের শিথিয়ে দিয়েছে আপনার কাছে এসব কথা না বলতে।

যতীন বিস্মিত হয়ে বলে—ঠিক বলচিস্ আন্না?

পরেই বালিকার সরল চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে এ প্রশ্ন নিরর্থক। সে দৃষ্টিতে মিথ্যার ভাঁজ ছিল না।

যতীন চলে আসচে, আন্না বলে—আজ থেকে গেলেন না কেন দাদাবাবু?

—না, থাকা হবে না আন্না। বাড়ীতে কাজকর্ম কলে এসেচি বুঝি নে?

আন্না আবার বলে—দিদিকে একবার চুপি চুপি বলে আসবো যে আপনি চলে যাচ্ছেন, যদি দেখা করে? যাবো দাদাবাবু?

বালিকার সুরে করুণা ও সহানুভূতি মাখানো। সে ছেলেমামুষ হলেও বুঝেছিল যতীনের প্রতি তার স্বশুরবাড়ীর আচরণের রূঢ়তা। বিশেষ করে তার নিজের স্ত্রীর।

যতীন অবিশ্রিত রইল না, চলেই এল।

চলে এল বটে, কিন্তু যে যতীন গিয়েছিল, সে যতীন আর আসে নি। মনভাঙা দেহটা

কোনো রকমে বাড়ীতে টেনে এনেছিল মাত্র।

তারপর দীর্ঘ তিন বছর কেটে গিয়েছে। একথা ঠিক যে, সে রকম বেদনা তার মনে এখন আর নেই, থাকলে সে পাগল হয়ে যেতো। সময় তার ক্ষতে অনেকখানি প্রলেপ বুলিয়ে জ্বালা জুড়িয়ে এনেছে। কিন্তু এমন দিন, এমন রাত্রি আসে যখন স্থতির দংশন অসহ্য হয়ে ওঠে।...

তবুও নীরবে সহ্য করতে হয়। তা ছাড়া আর উপায় কিছু তো নেই। এই ক'বছরের মানসিক যন্ত্রণার ওর শরীর গিয়েছে, মন গিয়েছে, উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই, অর্থ উপার্জনের স্পৃহা নেই, মান-অপমান বোধ নেই।

যে যা বলে বলুক, দিন কোনো রকমে কেটে গেলেই হোল। কিসে কি এসে যায়? তেলি-তামলির বাড়ী নেমস্তন্ন খেলেই বা কি, রবাহুত অনাহুত গেলেই বা কি, লোকে নিন্দে করলেই বা কি, প্রশংসা করলেই বা কি। কিছু ভাল লাগে না—কিছু ভাল লাগে না।

২

যতীনের পৈতৃক বাড়ীটা নিতান্ত ছোট নয়। পূর্বপুরুষেরা এক সময়ে মনের আনন্দে ঘরদোর করে গিয়েছেন। এখন এমন দাঁড়িয়েচে যে সেগুলো ঘেরামত করবার পরস্যা জোটে না। পূর্বদিকের আলসেটা কঁঠালের ডাল পড়ে জখম হয়ে গিয়েছে বছর দুই হোল। মিস্ত্রী লাগানোর খরচ হাতে আসে নি বলে তেমনি অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে।

গত ত্রিশ বৎসরের কত পদচিহ্ন এই বাড়ীর উঠানে। বাবা...মা...বউদিদি...মেজদিদি...পিসিমা...দুই ছোট ভাই...আশা...খোকা-খুকীরা...

কত ভালবাসতো সবাই...সব স্বপ্ন হয়ে গেল...কেউ নেই আজ...

সে শিক্ষিত বলে আগে গ্রামের লোক তাকে খুব মেনে চলতো। এখন তারা দেখেচে যে শিক্ষিত হয়েও তার এক পরস্যা উপার্জন করবার শক্তি নেই, এতে এখন সবাই তাকে ঘৃণা করে। তার নামে যা-তা বলে।

আশা যখন প্রথম প্রথম বাপের বাড়ী গিয়েছিল, তখন লজ্জা ও অপমান ঢাকবার জন্তে যতীন গাঁয়ে সকলের কাছে বলে বেড়াতো—শাস্ত্রী-ঠাকরুণের হাতে অনেক টাকা আছে—কোন দিন মরে যাবেন, বয়েস তো হয়েছে। এদিকে বড় মেয়ে প্রায়ই মার কাছে থাকে, পাছে টাকার সবটাই বেহাত হয়ে যায় তাই ও বলে—জাখো, এই সময়টা কিছুদিন মার কাছে গিয়ে থাকি গে। নইলে কিছু পাবো না।

এই কৈফিয়ৎ প্রথম প্রথম খুব কার্যকরী হয়েছিল বটে। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেল, এখন লোকে নানারকম বাঙ্গ-বিক্রপ করে। কেউ বলে, অনেকদিন হয়ে গেল, এইবার গিয়ে বৌকে নিয়ে এসো গে যতীন। শাস্ত্রীর টাকার মায়া ছেড়ে দাও, বুড়ী সহজে মরবে না।

পিছনে কেউ কেউ বলে—এই মোটর গাড়ীর শব্দ ওঠে জ্বাধো না! যতীনের বোটা কার পুঁটুলি নিয়ে মোটর থেকে নেমে বলবে—এই নাও পাঁচ হাজার টাকা। তোমার টাকা তুমি রাখো। কি করবে করো—আমি খালাস হই তো আগে! এই ধরো পুঁটুলিটা।

তা ছাড়া আরও কত রকমের কথা বলে—সে সব এখানে ব্যস্ত করবার নয়।

এই সমস্ত বাঙ্গ-অপমান যতীনকে বেমালুম হজম করে কেলতে হয়। সবে গিয়েচে, আর লাগে না—মাঝে মাঝে কষ্ট হয় মাল্লুষের নিষ্ঠুরতা বর্ধরতা দেখে। একটা সহানুভূতির কথা কেউ বলে না, কেউ এতটুকু দরদ দেখায় না—কি মেয়ে, কি পুরুষ। সংসার যে কি ভয়ানক জায়গা, দুঃখে কষ্টে না পড়লে বোঝা যায় না। দুঃখকে কেউ দয়া করে না, সবাই ঘৃণা করে।

মাল্লুষ হয়ে মাল্লুষকে এত কষ্ট দিতে পারতো না যদি একটু ভেবে দেখতো। কিন্তু অধিকাংশ মাল্লুষের চিন্তার বাংলাই নেই তো!

এসব ভেবে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু এসব সে গায়ে মাখে না। গা-সওয়া হয়ে গিয়েচে মাল্লুষের নিষ্ঠুরতা, মাল্লুষের অপমান। এর পরেও সে লোকের বাড়ীতে ভাত চেয়ে খায়। কোনদিন লোকে দেয়, কোনদিন দেয় না—বলে, বাড়ীতে অস্থখ, রাঁধবার লোক নেই—বড়ই লজ্জিত হোলাম ভাই... ইত্যাদি।

যতীনের বাড়ীর পেছনে ষিড়কির বাইরে ছোট একটা বাগান আছে, তাতে একটা বড় পাতিলেবুর গাছ আছে। যেদিন কোথাও কিছু না মেলে, গাছের লেবু তুলে সে বিনোদপুরের হাটে বিক্রী করতে নিয়ে যায়, আম কাঠালের সময় গাছের আম কাঠাল মাথার করে হাটে নিয়ে যায়। এতেও লোকে নিন্দে করে—শিক্ষিত লোক হয়ে ভদ্রসমাজের মুখ হাসাচ্ছে। রায়সাহেব ভরসারাম ফুৎ কেন তার বাড়ীর কাজকর্মে ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন করতে সাহস না করবে?

এক সময়ে বড় বই পড়তে ভালবাসতো সে। অনেক ভাল ভাল ইংরিজি বই ছিল, সংস্কৃত বই ছিল তার ঘরে—কতক নষ্ট হয়ে গিয়েচে, কতক সে-ই বিক্রী করে ফেলেচে অভাবে পড়ে। এইসব নির্জন রাত্রে বইগুলোর জন্তে সত্যি মনে কষ্ট হয়।

এইরকম নির্জন রাত্রে বহুদিন আগেকার আর-একজনের কথা মনে পড়ে। সে স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে অনেকদিন। তুলেও তাকে গিয়েছিল, কিন্তু আশা চলে যাওয়ার পরে তার কথা ধীরে ধীরে জেগে উঠেচে।

গত পাঁচ বছরে যতীন অনেক শিখেচে। মাল্লুষের দুঃখ বুঝতে শিখেচে, নিজের দুঃখে উদাসীন হয়ে থাকতে শিখেচে, জীবনের বহু অনাবশ্যক উপকরণ ও আবর্জনাকে বাদ দিয়ে সহজ অনাড়ম্বর সত্যকে গ্রহণ করতে শিখেচে।

বর্ষার শেষে যতীন পড়ল অস্থখ। একা থাকতে হয়, এক ঘটি জল দেবার মাল্লুষ নেই। মাথার কাছে একটা কলসী রেখে দিত—যতক্ষণ শক্তি থাকতো নিজেই জল গড়িয়ে খেত—

যখন না থাকতো শুয়ে চিঁ চিঁ করতো। গায়ের লোক একেবারেই যে দেখেনি তা নয়, কিন্তু সে নিতান্ত দায়সারা গোছের দেখা। তারা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি মেয়ে দেখে যেতো—হয় তো ছেলেমেয়ের হাতে দিয়ে কচিং এক বাটি সাবুও পাঠিয়ে দিতো—সেও দায়সারা গোছের। সে দেওয়ার মধ্যে ঐহিক ভালবাসার স্পর্শ থাকতো না।

অনেকে পরামর্শ দিত—ওহে, বৌমাকে এইবার একখানা পত্র দাও। তিনি আশ্বিন—না এলে এই অবস্থায় কে দেখে, কে শোনে, কে একটু জল মুখে দেয়। আমাদের তো সব সময় আসা ঘটে ওঠে না, বুঝতেই তো পারো, নানারকম ধাক্কাতে ঘুরতে হয়। নইলে ইচ্ছে তো করে, তা কি আর করে না?... ইত্যাদি।

এ কথার কোনো উত্তর সে দিত না।

৩

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি যতীন সেরে উঠলো। যার কেউ নেই, ভগবান তাকে বোধ হয় বেশিদিন যত্নাভোগ করান না। হয় শারান, নয় সারাবার ব্যবস্থা করেন। বৈকালের দিকে নদীর ধারের মাঠে সে বেড়াতে গেল। একটা জায়গায় একটা বড় বাবলা কাঠের গুঁড়ি পড়ে। চারিদিক ঘিরে সেখানে বনঝোপ। পড়ন্ত বেলায় পাখীর দল কিচ্ কিচ্ করচে, কেলে-কৌড়া লতায় শরতের প্রথমে সুস্বন্ধ ফুল ফুটেচে, নির্ধ্বংস আকাশ অদ্ভুত ধরনের নীল।

গাছের গুঁড়িটার ওপর সে দেহ এলিয়ে দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় রইল। শরীর দুর্বল, বেশিক্ষণ দাঁড়াতে বা বসতে কষ্ট বোধ হয়।

ওর মনে একটা ভরানক কষ্ট...বিশেষ করে এই অসুখটা থেকে ওঁরবার পরে। মনটা কেমন দুর্বল হয়ে গিয়েচে রোগে পড়ে থেকে। নইলে যে আশালতা অত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে, রোগশয্যায় পড়ে সেই আশালতার কথাই অনবরত মনে পড়বে কেন। শুধু আশালতা...আশালতা...

না, চিঠি সে দেবে না—দেয়ও নি। মরে যাবে তবুও চিঠি দেবে না। মিথ্যে অপমান কুড়িয়ে লাভ কি, আশালতা আসবে না। যদি না আসে, তার বৃকে বড় বাজবে, পূর্বের ব্যবহার সে খানিকটা এখন ভুলেচে, স্বচ্ছাস নতুন হুঃখ বরণ করার নির্বুদ্ধিতা তার না হয়। সে অনেক হুঃখ পেয়েচে, আর নয়।

সব মিথ্যে...সব ভুল...প্রেম, ভালবাসা সব হৃদিনের মোহ। মূর্খ মানুষ যখন মজে, হাবুডুবু খায়, তখন শত রত্নীন্ কল্পনা তাতে আরোপ করে প্রেমাস্পদকে ও মনের ভাবকে মহনীয় করে তোলে। মোহ যখন ছুটে যায়, অপস্রিয়মাণ ভাঁটার জল তাকে শুক বালুর চড়ায় একা ফেলে রেখে কোন্ দিক দিয়ে অন্তর্হিত হয় তার হিসেব কেউ রাখে না।

এই নিভৃত লতাবিতানে, এই বৈকালের নীল আকাশের তলে বসে সে অল্পভব করলে জগতের কত দেশে, কত নগরীতে, কত পল্লীতে কত নয়নারী, কত তরুণ, কত নবযৌবনা

বালিকা প্রেমের বাবসায়ে দেউলে হয়ে আজ এই মুহূর্তে কত যন্ত্রণা সহ্য করছে। নিরুপায় অসহায় নিতান্ত দুঃখী তারা। অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রে তাদের দুঃখ দূর করা যায় না। কেউ তাদের দুঃখ দূর করতে পারে না। এই সব দুঃখীদের সেও একজন। আজ পৃথিবীর সকল দুঃখীর সঙ্গে সে যেন একটা অদৃশ্য যোগ অল্পভব করলে নিজের ব্যথার মধ্যে দিয়ে।

দারিদ্র্যকে সে কষ্ট বলে মনে করে না। কেউ তাকে ভালবাসে না, এই কষ্টই তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে সকলের চেয়ে বেশি। আশা যদি আবার আজ ফিরে আসে—পুরোনো দিনের আশা হয়ে ফিরে আসে—সে নতুন মাল্লুস হয়ে যায় আজ এই মুহূর্তে। দশটি বছর বয়েস কমে যায় তার।

যাক, আশার কথা আর ভাববে না। দিনরাত ঐ একই চিন্তা অসহ্য হয়ে উঠেছে। সে পাগল হয়ে যাবে নাকি ?

ঠাণ্ডা সে দেখলে হাউ হাউ করে কাঁদে।

একি ব্যাপার! ছিঃ ছিঃ—নাঃ, সে সত্যিই পাগল হবে দেখছি। যতীন কাঠের গুঁড়িটা থেকে ভাড়াভাড়ি উঠে ব্যস্তভাবে পায়েচাষি করতে লাগলো। নিজেকে সে সংযত করে নিয়েচে—আর সেও কথাই ভাববে না। যে গিয়েচে, ইচ্ছে করে যে চলে গিয়েচে, তাকে মন থেকে কেটে বাদ দিতে হবে—হবেই। কেটে বাদই দেবে সে।

যতীন বাড়ী ফিরে এল। অন্ধকার বাড়ী, অন্ধকার দোয়। ভাড়া ভত্তাপোশের ওপর তার রাজশয্যা তো পাতাই আছে। সে কেউ ঝাড়েও না, পাতেও না, তোলেও না। অন্ধকারের মধ্যে শয্যায় দেহ প্রসারিত করে শোবার সময় একবার তার মনে হোল—সেই আশা কেমন করে এমন নিষ্ঠুর হতে পারলে!

সেই রাত্রেই যতীনের আবার খুব জ্বর হোল। হয় তো এতখানি পথ যাতায়াত করা, এত ঠাণ্ডা লাগানো দুর্বল শরীরে তার উচিত হয় নি। পরদিন দুপুর পর্যন্ত সে অঘোর অচেতন হয়ে পড়ে রইল—কেউ খোঁজখবর নিলে না। দুপুরের পর বোষ্টমদের বোঁ ওদের উঠানে তাদের পোষা ছাগল খুঁজতে এসে অতবেলা পর্যন্ত ঘরের দোর বন্ধ দেখে বাড়ী গিয়ে খবর দিলে। সে সকালের দিকে আরও দুবার এরিকে কি কাজে এসে দোর বন্ধ দেখে গিয়েছিল।

বিকেলের দিকে সন্ধ্যার কিছু আগে তার জ্বর কমলে সে নিজেই দোর খুলে। কিন্তু এক পাও বাইরে আসতে পারলে না। বিছানায় গিয়েই শুয়ে পড়লো। তৃষ্ণায় তার জিব শুকিয়ে গিয়েচে। কাছাকাছি কারো বাড়ী নেই যে, ডাকলে শুনতে পাবে। বেশি চেষ্টানোরও শক্তি নেই।

সকালে কেউ দেখতে এল না। এর একটা কারণ ছিল। যতীনের বাড়ী ইদানীং বড় একটা কেউ আসতো না। এক ছিলিম তামাকও যেখানে খেতে না পাওয়া যাবে, পাড়াগাঁয়ে সে-সব জায়গায় লোক বড় যাতায়াত করে না। কাজেই দুদিন কেটে গেল, যতীনের ঘরের দোর বন্ধ রইল, কেন লোকটা দোর খুলে না এ দেখবার লোক জুটলো না। পরের দিন

অনেক বেলায় বোষ্টম-বৌ আবার ছাগল খুঁজতে এসে অত বেলায় যতীনের দোর বন্ধ দেখে ভাবলে—যতীন ঠাকুর কত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছে আজকে !...বেলা দশটা বাজে এখনও সাড়াশব্দ নেই! বেলা বায়োটার সময় একবার কি ভেবে আবার এসে দেখলে তখনও দোর বন্ধ। ব্যাপারটা সে বুঝতে পারলে না। পাড়ার মধ্যে খবরটা বহলে।

পাড়ার দু'চারটা ষণ্ডাণ্ডা গোছের যুবক এসে ডাকাডাকি করতে লাগলো।

—ও যতীন-দা, এত বেলায় ঘুম কি, দোর খুলুন—ও যতীন-দা—

কেউ সাড়া দিলে না। আরও লোকজন জড় হোল—দোর ভাঙা হোল।

যতীন বিছানায় মরে কাঠ হয়ে আছে। কতক্ষণ মরেচে কে জানে, দুঘণ্টাও হতে পারে, দশঘণ্টাও হতে পারে।

তখন সকলে খুব দুঃখ করতে লাগলো। বাস্তবিকই কারো দোষ ছিল না। যতীন লোকটা আঞ্জকাল কেমন হয়ে গিয়েছিল, লোকজনের সঙ্গে তেমন করে মিশতো না, কথাবার্তা বলতো না বলে লোকেও এদিকে বড় একটা আসতো না। সুতরাং যতীনের আবার অসুখ হয়েছে, এ খবরও কেউ রাখে না।

নবীন বাড়ুঘো বল্লেন—আহা, ভবতারণ-দা'র ছেলে! ওর বাবার সঙ্গে একসঙ্গে পাশা খেলেচি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে। লোকটা বেঘোরে মারা গেল। তাই কি আমি জানি ছাই যে এমনি একটা অসুখ হয়েছে (বাস্তবিকই তিনি জানতেন না), আমার স্ত্রী আর আমি এসে রাত জাগতাম। আর সে বোটেরই বা কি আঙ্কেল—ছ' বছরের মধ্যে একবার চোখের দেবা দেখলে না গ—হ্যাঁ?

সকলে একবাক্যে যতীনের বৌ-এর উদ্দেশে বহু গালাগালি করলে।

যতীনের মৃতদেহ যখন শ্মশানে সংকারের জন্তে নিয়ে যাওয়া হোল, তখন বেলা দুটোর কম নয়।

৪

যতীন হঠাৎ দেখতে পেলে তার খাটের পাশে পুষ্প দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে যুহু যুহু হাসচে।...

পুষ্প! এক সময়ে পুষ্পের চেয়ে তার জীবনে প্রিয়তর কে ছিল?

দুজনে—

নৈহাটির ঘাটে

বসে পৈঠার পাটে

কত খেলেচি ফুল ভাসিয়ে জলে—

সেই পুষ্প।

নৈহাটির ঘাট নয়—সাগর-কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট। নৈহাটির আড়পারে। সেখানে

ছেলেবেলায় তার মাসীমার জীবদ্দশায় সে কতবার গিয়েছে। এক এক সময় ছ'মাস আটমাস মাসীমার কাছেই সে থাকতো। মাসীমার ছেলেপুলে ছিল না, যতীন ছিল তার চক্ষের মণি। তারপর মাসীমা মারা গেলে, মেসোমশায় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন, সাংগঞ্জ-কেওটাতে মাসীমার বাড়ীর দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল ওর কাছে।

বুড়োশিবতলায় পুরোনো মন্দিরের কাছে ছিল ওর মাসীমার বাড়ী আর রাস্তার ও পাশেই ছিল পুষ্পদের বাড়ী। পুষ্পর বাবা শ্যামলাল মুখ্যে বাঁশবেড়ের বাবুদের জমিদারিতে কি কাজ করতেন। পুষ্প ছিল ভারি সুন্দরী মেয়ে—তার হাসি—সে হাসি কেবল পুষ্পই হাসতে পারতো। দোষের মধ্যে পুষ্প ছিল অত্যন্ত গর্বিত মেয়ে। তার বিশ্বাস ছিল তার মত সুন্দরী মেয়ে, এবং তার বাবার মত সম্ভ্রান্ত লোক গল্পার ওপারে কোথাও নেই।

ঘীরে ঘীরে পুষ্পের সঙ্গে ওর আলাপ হয়, ঘীরে ঘীরে সে আলাপ জমে। ও তখন তেরো বছরের ছেলে, পুষ্প তেরো বছরের মেয়ে। সমান বয়স হোলে কি হবে, বাচাল ও বুদ্ধিমতী পুষ্পের কাছে যতীন ভেসে যেতো। পুষ্প চোখে-মুখে কথা কইতো, যতীন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার গর্বিত সুন্দর মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইত। মস্ত অস্থখগাছ যে পুরোনো ঘাটটার ওপরে, যেটার নাম সেকালে ছিল বুড়োশিবতলার ঘাট, ওই ঘাটে কতদিন সে ও পুষ্প একা বসে গল্প করেছে, জগদ্ধাত্রী পূজোর ভাসানের দিন পাঁপরভাজা কিনে ঘাটের রানার ওপর বসে দুজনে ভাগ করে খেয়েছে। কেমন করে যে সেই রূপগরিভা বালিকা তার মত সাদাসিধে ধরনের বালককে অত পছন্দ করেছিল, অত দিনরাত মিশতো, নিত্য তাদের বাড়ী না গেলে অস্থযোগ করতো—এ সব কথা যতীন জানে না, সে সব বোঝবার বয়স তখন ওর হয়নি।

দু-দশ দিন নয়, দেড় বছর ছবছর ধরে দুজনে কত খেলা করেছে, কত গল্প করেছে, কত ঝগড়া করেছে, পরস্পরের নামে পরস্পরের গুরুজনের কাছে কত লাগিয়েছে, আবার দুজনে পরস্পরে যেচে সেধে ভাব করেছে—সে কথা লিখতে গেলে একখানা ইতিহাসের বই হয়ে পড়ে।

মাসীমার মৃত্যুর পরে কেওটার পথ বন্ধ হোল। বছরখানেকের মধ্যে পুষ্পও বসন্ত হয়ে মারা গেল। দেশে থাকতে পুষ্পর মৃত্যুসংবাদ মেসোমশায়ের চিঠিতে সে জেনেছিল। তারপর তেরো বছর 'কেটে যাওয়ার পরে ছাব্বিশ বছর বয়সে যতীন বিবাহ করে। বাল্যের তেরো বছর—বহুদিন। পুষ্প তখন ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্যাবসিত হয়েছে। তারপর আশালতার সঙ্গে নবীন অস্থুরাগের রতীন দিনগুলিতে পুষ্প একেবারে চাপা পড়ে গেল। কিন্তু চাপা পড়ে যাওয়া আর ভুলে যাওয়া এক জিনিস নয়। মাহুষের মনের মন্দিরে অনেক কক্ষ, এক এক কক্ষে এক এক প্রিয় অতিথির বাস। সে কক্ষ সেই অতিথির হাসিকান্নার সৌরভে ভরা, আর কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না। প্রেমের এ অতিথিশালা বড় অদ্ভুত, অতিথি যখন দূরে থাকে তখনও যে কক্ষ সে একবার অধিকার করেছে সে তারই এবং তারই চিরকাল। আর কেউ সে কক্ষে কোনো দিন কোনো কালে ঢুকতে পারে না। সে যদি

আর কিরেও না আসে কখনো, চিরদিনের জুই চলে যায়—এবং জানিয়ে দিয়েও যায় যে সে ইহজীবনের মতই চলে যাচ্ছে—তখন তার সকল স্মৃতির সৌরভ মুক্ত সে ঘরের কবাট বন্ধ করে দেওয়া হয়—তারই নাম লেখা থাকে সে দোরের বাইরে। তার নামেই উৎসর্গীকৃত সে ঘর আর-কারো অধিকার থাকে না দখল করবার।

পুষ্পের ঘরের কবাট বন্ধ ছিল—চাবি দেওয়া, বাইরে ছিল পুষ্পের নাম লেখা। হয়তো চাবিতে মরচে পড়েছিল, হয়তো কবাটের গায়ে ধুলো মাকড়সার জাল জমেছিল, হয়তো এ ঘরের সামনে অনেক দিন কেউ আসে নি, কিন্তু সে ঘর দখল করে কার সাধ্য? আশালতা সে ঘরে ঢোকেনি—আশালতার ঘর আলাদা।

সেই পুষ্প।

যতীন অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল। প্রথমেই যে কথাটা ওর মনে উঠলো সেটা এই যে, পুষ্পের সঙ্গে শেষবার দেখা হওয়ার পরে যে বহু বছর কেটে গিয়েছে—তেরো বছর পয়ে সে বিয়ে করে আশাকে, বিয়ে করেছেও আজ দশ বছর—এই দীর্ঘ, দীর্ঘ তেইশ বছর পরে কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাটের সেই রূপসী মেয়ে বালিকা পুষ্প কোথা থেকে এল? যে বয়সে তারা দুজনে—

নৈহাটির ঘাটে

বসে পৈঠার পাটে

খেলা করেছিল ফুল ভাসিয়ে জলে—!

বুড়োশিবতলার ঘাটের প্রাচীন সোপানশ্রেণীর ওপরে বাঁকাভাবে অন্তর্য্যের আলো এসে পড়েছে—ঘাটের রানায় শেওলা জমেছে, ঠিক ওপারে হালিসহরে শ্রামাসুন্দরী ঘাটের মন্দিরেও পড়েছে রাজা আলো, কিন্তু সেটা পড়েছে পশ্চিমদিক থেকে সোজাভাবে গিয়ে, এখনও সেই প্রাচীন পাখীর দল ডাকচে বড় অশথগাছটার ডালে ডালে, সাদা পাল তুলে ইলিশ মাছ ধরা পুরোনো জেলেডিঙির সারি চলেছে ত্রিবেণীর দিকে... যতীন বসে পুষ্পের সঙ্গে গত বারো-য়ারীতে যাত্রায় দেখা কি একটা পালার গল্প করছে... তেইশ বছর পরেও পুষ্প এখনও সেই রকমটি দেখতে রয়েছে কেমন করে?

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোল—পুষ্প তো নেই! সে তো বহুকাল মরে গিয়েছে। ব্যাপার কি, সে স্বপ্ন দেখছে না কি? পুষ্প কিন্তু এগিয়ে এসে হাসিমুখে বলে—অবাক হয়ে চেয়ে দেখচো কি? চিনতে পেরেচ? বল তো আমি কে?

যতীন তখনও হাঁ করে চেয়েই আছে। বলে—খুব চিনেচি। কিন্তু তুই কোথা থেকে এলি পুষ্প? তুই তো কত কাল হোল—

পুষ্প খিল খিল করে হেসে উঠে বলে—মরে গিয়েচি, অর্থাৎ তোমার হাড় জুড়িয়েছিল—এই তো? কিন্তু তুমিও যে মরে গিয়েচ যতুদা? নইলে তোমার আমার দেখা হবে কেমন

করে? তুমিও পৃথিবীর মায়া কাটিয়েচ অর্থাৎ পটল তুলেচ।

যতীনের হঠাৎ বড় ভয় হোল। এসব কি ব্যাপার? তার জ্বর হয়েছিল খুব, সে কথা মনে আছে। তারপর মধ্যে কি হয়েছিল তার জানা নেই। বর্তমানে বোধ হয় তার জরের ঘোর খুব বেড়েচে, জরের ঘোরে আবেল-তাবেল স্বপ্ন দেখচে। তবুও সে এককাল পরে পুষ্পকে দেখতে পেয়ে ভারি খুশি হোল। স্বপ্নই বটে, বড় মধুর স্বপ্ন কিন্তু!

পুষ্প কিন্তু ওকে ভাববার অবকাশ দিলে না। বল্লে—পুরোনো দিনের মত ছুটুমি কোরো না যতুদা। এখন তুমি ছেলেমানুষটি নেই। এখানে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসচে, থাকতে পারচি না—এখন এসো আমার সঙ্গে।

সে হঠাৎ পাগল হয়ে গেল নাকি? সে তো কিছুই বুঝতে পারচে না। যাবে কোথায় চলে সে? পুষ্পই বা আসে কোথা থেকে? অথচ সে তো এই তার পুরোনো ঘরেই রয়েছে, ঐ তো চূণবালি খসা দেওয়াল, ঐ তো উঠোনের পেঁপে গাছটি, ঐ পৈতৃক আমলের গোলাার ভাঙা সিঁড়ি।

পুষ্পকে সে বল্লে—তুই কি করে জানলি আমার অসুখ করেছে? প্রশ্ন করলে বটে, অথচ যতীন সঙ্গে সঙ্গে ভাবলে, আশ্চর্য্য! কাকে একথা জিজ্ঞেস করচি? পুষ্প, যে তেইশ বছর আগে মারা গিয়েচে, তাকে? অদ্ভুত স্বপ্ন তো! এমনধারা স্বপ্ন তো সত্যিই জীবনে কোনদিন দেখি নি!

পুষ্প বল্লে—কি করে জানলুম? বেশ কথাটি বল্লে তো যতুদা। তোমার এই ঘরে তোমার কাছে আমি বসে নেই পরশু তোমার জ্বর হওয়ার দিন থেকে? দিন রাতে অনবরতই তো তোমার শিররে বসে।

—বলিস্ কি পুষ্প! আমার শিররে তুই বসে আছিস দুদিন থেকে? পুষ্প, একটা কথা বল্ তো—আমি পাগল হয়ে যাই নি তো জ্বরের ঘোরে?

—সবাই ও-রকম কথা বলে যতুদা। প্রথম প্রথম যারা আসে, তাদের বারোআনা ওই কথাই বলে। তারা বুঝতে পারে না তাদের কি হয়েছে। তুমিও জ্বালালে যতুদা।

কথা শেষ করে পুষ্প এসে ওর হাত ধরে খাট থেকে নামিয়ে নিতেই যতীন বেশ স্নহ ও হাল্কা অল্পভব করলে নিজেকে। তারপর কি মনে করে খাটের দিকে একবার চাইতেই সে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খাটের ওপর তার মত একটা দেহ নিজজীব অবস্থায় পড়ে। ঠিক তার মত চোখ মুখ—সবই তার মত।

পুষ্প বল্লে—দাঁড়িও না যতুদা—এসো আমার সঙ্গে। কেমন, এখন বোধ হয় বিশ্বাস হয়েছে? বুঝলে এখন?

পুষ্প তো ঘরের দরজা খুললে না? তবে তারা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো কি করে। এখনও রাত আছে। অন্ধকার রয়েছে, মাথার ওপরে অগণ্য তারা জ্বলচে, নবীন বাঁড়ুঘ্যের বাড়ীর দিকে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করচে। অথচ এই ঘন অন্ধকার রাত্রে সে চলেচে কোথায়? কার সঙ্গেই বা চলেচে? এখনও কি সে স্বপ্ন দেখচে?

পুষ্প বসে—এখন বিশ্বাস হোল যত্না? দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে বার হয়ে এলাম দেখলে না?

—কি করে এলাম?

—ইটের দেওয়াল এখন তোমার আমার কাছে ধোঁয়ার মত! আমাদের এ শরীরে পৃথিবীর জড় পদার্থের স্পর্শ লাগবে না। আর একটা মজা তোমার দেখাবো, পায়ে হেটে যেও না, মনে ভাবো যে উড়ে যাচ্ছি—

যতীন মনে মনে তাই ভাবলে। অমনি সে দেখলে তার দেহ রবারের বেলুনের মত আকাশ দিয়ে উড়ে চলেচে। হুজনে চললো, পুষ্প আগে, যতীন তার পেছনে। কোথায় যাচ্ছে, যতীন কিছুই জানে না।

সে অনেক কথা ভাবছিল যেতে যেতে। এত অদ্ভুত ঘটনা তার জীবনে আর কখনো হয়নি। স্বপ্নে কি এমন সব ব্যাপার ঘটে? স্বপ্ন যদি না হয় তবে কি সে পাগল হয়ে গেল? তাই বা কেমন করে হয়, তবে পুষ্প আসে কোথা থেকে? কিম্বা সবটাই মনের ধাঁধা—hallucination?

না—একেই বলে মৃত্যু?

এরই নাম যদি মৃত্যু হয় তবে লোকে এত ভয় করে কেন? কেউ তো কখনো তাকে বলেনি যে মৃত্যুর পরে মানুষ জীবিত থাকে—বরং তার মনে হচ্চে সে আরও বেশি জীবন্ত হয়েছে—বৈচেই বরং রোগের যন্ত্রণায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ যতীন দেখলে যে সে এক নতুন দেশে এসেচে—দেশটা পৃথিবীর মতই। তার পায়ের তলায় নদী, গাছপালা, মাঠ, সবই আছে—কিন্তু তাদের সৌন্দর্য্য অনেক বেশি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে, সূর্য্য দেখা যায় না—অথচ অন্ধকারও নেই—তারি চমৎকার এক ধরনের অপার্থিব হৃদ্য আলোকে সমগ্র দেশটা উদ্ভাসিত। গাছপালার পাতা ঘন সবুজ, নানাদরনের ফুল, সেগুলো যেন আলো দিয়ে তৈরী।

এক জায়গায় এসে পুষ্প থামলো।

একি! এ তো সেই পুরোনো দিনের কেওটা-সাগরের বুড়োশিবতলার ঘাট। ঐ গঙ্গা। ঐ সেই প্রাচীন অশ্বথ গাছটা। ঐ তো বুড়োশিবের ভাড়া মন্দিরটা। পৃথিবীতে মাঝে মাঝে গোখুলির সময় মেঘলা আকাশে যেমন একটা অদ্ভুত হলুদে আলো হয়, ঠিক তেমনি একটা যুহু, তাপহীন, চাপা আলো গাছপালার, গঙ্গার জলে, বুড়োশিবের মন্দিরের চূড়োয়। শুকে ঘাটের সোপানে একা বসিয়ে পুষ্প কোথায় চলে গেল। যতীন চুপ করে বসে অদ্ভুত আলোকে রঙীন গঙ্গাবক্ষের দিকে চেয়ে রইল। বালোর শত স্তম্ভের, শত আনন্দস্থতির রঙ্গহল সেই পুরোনো জায়গা—ঐ তো ওপারে শ্রামাসুন্দরীর ঘাট, শ্রামাসুন্দরীর মন্দির। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কোনো দিকে আর কোনো লোকজন নেই। এতখানি সুবিস্তীর্ণ স্থান একেবারে নির্জন। কেউ কোথাও নেই সে ছাড়া!

এমন সময়ে অশ্বথ গাছের তলার সেই প্রাচীন পথটা দিয়ে পুষ্পকে আসতে দেখা গেল।

তার খোঁপায় কি একটা ফুলের মালা জড়ানো।

যতীন বলে—এ কোথায় আনলি পুষ্প? বুড়োশিবভালার ঘাট না? এ কি সাগর-কেওটা?

পুষ্প যে সত্যিই দেবী, যতীন তার দিকে চেয়ে সেটা এবার ভালভাবেই বুঝতে পারলে। এমন গাঢ়ঘোবনা, শাস্ত আনন্দময়ী মূর্তি মানবীর হয় না—কি রূপই তার ফুটেচে। কি জ্যোতির্ময় মুখশ্রী! যতীন অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল।

পুষ্প বলে—না যতুদা—এ স্বর্গ। সকলের স্বর্গ তো এক নয়!...

তারপর মুহূ হেসে সলজ্জ স্বরে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলে—এ আমাদের স্বর্গ—তোমার আর আমার স্বর্গ।

৫

যতীনকে পুষ্প একটা ছোট-খাটো সুন্দর বাড়ীতে নিয়ে গেল। সে বাড়ী ইট-কাটের তৈরী নয়, যেন মনে হোল এক ধরনের মার্কেল পাথরে তৈরী, কিন্তু মার্কেল পাথরও নয় সে জিনিস। বাড়ীর চারিদিকে ফুলের বাগান, সবুজ ঘাসের মাঠ। দূরে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। পুষ্প বলে—এসব আমার তৈরী। জানো আমি এদেশে এসেছি আজ আঠারো বছর, তোমার অপেক্ষায় ঘর সাজিয়ে বসে আছি। পৃথিবীতে কেওটার গঙ্গার ঘাটের চেয়ে প্রিয়তর আমার আর কিছু ছিল না। এখানে এসে কল্লনায় তাই সৃষ্টি করেছি। এখানে ঘর বা ইচ্ছে কল্লনায় গড়ে নিতে পারে। এই বাড়ীও আমার কল্লনায় তৈরী।

যতীন বলে—কেমন করে হয়?

—এদেশের বস্তুর ওপর চিন্তার শক্তি খুব বেশী। পৃথিবীর বস্তুর মত এখানকার বস্তু নয়। আরও অনেক হুস্ম—অন্ত ধরণের, সে পরে নিজেই টের পাবে। চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করতে তোমাকেও শিখতে হবে—সৃষ্টি করতে হোলে পৃথিবীতেও যেমনি চিন্তার দরকার, এখানে তার চেয়েও বেশি দরকার। চিন্তার শক্তিকে যে বাড়াতে পেরেছে, ইচ্ছামত চালাতে পারে, সে এদেশের বড় কারিগর। কিন্তু এও যে বস্তু, সে বিষয়ে ভুল নেই; পৃথিবীর মানুষ যাকে চেনে, সে বস্তু নয়—তা হোলেও বস্তুই।

—আমার বাবা মা কোথায় পুষ্প?

—এখনই আসবেন। অমৃতের সময় তোমার মা আর আমি তোমার শিররে বসে থাকতাম। তাঁরা অস্ত্র জায়গায় থাকেন। পৃথিবী থেকে তোমাকে আনতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সন্তানের মরণের দৃশ্য তাঁদের দেখতে কষ্ট হবে ভেবে আমিই তাঁদের যেতে বায়ন করি। তোমার পৃথিবীর দেহটা বড় খারাপ দেখতে হয়ে গিয়েছিল মরণের আগে—মা গো, ভাবলে ভয় করে।

যতীন বলে—আর তোমাদের দেখলে আমার ভয় হচ্ছে না? তোমরা যে ভূত, সেটা খেয়াল আছে?

পুষ্প বল্লে—সে তো তুমিও।

যতীন বল্লে—এদেশে আর সব লোক গেল কোথায় পুষ্প? এখানে কি তুমি আর আমি দুট প্রাণী? তোমার বাবা মা কোথায়?

পুষ্প হেসে বল্লে—এটা তৃতীয় স্তরের ওপরের অঞ্চল। তুমি জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েচ বলে এখানে আসতে পেরেচ—আর এসেচ আমি এখানে তোমায় ডেকেচি, ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা করেচি তোমার ছুঁখের দিনের অবসানের জন্তে। সে সব কথা তুমি কি জানো? নইলে সাধারণ লোক মরার পরে এ জাঃগায় আসতে পারে না। আমার বাবা এখনও মরেন নি, খুব বড়ো হয়েচেন, কালনাশ আছেন, আমাদের দেশে। মা অনেক বছর স্বর্গে এসেচেন বটে, কিন্তু তিনি অস্থ জায়গায় আছেন। এ স্তরের নিয়ম এই যে তুমি যদি ইচ্ছে করো তুমি কাউকে দেখতে পাবে না, কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। তুমি আমি এখন নির্জনে খানিকটা থাকতে চাই—কতকাল তোমার দেখিনি, তোমার সঙ্গে কথা বলিনি—আমি চাইনে যে এখানে এখন কেউ আসে।

কথা শেষ করে পুষ্প একদৃষ্টে গঙ্গার দিকে চেয়ে কি যেন দেখলে। তারপর বল্লে—চলো পৃথিবীতে একবার নিয়ে যাই। তোমার মৃতদেহটা শ্মশানে দাহ করচে। তোমার দেখা দরকার।

পুষ্প যতীনের হাত ধরলে, পরক্ষণেই স্বর্গ গেল মিলিয়ে। তাদের গ্রামের শ্মশানে যতীন দেখলে সে আর পুষ্প দাঁড়িয়ে আছে। চিতার ধূম জ্বিউলি গাছটার মাথা পর্যন্ত ঠেলে উঠেচে।

যতীন হেসে বল্লে—দেখচিস্ পুষ্প, পুণ্যাত্মার চিতার ধোঁয়া কতদূর উঠেচে! পুষ্প বল্লে—আমি না থাকলে পুণ্যাত্মাগিরি বেরিয়ে যেতো।

তাদের পাড়ার ছেলে-ছোকরার দল মৃতদেহ এনেচে। বড়োদের মধ্যে এসেচেন নবীন ষাড়ুঘো। তিনিই মুখাণ্ডি করচেন। সকলেই আশালতাকে কি ক'রে থবরটা দেওয়া যায় সেই আলোচনা করচে।

যতীন হঠাৎ বলে উঠলো—পুষ্প, আশালতাকে একবার দেখবো। নিয়ে যাবি? ওর বড্ড সর্বনাশ করে গেলাম, ওর জন্তে ভারি মন কেমন করচে।

পুষ্প বল্লে—ভাবো যে তুমি আশালতাদের বাড়ী গিয়েচ। বেশ মনকে শক্ত করে ভাবো।

আশালতা স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ কিছুই জানে না, সে ছুপুরে খাওয়ার পরে আঁচল পেতে ঘুমুচ্ছে। তাকে সে অবস্থায় নিশ্চিন্ত-মনে মাটির ওপর ঘুমুতে দেখে ছুঁখে ও সহানুভূতিতে যতীনের মন পূর্ণ হয়ে গেল। আহা, হিন্দুর মেয়ে, স্বামী অভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে কি অসহায় অবস্থাতেই পড়লো! আজ হয়তো বুঝতে পারবে না—কিন্তু একদিন বুঝতেই হবে। মায়ের পাশে ছোট মেয়েটি ঘুমুচ্ছিল, খোকা পাড়ার কোথায় খেলতে গিয়েচে। এই বয়সে পিতৃহীন হোল—মতি, কি দুর্ভাগা ওরা!

পুষ্প ওসব ভাবনা যতীনকে ভাবতে দিলে না। বল্লে—চলো যাই, পৃথিবীতে বেশিক্ষণ থাকা নিয়ম না।

আশালতাকে আঁচল পেতে মাটিতে ঘুমতে দেখে পরাস্ত যতীন যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। তার আদৌ ইচ্ছা নেই স্বর্গে যেতে। তার মন আর কোথাও যেতে চায় না। পুষ্প বলে—যতীনদা, তুমি এত ভালবাসো আশাকে! ওর মত হতভাগিনী মেয়েও দেখিনি, ও তোমাকে বুঝলো না। সত্যি কষ্ট হয় ওর জন্তে, কিন্তু তুমি এখানে থেকে ওর কোনো সাহায্য করতে পারবে না। চলো যাই।

গতির বেগে পৃথিবীটা কোথায় মিলিয়ে গেল। শুধু মেঘ—মাদা মেঘ চারিদিকে। ওদের পায়ের তলায় বহুদূরে কোথায় অভাগিনী আশালতা মেঝেতে আঁচল পেতে নিশ্চিন্তমনে ঘুমতে লাগলো।

যতীন বাড়ী ফিরে এসে দেখলে একটি মহিলা তার জন্তে অপেক্ষা করছেন। প্রথমে দূর থেকে তার মনে হোল এঁকে কোথায় সে দেখেচে—কিন্তু মহিলাটি যখন ছুটে এসে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, তখন তার চমক ভাঙলো।

—বাবা মটু, বাবা আমার! আমার মানিক!...

—মা, তুমি?

যতীন মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সে অবাক হয়ে গেল। বাহ্যিক বছর বয়সে তার মায়ের মৃত্যু হয়, কিন্তু এখন তাঁর মুখে বার্দ্ধক্যের চিহ্নমাত্র নেই। তাই বোধহয় সে মাকে চিনতে পারেনি প্রথমটা।

—বাবা কোথায় মা?

যতীন কথা শেষ করে ঘরের দোরের দিকে চাইতেই বাবাকে দেখতে পেল। পঞ্চাশ বছর বয়সে যতীনের বাবা মারা গিয়েছিলেন—এ চেহারা তত বয়সের নয়। এ দেশে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ লোক নেই? যতীন বাবাকে প্রণাম করতেই তিনি এগিয়ে এসে ওকে আলীকর্ষিত করলেন। বলেন—তোমার এখনও আসবার বয়স হয়নি বাবা, আর কিছুদিন থাকলে বিষয়-সম্পত্তিগুলোর একটা গতি করতে পারতে। মাখন রায়ের জমিটা কত শখ করে খরিদ করেছিলাম কাছারীর নীলমে, সেটা—রাখতে পারলে না বাবা? আর বেচলে বেচলে ওই শশধর চক্কি ছাড়া আর কি লোক পেলো না?

যতীনের মা বলেন—আহা বাছা এল পৃথিবী থেকে এত কষ্ট পেয়ে, তোমার এখন সময় হোল পোড়া বিষয়ের কথা নিয়ে ওকে বক্তে? কি হবে বিষয় এখানে? কি কাজে লাগবে মাখন রায়ের জমা এখানে আমার বুঝিয়ে বলো তো শুন।

যতীনের বাবা বলেন—তুমি মেনেমাহুষ বিষয়ের কি বোঝ? তুমি সব কথার ওপর কথা বলতে এসো কেন? মাখন রায়ের জমা—

পুষ্প ঘরে ঢুকতে যতীনের বাবা কথা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন। যতীনের মা বলেন—পুষ্পকে চিনতে পেরেছিল তো মটু?

যতীন বলে—খুব।

—ওর মত তোকে ভালবাসতে আর কাউকে দেখলুম না। এই আঠারো-উনিশ বছর ও এখানে এসেচে, এই বাড়ীঘর সাজিয়ে তৈরী করে তোরই অপেক্ষায় বসে আছে। পুষ্প তোকে এনেচে বলেই তৃতীয় স্তরে আসতে পেরেচিস, নইলে হোত না। আর উনি এখনও দ্বিতীয় স্তরে পড়ে রইলেন। বিষয়-সম্পত্তিই ঠিক কাল হয়েচে। এসেচেন আজ ষোল বছর, বিষয়ের কথা ভুলতে পারলেন না, সেই ভাবনা সর্বদা। এত করে বোঝাই, এত ভাল কথা বলি, ঠিক চোখ সেই পৃথিবীর জমিজমার দিকে। কাজেই ওপরে উঠতে পারচেন না কিছতেই—

যতীনের মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে খানিকটা চুপ করে রইলেন। তারপর স্নেহের দৃষ্টিতে পুষ্পর দিকে চেয়ে বলেন, উন্নতি করেছে আমার পুষ্প মা। এ রকম কেউ পারে না। এত অল্প দিনে ও যেখানে আছে এখানে আসা যায় না। ওর পবিত্র একনিষ্ঠ ভালবাসা এখানে এনেচে ওকে। কত উঁচু জাতির লোকের সঙ্গে ওর আলাপ আছে, দেখিস্ এখন। তাঁরা যখন আসেন, আমি থাকতে পারিনি তাঁদের সামনে।

যতীন বলে—মা, তুমি কোন্ স্তরে আছ ?

—আমি ঠিক সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরে থাকি। ওঁকে ছেড়ে আসি কেমন করে? ওঁকে এত করে বলি, কানে কথা যায় না। ঐ দেখলে না, এখানে বেশিখণ থাকতে পারলেন না, বিশেষত পুষ্পের সামনে উনি দাঁড়াতে পারেন না, ওর ভেজ উনি সহ্য করতে পারেন না।

পুষ্প লজ্জার রাঙা হয়ে বলে—কি যে বল মা!...তারপর সে ঘরের বাইরে চলে গেল। যতীনের মা বলেন, না মটু, সত্যি বলচি শোন। তুমি নতুন এসেচ, তোমার পক্ষে এখন বোঝা অসম্ভব যে পুষ্প কত উঁচুদের আত্মা। ও যে-সব উচ্চস্তরে যায়, সেখানে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারে না সাধারণ মানুষ পৃথিবী থেকে এসে। তোমার জন্মে ও এখানে কষ্ট করে থাকে, নইলে এর অনেক উঁচুতে ওর জায়গা। আর কী ভালবাসার প্রাণ ওর, সেই কবে ছেলেবেলার সাংগন্ধ-কেঁচুতে থাকতে তোকে ভাল লেগেছিল, জীবনে সেই ওর ধ্যান জ্ঞান। তোকে আর ভুলতে পারলে না। তুই বৌমার ব্যাপারে পৃথিবীতে কষ্ট পেতিস, পুষ্পর এখানে কি কান্না! ওর মত আত্মার পৃথিবীতে যেতে কষ্ট হয়, কিন্তু তোমার জন্মে সদাসর্বদা ও সেখানে যেতো। ওকে দেখতে পাওয়া পুণ্যের কাজ।

সমুখের এই সুন্দর আকাশ, ঐ কলস্বনা ভাগীরথী, অদ্ভুত রঙের বনানী অপরিচিত বন-লতার সর্বত্র ছেয়ে সে সব অপরিচিত বনপুষ্পরাজি, এই শান্তি, এই রূপ—এও যেমন স্বপ্ন—পুষ্পের কথা, পুষ্পের ভালবাসাও তেমনি স্বপ্ন। তার জীবনে সে শুধু নিজেকে ভুলিয়ে এসেচে সুখ পেয়েচে বলে, কিন্তু সত্যিই কোনো জিনিস পায়নি কখনো—আজ মৃত্যুপারের দেশে এসে তার সারাজীবনের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেচে একথা তার বিশ্বাস হয় না। কোন্টা স্বপ্ন কোন্টা বাস্তব, তার কুড়ুলে-বিনোদপুরের বাড়ী, না এই স্বপ্নলোক? আশালতা, না পুষ্প?...

যতীনের মা বলেন—তাঁরা ওকে বড় ভালবাসেন; মাঝে মাঝে অনেক ওপরে নিয়ে যান,

তাদের রাজ্যে। আমি ওর মুখে সে সব গল্প শুনেছি, ইচ্ছে হয় এখনুনি যাই, কিন্তু আমাদের অনেক বছর কেটে যাবে সে রাজ্যে পৌঁছতে, তবুও পৌঁছতে পারবো না। সাধারণ মানুষ পৃথিবী থেকে যারা আসে তারা এত নিম্নস্তরের জীব যে, এই তুমি যে দেশে আছ, এ-ই তাদের কাছে উচ্চ স্বর্গ। অত সব উচ্চস্তরের কথা বাদই দাও।

একটা আশ্চর্য চাপা আলো আকাশের এক কোণ থেকে এসে পড়লো। সমস্ত স্থানটা অল্পক্ষণের জন্তে নীল আলোর আলো হয়ে উঠলো—আবার তবনি সেটা মিলিয়ে গেল। একটা ঠাণ্ডা, নীলোজ্জ্বল আলোর সার্চলাইট যেন দু-সেকেন্ডের জন্তে কে ঘুরিয়ে দিলে।

যতীন বল্লে—ও কিসের আলো মা ?

—যদি কিছু বলতে পারবো না বাবা। এ সব দেশের ব্যাপার ভারি অদ্ভুত, চক্ৰ-স্থিতির দেশ এ নয়। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, আমি কি করে জানবো কিসে থেকে কি হয়। দেখি চোখে এই পর্যন্ত। কেন ঘটে, কিসের থেকে ঘটে, সে সব যদি জানবো তবে তো জানী আত্মা হয়ে যাবো। পুষ্প ও জানে না, পুষ্প মেয়েমানুষ, ও ভালবাসায় বড় হয়ে এখানে এসেচে, জানে নয়। ও-সব কথার উত্তর সে দিতে পারবে না। আচ্ছা, এখন আসি মশ্টি। নতুন গবে কাল এসেচ, ক্রমে কত কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখবে, কত কি নিজেই জানতে পারবে। সময় ফুরিয়ে যাবে না, সময় এখানে অফুরন্ত, অনন্ত।

যতীনের মা চলে গেলেন।

৬

যতীন একদিন পুষ্পকে বল্লে—কত দিন হয়ে গেল এখানে এসেচি বলতে পারিস পুষ্প ? এখানে তো দিনরাত্রির কোনো হিসেব পাইনে।

পুষ্প বল্লে—পৃথিবীর অভ্যেস দূর হতে এখনও তোমার অনেক দিন লাগবে যতুদা। এখানে দিনরাত্রির কোনো দরকার যখন নেই, তখন ঘড়ি দেখা অভ্যেসটা ছেড়ে দাও। সময় যে অফুরন্ত, অনন্ত, যতদিন সেটা অনুভব না করবে, ততদিন মুক্তি হবে না। মনের বন্ধ, সংকীর্ণ ভাব দূর না হোলে মুক্তি সম্ভব নয়, যতুদা।

—কি ধরনের মুক্তি ?

—কি জানি, আমি এ সব বড় বড় কথা জানিনে, তোমার আবার আমি কি বোঝাবো যতুদা, তুমি কি আমার চেয়ে কম বোঝো ?

—বাজে কথা বলে আমার ভোলাতে চান্‌নে পুষ্প। আমি অনেক কিছু জানতে চাই, আমাকে শেখানোর ব্যবস্থা করে দিবি ? কত কি যে জানতে চাই তার ঠিক নেই। কে আমায় বলে দেবে বল্‌তো।

—আছে, লোক আছে। তোমার নিয়ে যাবো একদিন সেখানে। খুব উঁচু এক আত্মা

আমায় বড় স্নেহ করেন। আমার স্তরে আসতে তাঁর কষ্ট হয়। তাই আমিই যাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তুমি যাবে একদিন? আমি গুরুদেব বলি তাঁকে। বৈষ্ণব সাধু।

—কিন্তু আমি সে সব উচ্চস্তরে কি করে যাবো পুষ্প? মোটে সেদিন পৃথিবী থেকে এসেছি—তোমার দয়ার তাই এত উঁচু স্তরে আছি, এর চেয়েও উঁচুতে কি ভাবে যাবো?

—যাওয়া ঠিক কঠিন নয়, কিন্তু থাকতে পারবে না বেশিক্ষণ। যাতে যেতে পারো তার ব্যবস্থা আমি করবো।

—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি পুষ্প, আমার এখনও একটা সন্দেহ হয়, এ সব স্বপ্ন নয় তো?

—যাও, পাগলামি কোরো না যতদূর। তোমার একথার উত্তর অন্তত একশো বার না দিয়েছি তুমি আসা পর্যন্ত? দেখবে আর একটা জিনিস, দেখাবো? অবশি তোমার সেখানে আজ যেতেই হবে।

—কি সেটা?

—আজ তোমার শ্রাদ্ধের দিন। তোমার ছেলে নিহু কাছা গলায় দিয়ে শ্রাদ্ধ করচে। পিণ্ডদানের সময় তোমার গিয়ে হাত পেতে পিণ্ড নিতে হবে।

ছেলের কথা শুনে যতীন অন্তমনস্ক ও বিষণ্ণ হয়ে গেল। নিহু, অঁহা ছুধের বালক, তাকে কাছা গলায় দিয়ে শ্রাদ্ধ করতে হচ্ছে!...সে যে বড় করুণ দৃশ্য!

যতীন বল্লে—আমি যাবো না সেখানে।

পুষ্প হেসে বল্লে—ঐ যে বলছিলাম, তুমি এ জগতের ব্যাপার কিছুই জানো না। সে ছেলেমাছ, যখন কচি হাতে ছলছল চোখে তোমার নামে পিণ্ড দেবে, সে এমন আকর্ষণ, তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে। তোমার সাধ্য কি তুমি না গিয়ে থাকো? খুব ভালবেসে যে টানবে, তার টান এ জগতে এড়ানো যায় না। পৃথিবীর স্থল দেহে স্থল মন বাস করে—এখানে তা নয়। এখানে মন আপনা-আপনি বুঝতে পারবে কোন্টা সত্যিকার ভালবাসা, বুঝে সেখানে যাবে। আচ্ছা তুমি ব'সো, আমি একবার দেখে আসি ওদিকে কি হচ্ছে।

পৃথিবীর হিসাবে মিনিট-তুই সময়ও তারপর চলে যায় নি, পুষ্প হঠাৎ কোথায় চলে গেল এবং ফিরে এসে বল্লে—ওখানে এখন সকাল সাতটা। শ্রাদ্ধের আয়োজন শুরু হয়েছে। নিহু কিন্তু এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। যতীনের আগ্রহ হোল জিজ্ঞেস করে—আশা কি করচে। সে ভরানক ব্যাকুল হয়েছে আশার খবর জানবার জন্তে। কত দিন খবর পায় নি। আশা কেঁদেছিল, চোখের জল ফেলেছিল তার মৃত্যুসংবাদে?

জানবার জন্তে সে মরে যাচ্ছে, কিন্তু লজ্জা করে পুষ্পকে এসব কথা বলতে। যতীন বুড়োশিবতলার ঘাটের রানায় চূপ করে বসে রইল। সামনে কুলু-কুলু-বাহিনী গঙ্গা, নীল আকাশের তলা দিয়ে একদল পানী উড়ে এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে। ঘাটের ওপরে বৃদ্ধ-বটের শাখার নিবিড় আশ্রয়ে একটা অজানা গায়ক-পানী অতি মধুর স্বরে ডাক্চে। যতীনের মন আজ অত্যন্ত বিষণ্ণ। আশা খুব কেঁদেছিল? আশাকে সে বড় নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে

রেখে এসেচে—স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীপুত্রকে সুখে রাখা, তার অভাবে তারা কষ্ট না পায় তার ব্যবস্থা করা। সে অকর্ষণ্য স্বামী; নিজের কর্তব্য পালন করার শক্তি তার ছিল না। আশাকে সে স্থখী করতে পারেনি একদিনও।

পুষ্প এসে বল্লে—বৌদিদির কথা ভেবে যে সারা হোলে, যত্নদা!

তারপর সম্মুখে গুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—চল তোমাকে একজায়গায় নিয়ে যাই। বৌদির কাছে নিয়ে যেতাম—কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে বেশি যোগাযোগ এখন তোমার পক্ষে ভাল নয়। তা ছাড়া তুমি তার কোনো উপকারও করতে পারবে না এ-অবস্থায়।

—কোথায় নিয়ে যাবি পুষ্প?

—অনেক উচ্চ এক স্বর্গে। নতুন এসেচ পৃথিবী থেকে, তোমরা বুঝতে পারবে না। মনে করলেই সেখানে যাওয়া যায় না। তোমার যাওয়া সম্ভব হবে শুধু আমি নিয়ে যাবো বলে। তুমি কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে সকল রকম চিন্তা মন থেকে তাড়াও।

—তা আমি পারবো না পুষ্প। তোর বৌদি বড় অভাগিনী, তার কথা ভুলতে পারবো না।

—দয়া বা সহানুভূতি তোমার নামাবে না, ওপরে ওঠাবে। তাই ভেবো যত্নদা, কিন্তু সাবধান, বিষয়-সম্পত্তির কথা যেন ভেবো না—খ্রিস্টুর অবস্থা হবে। এসো আমার সঙ্গে।

দুজনে শূন্যপথে নীলাভ শূন্য-সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে উড়ে চললো। ডাইনে বায়ে অগণিত তারালোকে, মুহূ নক্ষত্রজ্যোৎস্নার ভাসানো জীবনপুলক ওদের মুক্ত দেহে এনেচে শিহরণ, প্রাণে মুক্তির আনন্দ—দূর...দূর...বহুদূর তারা চললো...কত নতুন অজানা দেবলোক...

ক্রমে আর একটা নতুন লোকের ওরা সমীপবর্তী হতে লাগলো...দূর থেকে তার সৌন্দর্য্য যতীনের সমস্ত জৈবিক চেতনা অবশ্য হয়ে এল—বিলুপ্তপ্রায় চেতনার মধ্যে দিয়ে তার মনে হোল বহু কদম্বফ্রম যেন কোথায় মুকুলিত, লতানিকর বিকশিত, জ্যোৎস্নাপ্রাণিত গিরিগ্রামে বহু বিহগকণ্ঠের কাকলী, প্রেম...স্নেহ...স্বগভীর স্নেহের নিঃস্বার্থ আত্মবলি...আরও কত কি...কত কি...সে সবেম স্পষ্ট ধারণা ওর নেই...ওর চেতনা রইল না...পুষ্প বিব্রত হয়ে পড়লো—যতীন অত উচ্চ স্তরে যে সচেতন থাকবে না, পুষ্পের অভয় হয়েছিল, তবুও তার আশা ছিল চেষ্টা করলে নিয়ে যাওয়া কি এতই অসম্ভব...একবার সে দেখবে।

না, যতীন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে। যতীনের দেহটাকে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু ওর মন থাকবে নিদ্রিত। কিছুই দেখবে না, জানবে না, শুনবে না। নিয়ে গিয়ে লাভ কি?

পুষ্প ডাকতে লাগলো—ও যত্নদা...চেয়ে থাকো, কোথায় যাচ্চ ভেবে দেখো...আমি পুষ্প, ও যত্নদা...চোখ চাও...

নিকটেই একটা বেগুনি রঙের শৈলশৃঙ্গ...বহু লতাপাতার আড়ালে একটা শিলাখণ্ডে যতীনকে সে শোওয়ালে। সংজ্ঞা হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যতীনের গতি বন্ধ হয়ে গিয়েচে...নিকটের ঝরণা থেকে জল এনে ওর মুখে দিয়ে পুষ্প আঁচল দিয়ে ওকে বাতাস করতে

লাগলো। পরে নিজের দেহের চৌর্যক শক্তি আঁড়ুল দিয়ে ছুঁয়ে ওর দেহে সঞ্চালিত করতে লাগলো।

এমন সময়ে পুষ্পের দৃষ্টি হঠাৎ আকৃষ্ট হলো ওই উচ্চ শিখরটার প্রান্তদেশে। সেখানে পরম সুন্দর এক তরুণ দেবতা বহুদূরে মহাশূন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছেন আনমনে। কোনো দিকে তাঁর খেয়াল নেই, কি যেন ভাবছেন। তাঁর অঙ্গের নীলাভ জ্যোতি দেখে বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে পুষ্প বুঝলে এ অতি উচ্চ শ্রেণীর আত্মা, দেবতা-গোত্রে চলে গিয়েছেন—মাহুঘের কোনো পর্য্যায়ে ইনি এখন আর পড়েন না।

পুষ্প জানতো এই জগতে যে যত পবিত্র, উচ্চ, সে দেখতে তত রূপবান, তত তরুণ। তারুণ্য এখানে নির্ভর করে না জন্মের তারিখের দূরত্ব বা নিকটত্বের ওপরে। এখানে দেহের নবীনতা ও সৌন্দর্য্য একমাত্র নির্ভর করে আধ্যাত্মিক প্রগতির ওপরে। এরূপ ও নবীনতা পৃথিবীর হিসেবে যোলা সতর বছরের অতি রূপবানু কিশোর বালকের মত—অত্যন্ত উচ্চ স্তরের দেবতা ভিন্ন এ রকম হয় না।

দেবতার ধ্যানভঙ্গ করতে পুষ্পের সাহস হোল না। সে এত উঁচু আত্মা কখনও দেখেনি। কি করবে ভাবচে, এমন সময় দেবতার অন্তরমনস্ক চক্ষু অল্পক্ষণের জন্তে ওদের দিকে পড়লো। পরক্ষণেই তিনি অতীব জ্যোতিমান ছুটি চোখ দিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখলেন। একটু বিস্ময়ের সুরে বলেন, কে তোমরা?

পুষ্প প্রণাম করে বলে—সবই তো বুঝছেন, দেব।

এইবার যেন দেবতার অন্তরমনস্ক একাগ্রতা কিছু ভয় হোল—বর্তমান সময়ে তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন। বলেন—কি বলো তো? আমার যোগ নেই এ স্তরের সঙ্গে। বুঝতে পারবো না।

পুষ্প নিজের পক্ষিচর দিয়ে তাঁর গন্তব্যস্থানের কথা ও যতীনের অবস্থা সব বললে।

আত্মা বলেন—ওকে যেখানে এনে ফেলো, এখানেও তো ওর চৈতন্য হবে না—ওর পক্ষে এও তো অতি উচ্চ স্থান; নিচে নামিয়ে নিয়ে যাও ওকে।

পুষ্প বলে—আপনি কে বলুন দেবতা, আমার কত শুভদিন আজ, আপনাকে দেখলাম। এতকাল তো আছি এ জগতে, আপনার মত আত্মা কখনও দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। আপনি কে দেব?

আত্মা অতি মধুর প্রসন্ন হাসি হেসে বলেন—তুমি অত জানতে চাও কেন? তুমি ভারত-বর্ষের কস্তা, ভক্তি তোমার জন্মগত। বিশ্বাস কর, এই মাত্র। তুমিও খুব উচ্চস্তরের আত্মা, নইলে আমার দেখতে পেতে না। তোমার সঙ্গীকে যদি আমি জাগিয়েও দিই, ও আমার দেখতে পাবে না। যাও ওকে নামিয়ে নিয়ে যাও।

তবু পুষ্প সাহসে নির্ভর করে বলে—আপনি কে দেব?...পাহাড়ের চূড়োতে বসে ছিলেন কেন? এ স্তর তো আপনার নয়।

কথাটা শেষ করেই পুষ্প বুঝলে আত্মা তখনই বড় হয়, যখন প্রেমে সে বড় হয়। সামান্য

পৃথিবীর মেয়ের এই প্রগলভ কথার আত্মা চটে তো গেলেনই না, কৌতুকমিশ্রিত গভীর স্নেহে তাঁর সুশ্রী বিশাল জ্যোতির্ষয় চোখ দুটি স্নিগ্ধ হয়ে এল। বল্লেন—দেখবে কি দেখছিলাম? এসো এখানে। তোমায় দেখাবো, তুমি তার উপযুক্ত হয়েচো।

পুষ্প আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে গেল। আত্মা শৈলশৃঙ্গের প্রান্তনীমার দিকে দাঁড় করিয়ে হাত দিয়ে ওকে স্পর্শ করে বল্লেন—দেখচ?

পুষ্পের সারাদেহ শিউরে উঠলো। সামনে এ এক অতৃপ্ত পৃথিবী, বিশাল জলাভূমিতে বড় বড় অতিকায় জীবজন্তু কর্দ্দমে ওলট-পালট খাচ্ছে—গাছপালার একটিও পরিচিত নয়। বাতাসে অস্বাচ্ছন্দ্যকর গরম জলীয় বাষ্প—সূর্যের তেজ অতিশয় প্রখর...তারপর ছবির পর ছবি...কত দেশ, কত যুদ্ধ, কত সৈন্যদল...কত প্রাচীন দেশের বেশভূষা পরা লোকজন...প্রশস্ত রাজপথ, প্রাচীন দিনের শহর...পচা ডোবা খানা শহরের রাজপথের পাশেই...ঘোর মহামারীতে দলে দলে লোক মরচে, কী বীভৎস দৃশ্য!

আত্মা বল্লেন—বহু দূর অতীতে কিরে চাইছিলাম! কত কল্প আগেকার আমারই বহু পূর্ব জন্মে। কত লোককে হারিয়েচি, কত মধুর হৃদয়—আর কখনো খুঁজে পাইনি। বিশ্বের দুর্ঘ প্রান্তের মোহনার বসে তাদের কথা মনে পড়ছিল। যা দেখলে, সব আমার জীবনের বিভিন্ন অঙ্কের রঙ্গভূমি। লক্ষী মেয়েটি, এখন তোমার সঙ্গী ছেলেটিকে নিয়ে নেমে যাও।

পুষ্প তাঁকে প্রণাম করে বিনীত ভাবে বল্লেন—আপনার দেখা আবার কবে পাবো?

—যখন স্মরণ করবে। একমনে স্মরণ করলেই আসবো—কিন্তু যখন তখন আমার কষ্ট দিও না। আমার নানা কাজ, কোথায় কখন থাকি। কল্প-পর্বতে সঙ্গীত যেদিন বাজবে, চুষকের চেউ কম থাকবে, সেদিন আমায় ডেকো।

কল্পপর্বতের সঙ্গীত কি, পুষ্প তা জানতো। চতুর্থ স্তরে একটি সুনির্জ্জন পাহাড়ে বহু শতাব্দী ধরে এক নির্দিষ্ট সময়ে আপনা-আপনি অতি মধুর অপার্থিব সঙ্গীতধ্বনি ওঠে। কত কাল পূর্বে জৈনক পবিত্র আত্মা ঐ স্থানটিতে বসে নূতন সুর সৃষ্টি করতেন—কোনো বড় সুরশিল্পী হবেন। ওপরের স্বর্গে উঠে গিয়েচেন বহুকাল, কেউ তাঁকে এখন আর দেখে না—কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময়ে এখনও তাঁর সৃষ্ট সুরপুঞ্জ স্বর্গমণ্ডলের অজ্ঞাত কোণটি ছেয়ে যায়।

দেবতা বিদায় নিলেন—বহুদূরব্যাপী নভোমণ্ডল জ্যোতির্ষয় হয়ে উঠলো তাঁর দেহজ্যোতিতে। তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও যেন ঋণিকঙ্গণ আকাশটা আলো হয়ে রইল।

পুষ্প অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইল। এত রুড় দেবতা এতদিন এখানে থেকেও কখনো সে দেখে নি।

যতীনের চেতনা কিরে এল বাড়ীতে ফিরবার পথেই।

পুষ্পকে বল্লে—এ কোথায় যাচ্ছি আমরা, এখনও পৌঁছাই নি?

পুষ্প বল্লে—না, চলো বাড়ী কিরে যাই। সেখানে এখন তোমার যাওয়া চলবে না। তুমি পথে এমন হয়ে পড়লে! চতুর্থ স্তর পার হতে না হতেই তোমার সংজ্ঞা চলে গেল। পঞ্চম স্তরে নিয়ে যাই কি করে? উঃ, একটা অদ্ভুত জিনিস তুমি দেখলে না।

তারপর পুষ্প সবিস্তারে উন্নত আত্মাটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে। বল্লে—আমার বড় ইচ্ছে ছিল তুমি দেখতে পাও, কিন্তু বুকলুম তিনি এখন তোমায় দেখা দিতে ইচ্ছুক নন। তুমি দেখতে পাবেও না।

যতীনের মনে পড়লো তার মায়ের সঙ্গে যেদিন কথা বলছিল আকাশের দূর প্রান্তে অমনি একটা অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতির্লিখা দেখা গিয়েছিল, পুষ্প যেমন বর্ণনা করলে তেমন। পুষ্পকে সে কথা বল্লে। পুষ্প বল্লে—আমি জানি, ও আলো সব সময়ই উচ্চ আত্মাদের, যাদের আমরা দেবতা বলি, তাঁদের গতিবিধির পথে দেখা যায়। উদ্ধার মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁদের পথ, যখন তাঁরা যান। অত শুদ্ধ আত্মা কিন্তু আমাদের স্তরে কমই আসেন, খুব কমই দেখা যায়।

—দেখ পুষ্প, আমি তোমার এখানে এসে ভাবতুম কত উঁচু স্তরেই এসেছি! আজ আমার সে অহঙ্কার ভেঙে গেল। অত সব উঁচু স্তর আছে, তা কি জানতাম!

পুষ্প হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বল্লে—এ কথা তো কখনো শুনিনি! তুমি ভাবতে আমাদের এই বুঝি বৈকুণ্ঠধাম? তবে তুমি নতুন এসেচ পৃথিবী থেকে, তোমার দোষ কি, যারা এখানে অনেকদিন আছে তারাও জানে না। আমি শুনেছিলাম এক শুদ্ধ আত্মার কাছে, যার কাছে তোমায় নিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন সপ্তম স্তর পর্যন্ত আছে, যেখানে পৃথিবীর মানুষ যেতে পারে। তার ওপরেও অসংখ্য স্তর আছে, তবে সে সব অঞ্চলের খবর তিনিও জানেন না। সে সব পৃথিবীর মানুষের জ্ঞান নয়।

—আর আমি চতুর্থ স্তর ছাড়িয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম!

—তা যদি না হোত, আমি বৌদিকে এনে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতাম।

যতীন আগ্রহের সঙ্গে কিন্তু কিছু অবিশ্বাসের সুরে বল্লে, আশাকে? কি করে?

—সে ঘুমিয়ে পড়লে তার স্বপ্ন দেহ স্থূল দেহ থেকে বার করে। এরকম করা যায়, আমি করতেও জানি। কিন্তু বৌদির কোন জ্ঞান থাকবে না, যখন তাঁকে এখানে আনা হবে। তোমার মত অচৈতন্য হয়ে যাবে, দ্বিতীয় স্তর পার না হতেই। এই এ জগতের নিয়ম। যে স্তরের যে উপযুক্ত নয়, সে স্তরে পৌঁছলে তার চেতনা লোপ পায়। কার সঙ্গে কথা কইবে যতুদা?

—কোনো উপায় নেই পুষ্প? আমরা পৃথিবীতে গিয়ে দেখা দিতে পারি নে?

—প্রথমত, তা পারা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। আর যদিও বা পারা যায়, তাতেও কোনো ফল

হবে না। বৌদিদি পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়ে, মাহুঘ মরে কোথায় যান্ন, তাদের কি অবস্থা হয়, এসব সম্বন্ধে কিছু জানে না। মন কুসংস্কারে পূর্ণ। তোমায় দেখে সে এমনি ভয় পাবে যে তোমার যে ভ্রম্ভে যাওয়া বা দেখা দেওয়া, তা হবে না।

যতীন কিছুতেই ছাড়েনা। তার সনির্বাক অহুরোধে পুষ্প অবশেষে ওকে আশার কাছে নিয়ে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে রাজী হোল। যতীন বলে, আজই চলো।

পুষ্প ঘাড় নেড়ে বলে—এখন গুরুপক্ষের জ্যোৎস্নারাত্রি পৃথিবীতে! ওর আলোর ঢেউ আমাদের দেহ দারণ করে দেখা দেওয়ার পক্ষে বড় বাধা। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে অনেক সহজ হবে। ক’টা দিন সবু করো না!

তারপর একদিন ওরা কৃষ্ণাশ্বিনী তিথিতে দুজনে পৃথিবীতে নেমে গেল। যতীন নতুন পৃথিবী থেকে গিয়েচে, সে স্পষ্টই সব দেখতে লাগলো, কিন্তু পুষ্প অনেক দিন উচ্চস্তরে কাটানোর ফলে ওর সব ঝাপসা, অস্পষ্ট কুয়াসার মত ঠেকচে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তার কষ্ট হতে লাগলো।

ওরা বেশি রাতে আসে নি, কারণ আশা তখন ঘুমিয়ে পড়বে, ওদের দেখবে কি করে?

পুষ্প বলে—খুব ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করো। খুব জোর করে ভাবো যে আমি আশাকে দেখা দেবো, দেবো, দেবো। তুমি বেশিদিন পৃথিবী ছেড়ে যাওনি, তোমার দেহ স্থলচোবে দেখা যাবে তা হোলো।

পৃথিবীর হিসেবে দুঘণ্টা প্রাণপণে চেষ্টা করেও যতীন নিজের দেহ কিছুতেই আশার চোখে দৃশ্যমান করতে পারলে না। আশা রান্নাঘরে যাচ্ছে আসচে, ছেলেদের বাইরে আঁচিয়ে দিলে, ঘরে গিয়ে বাবার ভ্রম্ভে পান সাঁজলে, দোতলার ঘরে একা গিয়ে ছেলে-মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এল। যতীন সব সময় ওর পাশে পাশে সামনে, রোয়াকে, ঘরে, দোতলার উঠবার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থেকেও কিছুতেই কিছু করতে পারলে না। কতবার ডাকলে—আশা, ও আশা, এই যে আমি, ও আশা—আশা? আমি এসেচি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

আশা ওকে টেরও পেলেনা। এমন কি মনেও কিছু অনুভব করলে না। পুষ্প বলে, আচ্ছা, এখন থাক। ওর মন এখন চঞ্চল অবস্থায় রয়েছে। যখন বিছানায় এসে শোবে, প্রথম তন্দ্রা আসবে, তখন মন হবে শান্ত, স্থির, একাগ্র। সেই সময়ে সামনে দাঁড়িও।

যতীন বলে—উহ, সে হবে না। ওর হারিকেন লর্ডন ঘরে সারারাত জালিয়ে ঘুমুনো অভ্যাস। সে আলোতে তো কোনো কাজই হবে না!

—আচ্ছা সে হবে এখন। তুমি সেজন্তে বাস্তব হয়ো না। আমি চেষ্টা করবো এখন।

ততক্ষণ যতীন পুষ্পকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর বাইরে গেল। এই তার স্বপ্নর বাড়ীর দেশ। প্রথমে সে যখন এখানে আসে তখন ওই মজুমদারের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে আরও পাড়ার পাঁচজন নতুন জামাইয়ের সঙ্গে পাশা খেলে তাস খেলে কত ছপুস সন্ধ্যা কাটিয়েছে! ওই সেই যত্ন ভড়ের পুত্র, যেখানে মস্ত বড় কুইমাছ ধরেছিল ছিপে, সেই প্রথম ও শেষ। ও: মাছটা

ঘাটের ঐ পৈঠাটার ওপর পড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল জলে, ওরই বড়শালা, আশার ভাই ছেনি জাল দিয়ে মাছটা ধরে ফেলে। সে সব এক দিন গিয়েচে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠলো—ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

ওরা দুজনেই ফিরে চাইলে। যত ভড়ের ছেলে শ্রীশ ভড় গাডু হাতে পুকুরের ঘাটে নামতে গিয়ে হাঁ করে অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে—হাত কুড়ি-পঁচিশ দূরে।

পুষ্প বলে,—তুমি পৃথিবীর ভাবনা খুব একমনে ভাবছিলে, তোমায় দেখতে পেয়েচে। পরক্ষণেই দেখা গেল শ্রীশ গাডু ঘাটে রেখে ওদের দিকে এগিয়ে আসচে, সে যে পুষ্পকে দেখতে পাচ্ছে না—সেটা বেশ বোকাই গেল। তার বিস্মিত দৃষ্টি শুধু যতীনের দিকে নিবদ্ধ। পরক্ষণেই কিন্তু সে থমকে দাঁড়িয়ে ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। যতীন তো অবাক। ভয়ে চীৎকার করে কেন? সে বাঘ না ভালুক?

শ্রীশ ভড়ের গলার আওয়াজ পেয়ে ততক্ষণ তাদের বাড়ীর মধ্যে থেকে, পাশের নিমাই ভড়ের বাড়ী থেকে, ওর জ্যাঠামশাই নন্দ ভড়ের বাড়ী থেকে অনেক লোক ছেলেবুড়ো বেরিয়ে এল। সকলের সমবেত ভদ্র প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—উঃ কি কাণ্ড! এমন তো কখনো দেখিনি!

সবাই বলে—কি, কি, কি দেখলি রে?

—ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিল সাদামত দিবা একজন মানুষ। যেমন ডেকেচি, অমনি মিলিয়ে গেল। বাপ...না রে বাপু, সপষ্ট নিজের চোখে দেখলাম, তোমরা বলচো চোখের ভুল! আমি কি গাঁজা খাই যে চোখের ভুল?

সবাই গোলমাল করতে লাগলো, দু-একজন সাহসী লোক এগিয়ে দেখতে এল লেবুগাছের আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা, যতীনের আশেপাশে যাতায়াত করচে অথচ সে আর পুষ্প সেইখানেই দাঁড়িয়ে।

যতীন কৌতুকের হাসি হেসে বলে—লোকগুলো কানা নাকি? খুঁজচে যাকে, সে তো এখানেই দাঁড়িয়ে।

পুষ্প খিল খিল করে হেসে বলে—যাক ভালই হয়েছে তোমায় চিনতে পারে নি। চিনতে পারলে বলতো, মুখুয়াদের বাড়ীর জামাই ভূত হয়ে লোকের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৌদিদি শুনলে কষ্ট পেতো। লোকে বলতো গতি হয় নি। কেমন, শখ মিটলো তো? নিরীহ লোককে আর ভয় দেখিয়ে দরকার কি, চলো পালাই।

৮

বুড়োশিবতলার ঘাটে অশ্বখতলায়, যতীন অন্তমনস্ক হয়ে বসে ছিল।

পুষ্প মাঝে মাঝে কোথায় যায়, আজও বেরিয়েচে। তার নানা কাজ, কোথায় কখন ঘোরে। পুষ্পকে যতীন খানিকটা বোঝে, খানিকটা বোঝে না। পুষ্পের ভালবাসায়

সেবাযত্নে তার বহুদিনের বৃদ্ধ প্রাণ তৃপ্ত হয়েচে বটে কিন্তু সঙ্গিনী হিসাবে যতীনের মনে হয় পুষ্প অনেক অনেক উঁচু। সে পুষ্পকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, এমন কি কিছু কিছু ভয়ও করে। তার সঙ্গে কিন্তু মন খুলে কথা বলা যায় না, বলতে চাইলেও মুখে অনেকটা আটকে যায়। এমন সুখ, শান্তি, আনন্দের মধ্যেও যতীন নিজেকে খানিকটা একা মনে না করে পারে না।

আশা, আজ যদি আশা...

এই সব সুন্দর দিনে, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বসে আশার কথাই মনে হয়। আরও মনে হয় সে বড় হতভাগিনী, তার এত ভালবাসা আশা বোঝেনি; আশা যদি বুঝতো, তার মূল্য দিত, হতভাগিনী নিজেই কত তৃপ্তি পেতো।

তার ইচ্ছা হয় যখন তখন আশার কাছে যায়। কিন্তু পুষ্প তাকে যেতে দেয় না। এর কারণ যতীন জানতো না। আশার জীবনের অনেক ব্যাপার পুষ্প যা জানে যতীন তা জানে না। পাছে সে সব দেখলে যতীনের মানসিক যন্ত্রণা বেড়ে যায়, সেজন্তে পুষ্প প্রাণপণে সে সব জিনিস ওর দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। যার কোনো প্রতিকার করবার ক্ষমতা নেই, তা ওকে জানতে দিয়ে কোনো লাভ নেই।

যতীন জানতো আশা খেয়ালের বশে অভিমান করে বাপের বাড়ী গিয়ে উঠেছিল এবং অভিমানের দরুনই তার সঙ্গে দেখা করে নি। তার নিষ্ঠুরতা, সেও অভিমানশীল। আশার চরিত্রের আসল দিক পুষ্প কত কৌশলে ঢেকে রেখেচে যতীনের কাছে তা একমাত্র জানতেন যতীনের মা। পাছে ওর চোখেও সে সব ধরা পড়ে যায়, এই ভয়ে নিজে সঙ্গে না নিয়ে যতীনের একা আশার কাছে যেতে দিত না। যতীনের একা যাবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও একা পৃথিবীতে যেতে সে তেমন সাহস পায় না—একদিন যাবার চেষ্টা করে খানিকটা গিয়েছিলও, হঠাৎ মধ্যপথে কে যেন ওকে চোকো কাঠের বাক্সের আকারের ঘর তৈরী করে তার মধ্যে বন্দী করবার চেষ্টা করতে লাগলো। ও এগিয়ে যায়, একটা ঘর ফুঁড়ে বার হয়, আবার সামনে ঐ রকম কিউব দিয়ে সাজানো ঘর আর একটি তৈরী হয়—সেটা অতি কষ্টে পার হয়, তো আর একটা। দ্বিতীয় স্তরের অপেক্ষাকৃত স্থূল অথচ অত্যন্ত নমনীয় বস্তুপুঞ্জের ওপর ওর নিজের চিন্তাশক্তি কার্য্য করে আপনা-আপনিই এই রকম কিউব-সাজানো দেওয়ালের বেড়াঙ্কাল সৃষ্টি হচ্ছিল—চিন্তার সংঘর্ষ বা পবিত্রতা অভ্যাস না করলে এই সব নিম্নস্তরে যে ও রকম হয় তা যতীনের জানা ছিল না—যতীন যত ভয় পায়, ততই তার মনের বল কমে যায়—ততই সে নিজের সৃষ্টি কিউবরাশির মধ্যে নিজেই বন্দী হয়। জনৈক উচ্চস্তরের পথিক-আত্মা তাকে সে বিপদ থেকে সেদিন উদ্ধার করেন। সেই থেকে একা পৃথিবীতে আসতে ওর ভরসা হয় না।

আজও বসে ভাবতে ভাবতে আশার জন্তে সহানুভূতি ও ছুখে ওর মন পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু কি করবার আছে তার, অশরীরী অবস্থায় আশার কোনো উপায়ই সে করতে পারে না—অন্তত করবার উপায় তার জানা নেই।

হঠাৎ তার প্রবল আগ্রহ হোল আর একবার সে আশার কাছে যাবার চেষ্টা করবে। এলোমেলো চিন্তা মন থেকে সে দূর করবে—ভেবে ভেবে চণ্ডীর একটা শ্লোক তার মনে পড়লো...

যা দেবী সৰ্বভূতেষু দয়াক্রপেণ সংস্থিতা

নমস্তুভ্যৈ নমস্তুভ্যৈ নমস্তুভ্যৈ নমোনমঃ ॥

এই শ্লোকটা একমনে আবৃত্তি করতে করতে সে ইচ্ছা করলে যে পৃথিবীতে যাবে—আশাদের বাড়ীতে—আশার কাছে। পরক্ষণেই সে অতুভব করলে সে মহাশূন্তে মহাবেগে কোথায় নীত হচ্ছে, গতির বেগে তার শরীরে শিহরণ এনে দিলে, মন মাঝে মাঝে অস্ত্রদিকে যায়, আবার কিরিয়ে এনে জোর করে চণ্ডীর শ্লোকের প্রতি নিবন্ধ করে।

এই তো তার স্বপ্নবাড়ীর পুকুর। ঐ তো সামনেই বাড়ী। বড় মজার ব্যাপার। এটা এখনও যতীন বুঝতে পারে না, কি করে সে চিন্তা করা-মাত্রেই ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছে গেল। এরোগ্লেন যারা চালায়, তাদের তো দিক্‌ভুল হয়, কত বিপাকে বেঘোরে কষ্ট পায়—কিন্তু কি নিয়ম আছে এ জগতে যে, জনৈক অজ্ঞ আত্মা শুধু মাত্র চিন্তা দ্বারা গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছয়।

রাত্রি...আশা দোতালার ঘরে ঘুমুচ্ছে, ও গিয়েতার শিয়রে বসলো। খানিকটা পরে দেখলে আশার দেহের মধ্যে দিয়ে ঠিক আশার মত আর একটি মূর্তি বার হচ্ছে। যতীন শুনেছিল গভীর নিদ্রার সময় মাতুষের স্বপ্নদেহ তার স্থলদেহ থেকে সাময়িক ভাবে বার হয়ে ভুবলোকে বিচরণ করে। কিন্তু আশার এই স্বপ্নদেহ দেখে যতীন বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে গেল। 'কি জ্যোতি-হীন, শ্রীহীন, অপ্রীতিকর মেটে সিঁদুরের মত লাল রঙের দেহটা! চোখ অধিনির্মীলিত, ভাবলেশহীন, বুদ্ধিলেশহীন...একটু পরে সে দেহের চক্ষুদুটির দৃষ্টি যতীনের দিকে স্থাপিত হোল—কিন্তু সে দৃষ্টিতে এমন কোনো লক্ষণ নেই, যাতে যতীন বুঝতে পারে যে আশা ওকে চিনেচে বা ওর অস্তিত্ব সন্ধ্যা ও সচেতন হয়েছে। যেন মুমূর্ষু লোকের চোখের চাঁউনি—খা কিছু বোঝে কিছু বোঝে না, চেয়ে থাকে অথচ দেখে না। যতীন ভুবলোকের অল্পদিন-সম্রাট সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলে, আশার স্বপ্নদেহ অত্যন্ত অপরিণত এবং আদৌ উচ্চতর স্তরের উপযুক্ত নয়। সে জিজ্ঞেস করলে—আশা, কেমন আছ? আমায় চিনতে পারো?

আশার চোখে-মুখে এতটুকু চৈতন্ত জাগলো না...সে যেন ঘুমুচ্ছে। যতীন চতুর্থ স্তরে যেমন অবস্থায় পড়েছিল, আশার ভুবলোকে অতি নিম্ন স্তরেই সেই অবস্থা। এখন ও যদি পৃথিবীর স্থল দেহটা হারায়, এ লোকে এসে মহাকষ্ট পাবে, কারণ যে দেহটা নিয়ে এ লোকের সঙ্গে কারবার সে দেহটাই ওর তৈরী হয় নি। সত্যঃপ্রসূত অন্ধবিড়াল ইঁদুর ধরবে কেমন করে?

অর্থাৎ আশা অতি নিয়ন্ত্রণীয় আত্মা। যতীন আরও কয়েকবার নিজের অস্তিত্ব সন্ধ্যা আশাকে সচেতন করার ব্যথা চেষ্টা করে ব্যথিত মনে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে।

সেদিনই বুড়োশিবতলার ঘাটে গঙ্গার ধারে এক ব্যাপার ঘটলো।

পুষ্প ও যতীন দুজনে নিজেদের বাড়ীর সামনে বাগানে বসে গল্প করচে। যতীন পুষ্পকে পৃথিবীতে যাওয়ার কথা কিছুই বলে নি। ওরুও পুষ্প সব ব্যাপার জানে। পাছে মনে কষ্ট পায় এই জন্তে যতীনকে লে বলে নি যে সে জানে। হঠাৎ আকাশের এক কোণে নীল উজ্জল আলো দেখা গেল—গন্ধার ওপার ওপার, ওদের বাড়ী, ঘর, বাগান, বৃন্দোশিবতলার ঘাট, এমন কি ওপারের শ্যামাসুন্দরীর ঘাট পর্যন্ত সে আলোর উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। পুষ্প শব্দবাস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বসে—ত্যাখো, ত্যাখো, কোনো দেবতা যাচ্ছেন—চেয়ে ত্যাখো—

পরক্ষণেই যতীনের মনে হোল একটা বিরাট প্রজলন্ত উল্কা তাদের বাড়ীর অদূরে উগ্ৰভ্রমণ করছে। লিলির ঝোপের ধারে এত প্রখর আলো বিকাশ করে এসে পড়লো যে, দুজনেরই চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার তীক্ষ্ণ উজ্জল তীব্রতায়।

ওরা আশ্চর্য্য হয়ে ছুটে গিয়ে দেখলে যে এক মহাজ্যোতির্ষ্মদেহধারী পুরুষ ঝোপের ধারে বসে পড়েন। এমন মহিমময় শ্রী যে পৃথিবীর মানুষের হয় না—তা হবার দেখে বুঝতে হয় না।

দুজনেই বিস্ময়ে ভরে আড়ষ্ট হয়ে দূরে থেকে চেয়ে দেখতে, এমন সময় দেবতার নিকট থেকে পুষ্পের নিকট পর্যন্ত একটা ম্যাজেস্তা রঙের আলোর চওড়া শিখা সাপের মত কুটিল বক্র আকৃতি ধরে একবার খেলে গেল। একটা বড় দশ ব্যাটারির টর্কের আলো কে যেন একবার টিপে তখন বন্ধ করলে।

পুষ্প বুঝলে এটা কি। অতি উচ্চশ্রেণীর দেবতাদের বিদ্যাতের ভাষা!

পঞ্চম স্তরের সেই আত্মার কাছে পুষ্প একথা শুনেছিল।

তিনি বলেছিলেন, উচ্চতন লোকে—নবম বা দশম স্তরের ওপরেও যে সব উচ্চ স্তর, সেখানে দেববিবর্তনের জীবেরা বাস করেন। মানুষের সর্বপ্রকার ধারণার অতীত তাঁদের ক্রিয়াকলাপ—তাঁদের সে বিরাট জীবনের সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকই বা কি, সাধারণ প্রেতলোকের আত্মারাই বা কি, কোনো খবর জানে না। মুখের ভাষায় তাঁরা কথা বলেন না—তাঁদের প্রকাশের ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আঙুলের বা বিদ্যাতের ভাষায় চলে তাঁদের কথাবার্তা।

পুষ্প হাতজোড় করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। পুনরায় মহাবাস্তব ও ক্ষিপ্ত আর একটা তীব্র বিদ্যুৎ-শিখা ওকে এসে স্পর্শ করতেই ওর মনের মধ্যের চিন্তায় এই প্রশ্ন জাগলো—আমি কোথায়...?

দেবতাকে দেখা যায় না। তাঁর স্থানে শুধু একটা আলোর মণ্ডলী পরিদৃশ্যমান। পুষ্প বলে—দেব, আপনি পৃথিবীর আত্মিক লোকে।

আবার বিদ্যাতের শিখা। পুষ্পের মনে পুনরায় প্রশ্ন জাগলো—পৃথিবী কি?

পুষ্প বলে—পৃথিবী একটা ক্ষুদ্র গ্রহ, সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

পুষ্পের এ কথাগুলো কি ভাবে দেবতা বুঝলেন, পুষ্প জানেন না। বোধ হয় এ উত্তরগুলো চিন্তারূপে দেবতার নিজের মনে জাগছিল। পৃথিবীর ভাষায় অমুবাদ করলে দুজনের কথাবার্তা ধানিকটা নিম্নোক্তরূপ দাঁড়ায়। পুনরায় প্রশ্ন হোল—

—বিশ্বের কোন্ অংশে ?

পুষ্প বিপদে পড়ে একমনে সেদিনকার সেই দেবতাকে স্মরণ করলে। এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার সাধের অতীত।

আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! সেদিনকার সেই শৈলশিখরাকৃৎ দেবতা তখনই তার সম্মুখে তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে আবির্ভূত হোলেন। পুষ্প প্রণাম করে বল্লে—দেব, আমি সামান্য মানবী। উনি যে প্রশ্ন করছেন, আমি তার কি উত্তর দেবো? আমার বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তারপর সে দ্বিতীয় দেবতাটির পানে কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্বর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তিনি সেদিন বলেছিলেন বটে ‘স্মরণ করলেই আমি আসবো,’ পুষ্প একথা বিশ্বাস করেনি। সে মহা অপরাধী দেবতার কাছে—ছি ছি, কি অবিশ্বাসী তার আত্মা!

কিন্তু এ চিন্তা চাপা পড়ে গেল আর এক আশ্চর্য ব্যাপারে। দুই দেবতার মধ্যে যেন তীব্র বিদ্যুৎশিখার ক্ষিপ্ত আদানপ্রদান চলচে—পৃথিবীর কোনো ঘটনার উপমাধারাই তার স্বরূপ বোঝানো যাবে না। দুখানা বড় যুদ্ধজাহাজ যেন পরস্পর পরস্পরের ওপর তীব্র অস্ত্র-হাইড্রোজেন আলোর সার্কেলাইট বিক্ষিপ্ত করচে! দুই বিরাট দেবতার কথাবার্তা চলছিল। পরে এই কথাবার্তা পৃথিবীর ভাষায় অমুবাদ করে পুষ্পের দেবতা-বন্ধু তাকে যা বলেছিলেন, তা এইরূপ—

পুষ্পের দেবতাবন্ধু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনি কে দেব ?

আগন্তুক দেবতা বল্লেন—আমি কোথায় আগে বসুন।

—পৃথিবীর আত্মিক লোকে।

—পৃথিবী কি ?

—একটা ক্ষুদ্র গ্রহ, সূর্য নামে একটা নক্ষত্রের চারিদিকে ঘোরে।

—বিশ্বের কোন্ অংশে ?

—এ প্রশ্নের কি জবাব দেবো? ছায়াপথ দ্বারা সীমাবদ্ধ যে নক্ষত্রজগৎ তারই এক অংশ। আপনি কোন্ অংশের অধিবাসী ?

এর উত্তরে আগন্তুক দেবতা বল্লেন—আমার কথা শুনে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমি বহু, বহু দূরের অতীত এক নক্ষত্রজগতের অধিবাসী। আমি বহু কোটি বৎসর পূর্বে ভ্রমণে এবং নতুন দেশ আবিষ্কারে বেরিয়েছিলাম। আমার চৈতন্য যতদিন হয়েছে আমার মনে এক অদম্য পিপাসা ছিল বিশ্বের প্রত্যন্ততম সীমা আবিষ্কার করবো। কি কি নতুন দেশ এতে আছে দেখবো। এককাল ধরে বেগমান বিদ্যুতের অপেক্ষাও দ্রুততর গতিতে শুধু শূন্যে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। সম্প্রতি নক্ষত্রের, গ্রহের, নানা জগতের ও বিভিন্ন লোকের

গোলকধাঁধার অরণ্যে দিশাহারা হয়ে এখানে শক্তিহীন, অবসন্ন ও বিমূঢ় অবস্থায় এসে পড়েছি। নক্ষত্র ও বস্তুজগৎ এখানে এত বেশী কেন? এ দুটি প্রাণী কোথাকার লোক?

—এই দুই জীব পৃথিবীর তৃতীয় স্তরের অধিবাসী। পুরুষটি সম্প্রতি বস্তুস্তর থেকে আত্মিক স্তরে এসেছে। ওরা নিতান্ত নিরীহ, অজ্ঞ। যেহেতু কিছু উন্নত তাঁও—জ্ঞানে নয়, প্রেমে।

যতীন এতক্ষণ শ্রদ্ধায় ভয়ে ও গভীর বিষ্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এই কথাবার্তার বিন্দুবিসর্গও বুঝছিল না—তার মনে অত উচ্চ দেবাত্মাদের চিন্তা প্রতিকলিত হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। পুষ্প ওর দিকে চেয়ে কথা বলতে সে বুঝলে যে তার সম্বন্ধে কোনো কথা বলা হচ্ছে। সে এগিয়ে এসে প্রণাম করে চূপ করে রইল। এত বড় জ্যোতির্ষ্ময় আত্মা সে আর কখনো দেখেনি। দেবতা বলে—উঃ কোথায় এসে পড়েছি। বিশ্বের কোন্ অংশে যে আছি তা কিছুই বুঝতে পারছি নে। তুমি কোন্ একটা গ্রহের নাম করলে? যে নক্ষত্রটার চারিদিকে ঘোরে সেটা আমি নতুন দেখলাম। নক্ষত্রটা খুব বড় নক্ষত্রের দলে পড়ে না। এবং ওর আলোও পরিবর্তনশীল, আমি বার কয়েক ওর আলোকে বাড়তে-কমতে দেখেছি। ওর নাম কি বলে—সূর্য্য!

পুষ্প তার নিজের চিন্তার কিছু অংশ এবার যতীনের মনে চালনা করলে। সে বেচারা চূপ করে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝে না কোন্ ভীষণ মহাপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে পুষ্প পোড়ারমুখী কথা বলচে। জাহ্নক ও বুঝক কিছু।

পুষ্পের মনের মধ্যে দিয়ে ওদের কথাবার্তা যতীন বুঝতে পারলে এবং বুঝে অবাক হয়ে গেল। পুষ্প ভাবছিল—এ আবার কত উচ্চস্তরের, কি ধরনের লোক রে বাবা, যে সূর্য্যের নামটাই শোনে নি কখনো, পৃথিবী-তো দূরের কথা।

কথাটা মনে হয়ে তার বড় হাসি পেল। ছিঃ—হাসি সামলে নিয়ে সে বলে—আপনার কথা শুনে বড় আগ্রহ হচ্ছে। আপনি আমাদের বাড়ীতে এসে একটু বিশ্রাম করুন। আর দয়া করে বলবেন কি, কি দেখলেন এতকাল ধরে?

আগন্তুক ওদের বাড়ীর বাইরে পাথরের বেষ্টিতে এসে বসলেন।

যতীন সজমে উদ্ভাস্ত ও দিশেহারা হয়ে হঠাৎ বিনীতভাবে বলে বসলো, একটু চা খাবেন কি সার?

পুষ্প মুখে ঝাঁচল চাপা দিয়ে অতিকষ্টে হাসি দমন করে বলে—কি যে তুমি করো যতুণা! পৃথিবীর অভ্যাস তোমার এখনও গেল না। চা খাবে কে? আর ‘সার’ বলচো কাকে?

যতীন অপ্রতিভ হয়ে অধিকতর বিনীতভাবে ধারণ করলে।

এই দুই নবদূত আত্মার কাণ্ড দেখে আগন্তুক দেবতার মন কৌতুকে ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো। কোথাকার জীব এরা, অথচ জ্ঞানো কি সুন্দর হাসে! মহামহেশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টি

শুধু বিরাটতার দিক থেকেই নয়, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যও এর কি রহস্যময় মুক্তি। এরা কেন হাসচে, কি নিয়ে কথা বলচে তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। আর একটা কথাও তিনি বোঝেন নি, তাই এখন পুষ্পকে প্রশ্ন করলেন—গ্রহের জড়লোক আর আত্মিকলোক কি বলচো, বুঝতে পারলাম না তো? কি সেটা?

পুষ্প বলল—প্রভু, আমরা যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি, তখন আমাদের দেহ অল্প পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়। সে দেহ স্থূল, সেখানকার সব জিনিসই সেই ধরনের স্থূল পদার্থে গড়া। তারপর একটা সময় আসে, যখন সেই স্থূল দেহটা নষ্ট হয়ে যায়—তখন আমরা এই আত্মিক লোকে আসি। কেন, প্রভু, আপনি কি এ জানেন না?

দেবতা বললেন—শুনচি বটে এমন হয় কোনো কোনো গ্রহের জীবের ক্ষেত্রে—আমার অভিজ্ঞতা নেই। আমার সেখানে একবার নিয়ে যাবে—তোমাদের এই পৃথিবী গ্রহের জড়লোকে?

—কিন্তু সেখানে আপনি যেতে পারবেন দেব অত স্থূল রাজ্যে?

দেবতা হেসে বললেন—আমি পথিক। কত বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে দিয়ে চলা অভ্যাস করতে হয়েছে আমাকে, তবে বিশ্বভ্রমণ করা সম্ভব হয়েছে। নইলে তোমাদের এই যে যাকে বলচো আত্মিকলোক, এখানেই কি আমি আসতে পারতাম? জড়বস্তুর নিবিড় প্রকাশ আত্মার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি অল্প অনেক গ্রহে। চল, যাই।

একটু পরে ওরা তিনজনে পৃথিবীর দিকে চললো। পৃথিবীর নিকটে এসে দেবতা বললেন—উঃ, মেঘের মত কি সব বিশ্রী চিস্তার ধোঁয়া চারিদিকে! তোমরা দৈবতে পাচ্চ না?

যত্নে তো কিছুই দেখতে পার না—পুষ্প জানে পৃথিবীর মানুষের পাপের ও দুঃখের নানারকম চিস্তার মেঘ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে জমা হয়ে মাঝে মাঝে পৃথিবীতে যাতায়াতের সময় তাকে কষ্ট দিয়েচে। তবুও সে পৃথিবীরই জীব, তার ততটা কষ্ট হয় না, যতটা ইনি পাবেন।

যেখানে ওরা গিয়ে নামলো সেটা ভারতবর্ষের বিহার অঞ্চলের একটা ছোট গ্রাম। মহিষদল মাঠে চরাচে রাখালরা। তিনজন মেয়েমানুষ একটা ভূট্টাক্ষেতের ধারে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করচে। পৃথিবীতে ভাদ্রমাস। শরতের বেশ পরিষ্কার নীল আকাশ, বস্তার জল এসে নেমে গিয়েচে, গ্রামের মধ্যে গৃহস্থবাড়ীর উঠানে পচা কাদা। একটা বাড়ীতে মকাই-এর মরাই-এর মধ্যে জল ঢুকে মকাই-এর দানা পচিয়ে কেলেচে বলে বাড়ীর মেয়েরা মকাইগুলো নামিয়ে ঝাড়চে।

দেবতা বললেন—কি আশ্চর্য্য। এদের গতি এতটুকু জায়গায় সীমাবদ্ধ! এর চেয়ে দ্রুত যেতে পারে না?

কাটিহার থেকে মুন্সেরগামী একখানা ট্রেন এসে পড়লো। দেবতা বিস্ময়ের সুরে বললেন—ও ব্যাপারটা কি?

—মানুষে ওই গাড়ীটা তৈরী করেছে। ওকে বলে রেলগাড়ী। খুব জোরে মানুষকে বি. র. চ—৩

এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায়, শ্রুত।

দেবতা কৌতুকের দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন—ওই কি দ্রুত যাওয়ার নমুনা? নমুনা দেখে তো খুব আশা হয় না এদের দ্রুতগামিতার ভবিষ্যৎ ইতিহাস সম্বন্ধে। ওর নাম কি জোরে যাওয়া?

এক জায়গায় ছুটি ছোট ছেলেমেয়ে ভুট্টাক্ষেত থেকে ভুট্টা চুরি করে খেতে গিয়ে ক্ষেত্র-স্বামীর হাতে পড়ে খুব মার খাচ্ছে দেখে দেবতা বলেন—আহা, কচি ছেলেমেয়ে ছুটিকে অমন করে মারচে কেন? পরে তিনি ক্ষেত্রস্বামীর মনে সদয় চিন্তা বিক্ষেপ করতে চেষ্টা করলেন। স্থূল দেহের স্থূল মনে প্রথমেই কোনো কার্যাকরী হোল না—কিন্তু অসাধারণ শক্তিশালী দেবতার মনের জোরে তাকে সং চিন্তার প্রেরণা স্পর্শ করলে। সে ছেলেমেয়ে ছুটিকে ছেড়ে দিয়ে বলে—আচ্ছা, যা, নিয়েচিস্ যা তা এবারকার মত নিয়ে যা—আর কখনো আসিসনে।

দেবতা বলেন—আহা, এদের তো বড় কষ্ট! কি অদ্ভুত এই সৃষ্টি! যত দেখছি ততই এর মৌল্যে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো—এদের মধ্যে মানুষ হয়ে থাকি। এদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করি।

পুষ্প বলে—দেব, নিকটের এই পাহাড়ের চূড়াটাতে বসে আপনার ভ্রমণের গল্প একটু করবেন দয়া করে? শুনবার বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

ভাদ্র মাসের গঙ্গা কূলে কূলে ভরা। বিকেল হয়েচে। পশ্চিম দিগন্তে জামালপুরের পাহাড়ের পিছনে রত্নী মেঘশূপের আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।

পাহাড়ের মাথায় ছোট ছোট জঙ্গল। একটা ফাঁকা জায়গায় বন্য হরীতকী গাছের তলায় ওরা বসলো। নীচে গঙ্গার ধারে একটা পাট-বোঝাই ভড়ের মাঝিমাল্লারা রান্নাবান্নার উত্তোগ করছিল। যতীন ভাবছিল—এই তো বৃহত্তর জীবন, মৃত্যুর পরে যা সে লোভ করেছে। কোথায় বাংলাদেশের এক ছোট্ট গ্রামে সে ছিল বন্দী, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল তার জীবন—পৃথিবীর অতীত কত লোকে কত স্তরে এমনি কত নিস্তব্ধ শরণে দুপুরে, অপরাহ্নে, কত বসন্তদিনের আসন্ন বেলায়, কত জ্যোৎস্নারাত্রিতে তার ইচ্ছামত অভিযান ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে জমা রয়েছে! এমন সব সূখের দিনে শুধু মনে হয় সেই হতভাগী—

দেবতা তাঁর ভ্রমণের কাহিনী বলতে লাগলেন।

সে ভারি চমৎকার কথা। তাঁর সব কথা পুষ্প বা যতীন বুঝতে পারছিল না। তবুও তারা মুগ্ধ হয়ে গেল তাঁর উৎসাহদীপ্ত মুখের ভঙ্গীতে, কথার সুরে। কত লক্ষ বৎসর পূর্বে তিনি বেরিয়েচেন বিশ্বভ্রমণে। কত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রজগৎ, কত ছায়াপথ, নীহারিকাপুঞ্জ মানসগতিতে ভ্রমণ করেচেন। আলো বা বিদ্যুতের যেখানে পৌছতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগে—সে সব সুন্দর নক্ষত্রমণ্ডলী পার হয়েছে লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের অঞ্চলে চলে গিয়েচেন। তখনও দেখেন বহু দূরে আর এক অজানা বিশ্বের সীমা মহাশূন্তের প্রান্তে আবছায়া দেখা যায়। আবার সে বিশ্বও পৌঁছেচেন, আবার অগণিত নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকারাজির

মধ্যে দিয়ে দেবতার অমিত গতিতে বহু শত বৎসর ধরে ছুটে গিয়ে যেমন তার সীমা ছাড়িয়েচেন, আবার দূরে দেখতে পেয়েচেন আর এক রহস্যময় অজ্ঞাত বিশ্বের ক্ষীণ সীমান্তবর্তী ক্ষীণালোক তারকামণ্ডলী। কত প্রজলন্ত নক্ষত্র, কত স্বয়ম্প্রভ বাষ্পমণ্ডলী লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তৃত হয়ে রয়েছে শূন্তের দিগন্ত থেকে দূর দিগন্তে...অবশেষে এই বর্তমান বিশ্বটায় পৌছে গ্রহনক্ষত্রের গোলকধাঁধার মধ্যে কিছু দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন।...

পুষ্প বলে—আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন ?

দেবতা বলেন—তা অসম্ভব। এই গ্রহের বিভিন্ন আত্মিক স্তর ছেড়ে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না। এর আকর্ষণে টেনে রাখবে। সে দেহ তোমাদের তৈরী হয় নি। তবে আর কিছুকাল অপেক্ষা কর। কাছাকাছি বহু অন্তত জগৎ আছে, সেখানে তোমাদের নিয়ে যাবো ; আমরা অরণ্য ক'রো না—তাতে আমি আসবো না। যখন তোমরা তার উপযুক্ত হয়েচ বৃদ্ধবো—আমি নিজেই আসবো। এখন আমি ঘাই। আর একটা বিষয়ে সাবধান থেকো, তোমরা দেখতে পাচ্চ না, আমি পাচ্চি, তোমাদের এই গ্রহটার চারিদিক ঘিরে একটা বিরাট শক্তিশালী চৌম্বক চেউ বইচে, সেটাসব সময় তোমাদের ঐ পৃথিবীর দিকে টানচে। এই চেউএ পড়লে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে ঐ পৃথিবীর জড়লোকে তোমাদের ফেলে পুনরায় জড়দেহ ধারণ করাতে বাধ্য করবে। এটাকে পুনর্জন্মের চেউ বলা যেতে পারে। খুব সাবধান। বিশ্বের সীমা অবিকার করবার যার আগ্রহ, সে যেন ক্ষুদ্র গ্রহের স্থলস্তরে আবার স্থল জড়দেহ ধারণ না করে।

পুষ্প ও যতীন দুজনে প্রণাম করলে। পুষ্প বলে—আবার যেন আপনার দেখা পাই, দেব। পর মুহূর্তে দেবতা অন্তর্হিত হলেন।

পুষ্প বলে—দেখলে তো ? শুনলে ? ওই সেই চুষকের চেউ। আমাকে এক দেবতা বলেছিলেন অনেক দিন আগে। তোমাকে একবার পঞ্চম স্তরে নিয়ে যেতে যেতে বিপদে পড়েছিলুম, তুমি অজ্ঞান হয়েছিলে—মনে আছে ? সেইবার তাঁর সঙ্গে দেখা।

১০

একদিন গঙ্গার ঘাটে বসে থাকার সময় যতীন দেখে অবাধ হয়ে গেল যে দিবি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠলো। একেবারে পৃথিবীর পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। তার শুভ্র আলোর চেউ পড়লো গঙ্গাবক্ষে, পড়লো গিয়ে ওপারের শ্রীমাসুন্দরী মন্দিরের সর্বাঙ্গে, তীরের প্রাচীন বটের মাথার ডালের ফাঁকে ফাঁকে।

যতীন ভাবলে—এ আবার কি ? জ্যোৎস্না তো কখনো এখানে দেখিনি ! এখানে রাজিই বা কি, দিনই বা কি !

এমন সময়ে পুষ্প হাসতে হাসতে পাশে বসে বলে—কেমন জ্যোৎস্না হয়েছে দেখ ; মনে

পড়ে তুমি আর আমি কেষ্টার বৃষ্টিশিবতলার ঘাটে এমনি জ্যোৎস্নারাতে কত বসে ইলিশমাছ ধরা দেখতাম ?

—কিন্তু জ্যোৎস্না উঠলো কোথা থেকে ? চাঁদ এল কি করে ?

—তৈরী করলুম জ্যোৎস্নাটি। ভাবলুম তোমার সঙ্গে একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে ঘাটে বসা যাক। কেমন, বেশ হয় নি ?

—আচ্ছা পুষ্প, যে কোনো ঋতু, যে কোনো সময়কে তৈরী করতে পারো ? এ তো অদ্ভুত।

—সময় এখানে মনের দ্বারা সৃষ্টি করা যায়, যেমন অস্ত্র সব জিনিস করা যায়। সে তো তুমি চোখের ওপর ঢুবেলা দেখচো। আচ্ছা যতুদা, সাগর-কেউটার কথা মনে পড়ে ?

—খুব পড়ে পুষ্প। সেই একবার আমি গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম মনে আছে ? তোর কি কাহ্না ! সত্যি আমি এক একবার ভাবি জীবনে কি পুণ্য না জানি করেছিলাম যে তোর মত মেয়ের সঙ্গে পেয়ে যন্ত্র হয়েছি। আমার এখনও মনে হয় এ সব স্বপ্নই বা !

পুষ্প লজ্জিত স্বরে বলে—আহা !

পুষ্প বুঝতে পারে যে, যতীন আশার কথা ভাবচে, ঘাটে এসে বসেই তার কথা ওর মনে হয়েছে। যত উচ্চ স্তরের আত্মাই হোক, পুষ্প যেয়েমাছুষ, তার মনটা ছ ছ করে ওঠে। যতুদাকে সে আবাল্য ভালবাসে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে কিন্তু যতুদা তার চেয়ে যে আশা-বৌদিকে বেশী ভালবাসে, একথা সে জেনেও মনে স্থান দেয় না বেশীক্ষণ। উপায় কি ? এই তার অদৃষ্টলিপি, নইলে সে ছেলেবেলার পৃথিবী ছেড়ে, যতুদাকে ছেড়ে আসবে কেন ? যতীনের গত তেরো বছরের জীবনে পুষ্প ছিল না, ছিল আশা—এ অবস্থার আশার সঙ্গেই যতীনের মনের যোগ অনেক গাঢ়বদ্ধ। কারো কোনো দোষ নেই।

পুষ্পের মনে চুঃখের ছায়া এসে পড়তেই বাইরের জ্যোৎস্না ক্রমশ স্তান হয়ে এল। মন প্রফুল্ল না থাকলে মানসিক সৃষ্টি স্তব্ধ হবেই।

হঠাৎ পুষ্প যতীনের দিকে চেয়ে বলে—একটা কথা ভুলে গিয়েছিলুম, যতুদা। আজ কল্প-পর্কিতের গান বাজবার দিন। চল তোমাকে শুনিয়ে আনি। সে এক অদ্ভুত জিনিস।

ওদের স্বর্গ থেকে বেরিয়ে ওরা শূন্য বেয়ে চললো। বহুদূরে একটা স্ফুজ নক্ষত্রের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে পুষ্প বলে—ওইখানে আমাদের যেতে হবে। ওই দিকে একদৃষ্টে চোখ রেখে ভাবো যে আমরা ওখানে যাবো।

নক্ষত্রটা যেন ক্রমে বড় হচ্ছে, যতীনের মনে হোল সে-সবেগে ওর দিকে নীত হচ্ছে। কি অদ্ভুত এ যাত্রা। যতীন অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিল অনেক দূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড গ্রহ ডুবে ডুবে ঘুরচে।

পুষ্প বলে—এই হচ্ছে শুক্রগ্রহ—সন্ধ্যাবেলা সেটাকে পশ্চিম আকাশে দেখা যায়।

আকাশের রং এখানে নীল নয়, অনেকটা ধূসরমিশ্রিত বেগুনী। শূন্যপথে অনেক আত্মা তাদের যতই যাওয়া আসা করচে, তবে তাদের মধ্যে কেউই উচ্চশ্রেণীর নয়, ওদের রং দেখে শ্রেণী ঠিক করতে শিখে গিয়েচে যতীন। এ সব আত্মার রং খানিকটা খানিকটা যেটে

সিঁদুরের মত লাল। খুব সাধারণ শ্রেণীর আত্মা। তবে নিম্ন শ্রেণীর আত্মা এখানে আসে না। তাদের দ্বিতীয় স্তরের নিম্ন পর্যায় ছাড়িয়ে ওঠবার সাধাই নেই।

হঠাৎ যতীন বলে—সে পাহাড় তো চতুর্থ স্তরে, সেখানে পৌঁছে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বো না পুষ্প?

পুষ্প হেসে বলে—তাহলে তোমায় কি আনতুম যতুদা? সেবার তুমি যেখানে অজ্ঞান হয়েছিলে, সেটা চতুর্থ স্তরের উর্দ্ধলোক। চতুর্থ স্তরে ঠিকই ছিলে। চতুর্থ স্তরে সেই নীল হ্রদ দেখেছিলে, যেখানে দেব দেবীরা স্নান করছিলেন।

যতীন বলে—কই, কোথায় দেবদেবীরা স্নান করছিলেন আমি তো দেখিনি? তখন থেকেই আমার জ্ঞান চলে যাচ্ছিল তাহলে।

ওদের কথা শেষ হতে না হতেই যতীন দেখলে তারা একটা অত্যন্ত সুন্দর দেশে এসে পৌঁছেছে।

দেশটার চারিদিকেই চক্রবাল রেখার কূলে কূলে নীল পাহাড়। গাছপালা সেখানে আদৌ তৃতীয় স্তরের মত নয়—কোনোটার রং নীল, কোনোটার বেগুনী, কোনোটার সোনালী; ফুলকল যেন রঙীন আলো দিয়ে গড়া। পাহাড়ের মাথায় মাথায় যেন জলন্ত রঙিন আলোর মেলা। পুষ্প একটা গাছের ফুল তুলে ওকে দেখালে, তুলবা মাত্র বোটার আর একটা ফুল কোথা থেকে এসে শূন্যস্থান পূর্ণ করলে। আরও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, প্রান্তরের ও শৈলসাহস্রর সব ফুল মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে স্পন্দিত হচ্ছে, যেন চারিদিকে রাশি রাশি লক্ষ লক্ষ নানা বিচিত্র বর্ণের জোনাকি নিবচে জ্বলচে। পাখীগুলো যখন আকাশে উড়ছে, তাদের ডানায় যেন সাতরঙা রংমগ্নর খেলা। এদেশে বাতাসে একটু অদ্ভুত শান্তি ও আনন্দের বাতাস—একটা বিচিত্র জীবন-উল্লাসের ইঙ্গিত।

যতীন একটা জিনিস লক্ষ্য করলে, এখানকার দৃশ্য যেরকম, পৃথিবীতে এ দৃশ্য কল্পনাও করা যায় না। এর কোনো জিনিস পৃথিবীতে নেই।

পুষ্পকে সে কথাটা বলে।

—পৃথিবীর সঙ্গে খুবই কমই মিল এ দেশের, না পুষ্প?

পুষ্প বলে—যতুদা, এর একটা সহজ কারণ আছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের আত্মারা পৃথিবী থেকে সৃষ্ট এসেছে। পৃথিবীর সৃষ্টি তখনও তাদের কাছে স্নান হয়নি। যখন তারা মানসলোক সৃষ্টি করে, পৃথিবীর সেই সৃষ্টি তাদের অনেকখানিই সাহায্য করে। কাজেই তাদের তৈরী স্বর্গ হয় পৃথিবীরই অবিকল নকল। কিন্তু এই সব স্তরের আত্মিকদের মনে পৃথিবীর সৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে—অনেকের নেই বলেই হয়। কাজেই তারা যখন গড়ে—নিজেদের কল্পলোক নিজেদের কল্পনা থেকে গড়ে। তাই সব হয় নতুন, সবই হয় আঙ্গুলবি। এ সবই যা দেখচো এ স্তরের অধিবাসীদের সৃষ্টি—ওই পাহাড়পর্বত, গাছপালা, ফুল, পাখী, সাধারণ দৃশ্য—সব।

—কিন্তু তোমার মানুষজন কই? একজনেরও তো সাক্ষাৎ নেই।

—তারা ইচ্ছে না করলে এ স্তরের আত্মাকে তুমি সহজে দেখতে পাবে না যতুদা। কল্পপর্বতের কাছে যাকে আমরা চুখকশক্তির ঢেউ বলি—তা অত্যন্ত প্রবল। সেখানে গেলে তোমার দেহ শক্তিমান হবে, তখন খুব উচ্চ স্তরের আত্মাকেও অল্পক্ষণের জন্তে—মানে মাত্র যতক্ষণ সেই পর্বতের কাছে থাকবে ততক্ষণের জন্তে—দেখতে পাবে।

অল্প পরেই একটা অল্পচ্চ পর্বত সামনে দেখা গেল, তার ওপরটা অনেকখানি সমতল। সেই সমতল জমিটুকুর ওপর যে দৃশ্য চোখে পড়ল যতীনের, তাতে সে বিস্মিত, মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সেখানে বহু দেবদেবী একত্র হয়েছেন! তাঁদের অঙ্গের জ্যোতি ও রূপে সমস্ত ভূমিশ্রী আলোকিত হয়ে উঠেছে, সমগ্র বায়ুমণ্ডল (যদি এখানে বায়ুমণ্ডল বলে কোনো কিছু থাকে) তাঁদের দেহনিঃসৃত উচ্চ বৈদ্যুতিক শক্তির স্পন্দনে মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের নিৰ্ঝর হয়ে উঠেছে যেন, দেহগন্ধের স্রবভিতে বহুদূর পর্যন্ত আয়োদিত।

যতীন এ পর্য্যন্ত এত উচ্চ জীবের একত্র সমাবেশ কখনো দেখেনি। সে চুপি চুপি বললে—এ যে ঐদের দস্তুরমত ভিড় লেগে গিয়েচে দেখচি, পুষ্প! উঃ—

সবাই যেন কিসের অপেক্ষা করচে। সকলের চোখ বা দিকের একটা খুব উচ্চ পাহাড়ের দিকে নিবদ্ধ। যতীন বললে—ও পুষ্প, এ যেন কোটের-রামপাটে দাঁড়িয়ে মোহনবাগানের মাচ দেখতে এসেচে সব—আহা, টিকিট কিনতে পারনি বেচারীরা!

পুষ্প তিরস্কারের সুরে বললে—নাঃ, তুমি জালালে যতুদা—চুপ করে থাকো না কেন ছাই।

যতীন কি বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল।

বা ধারের সেই পাহাড়ের চূড়া থেকে এক অপূর্ব, মধুর, শব্দের ঢেউ উখিত হোল। দেবদেবীর সকল অবনতমস্তকে শুনতে লাগলেন। কেউ কেউ পাহাড়ের ঢালুর রঙীন স্বয়ম্ভূত তৃণদলে সুরে পড়লেন অলসভাবে। কেউ বসে ছহাতে মুখ ঢাকলেন। বেশীর ভাগই কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন।

সে মধুর শব্দ কর্তৃসঙ্গীত নয়, যন্ত্রসঙ্গীতের মত শব্দটা। কিন্তু পরিচিত কোনো যন্ত্রে বাদিত সঙ্গীত নয়! অত্যন্ত রহস্যময় তার উপস্থিতি। যেন গঙ্গার ধারা,—কোন উচ্চ পর্বতের ভূষারপ্রবাহে তার জন্ম, কেউ খবর রাখে না। যতীনের সর্বাঙ্গ বার বার শিউরে উঠতে লাগলো।

শুনতে শুনতে যতীনের মনে হোল সে আর পৃথিবীতে বদ্ধ আত্মা নয়—সে উচ্চ অমৃতের অধিকারী দেবতা হয়ে গিয়েচে, সে মুক্ত, সে বিরাট—তার আত্মা সারা বিশ্বকে ব্যোপে সতেচন হতে চায়, তার বিরাট হৃদয়ে সকল পাণী তাপী, মূৰ্খ ও নিম্নকের স্থান আছে, পতিতের উদ্ধার করতে যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্মেচে, তাদের দুঃখে যুগে যুগে করেছে মৃত্যুবরণ। বিশ্বের মহাদেবতার প্রেমিক পাখঁচর সে—সে নৃত্যশীল গ্রহনক্ষত্রের বিচিত্র নৃত্যচ্ছন্দে লীলাময়, পবিত্র, প্রেমিক, মুক্ত দেবতা। একি আনন্দ! একি শিল্পমাদুর্য্য! একি অভিনব অনন্তভূতপূর্ব অমরতা!

কোনো দিকে কেউ আর দাঁড়িয়ে নেই...সবাই বসে পড়েচে...নস্কর চারিদিক...মধুর অশ্রুরী রহস্যময় মোহিনী সঙ্গীতলহরী কখনও উঠে, কখনও মুহূর্তে একটানা বয়ে চলেচে... বিরাম নেই...বিরতি নেই, পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই তার বর্ণনা নেই...কতক্ষণ সময় কেটে গেল তার লেখাজোখা নেই—অনন্তকাল ধরে অমন সঙ্গীতপ্রবাহিণী গোমুখী-নির্গত ভাগীরথীধারার মত বয়ে চলেচে...চলেচে। যতনের মনের কোন্ গুপ্ত কক্ষের গভীর অমুভূতির দ্বার খুলে গেল। সে দেখতে পেলে তার পৃথিবীতে যাপিত আরও অনেক পূর্ব জীবন...এই অনন্ত জীবনপ্রবাহে সে যুগযুগান্তর ধরে ভাবের ও প্রেমের স্রোতে বয়ে আসচে... আশা কি এক জনের আশা, না পুষ্প এক জনের পুষ্প? কত যুগ ধরে ওরা যে ওর নিত্যসঙ্গিনী, ওর জীবনে ছন্দে গাঁথা ওদের জীবন—কতবার কত বিরহ-মিলন হাসি-অশ্রুর মধ্যে দিয়ে ওদের সঙ্গে কতবার দেখাশোনা, কতবার আবার ছাড়াছাড়ি—কত বিপ্লব মরুবীপে, কত শামল পল্লীর কুঞ্জে কুঞ্জে, কত ক্ষুদ্র গ্রামা নদীর তীরের কুটীরে, কত পাহাড়ের নীচেকার আদিম কালের গুহায়...কত রাজার রাজপ্রাসাদে...কত দর্শণ গ্রামে ব্যাধরূপে, কত শারবীপে জ্যোৎস্নামিথুন রূপে, কত কুরুক্ষেত্রে বেদনায়ক ব্রাহ্মণরূপে...

যতীন দেখলে পুষ্প কাদচে...ও নীরবে পুষ্পের হাতে হাত দিয়ে তাকে নিজের কাছে স্নেহে নিয়ে এল...

তারপর কখন সে অপূর্ণ সঙ্গীত থেমে গিয়েচে, বিচিত্ররূপী জ্যোতির্ময় জীবেরা মহাশূন্তে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন...কখন জ্যোৎস্নার আলোতে সারা দেশ ভরে গিয়েচে যতীনের খেয়াল নেই...জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না...বহু পুর্ণিমার সন্মিলিত জ্যোৎস্নালোক চারিদিকে...

যতীন বলে—পুষ্প, চল ওঠো।

১১

ওরা কিছু দূরে মাত্র এসেচে—এক জায়গায় দেখলে মাটির বৃকে যেন চাঁদ খসে পড়েচে।

ভুজনে কাছে গিয়ে দেখেন, পরমরূপসী এক দেবী ঘাসের ওপর বসে হাঁপাস নয়নে কাদছেন। ওরা অবাক হয়ে গেল। এত উচ্চস্তরের দেবীর দুঃখ কিসের?

যতীন জিজ্ঞেস করলে—মা, আপনার কোনো সাহায্য করতে পারি?

দেবী ওদের দিকে চাইলেন। যতীনের মনে হোল দেবী কি সাধে হয়? এত রূপ এত জ্যোতি এত মহিমা—অথচ কি মমতা, কল্পনা, দীনতায় ভরা দৃষ্টি!

বলেন—পারবে?

ভুজনেই বলে উঠলো—ভ্রম করুন, আপনার আশীর্বাদে পারবো।

দেবী বলেন—কল্পপর্কিত থেকে ফিরচো? তোমরা কোথায় থাকো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা এর নীচের স্বর্গে থাকি, তৃতীয় স্তরে।

—কি মধুর সঙ্গীত ! শুনলে ?

যতীন বলে—শুনলাম, মা। আমি বেশীদিন পৃথিবী ছেড়ে আসিনি। এই ব্যাপারটা কি আমার একটু বলবেন দয়া করে ?

দেবী বলেন—বলবো এর পরে। এখন বলি শোনো। আমি থাকি অল্প নক্ষত্রলোকে। পৃথিবীর একজায়গায় মানুষের ভয়ানক কষ্ট। আমি সে দেশে জন্মেছিলুম হাজার হাজার বছর আগে। তাদের দুঃখে, আর আজ কল্পপর্ব্বতের সঙ্গীত শুনে, আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েচে। চলো যাই পৃথিবীতে, দেখি কি করা যায়—কিন্তু মুশকিল হয়েচে এই যে আমি এককাল আগে পৃথিবী থেকে চলে এসেছি, জড় জগতের সঙ্গে সম্পর্ক এককাল হারিয়েছি যে, সরাসরি ভাবে কোনো কাজই সে জগতে করতে পারি নে। মধ্যবর্তী স্তরের আত্মার সাহায্য ভিন্ন আমি পৃথিবীতে গিয়ে কি করবো ? তোমরা যদি যাও—

ওরা বলে উঠলো, নিশ্চয়ই যাবো মা !

দেবী বলেন—একটু অপেক্ষা কর। আমার এক সঙ্গী আছেন—তিনি আমার লোকেই থাকেন, উচ্চ স্তরের জীব, পৃথিবীতে গিয়ে শুধু আঁকুপাকু করেন, কিছু করতে পারেন না কাজে। পৃথিবীর জড়স্তরের আমার সংস্পর্শ স্থাপন করতে পারি নে। তিনি প্রাচীন যুগের একজন বড় কবি ছিলেন। তাঁকে নিয়ে যাই চলো। এসো আমার সঙ্গে।

আবার নীল শূন্য যাত্রা। ...বহু দূরে একটা ক্ষীণ নক্ষত্র জ্বলছিল। দেবী সেই নক্ষত্র লক্ষ্য করে চললেন। পরক্ষণেই এক সুন্দর উপবন। এক ক্ষুদ্র নদী বয়ে যাচ্ছে উপবনের মধ্য দিয়ে—লতাপাতা কিন্তু পৃথিবীর মত শ্রামল—পৃথিবীরই যেন এক শান্ত প্রাচীনকালীন ভগ্নোপবন। যুগকূল নির্ভয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে, লতায় লতায় বিচিত্র বস্ত্র পুষ্প প্রস্ফুটিত। এক সৌম্যমুর্তি জ্যোতির্ময় আত্মা লতাবিতানে বসে কি যেন লিখছেন। দেবী ওদের নিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড় করালেন। মুখ তুলে চাইতেই যতীন ও পুষ্প এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

দেবী বলেন—কল্পপর্ব্বতের পথে এদের সঙ্গে দেখা। পৃথিবীতে নিয়ে যাবো তাই সঙ্গে করে আনলাম।

যতীন ও পুষ্পের দিকে চেয়ে দেবী বলেন—রামায়ণ-রচয়িতা কবি বায়ীকি তোমাদের সামনে।

ওরা দুজনেই চমকে উঠলো। মহাকবি বায়ীকি !

দেবতা স্মিতহাস্তে ওদের বসতে বলেন। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেন—এই আমার আশ্রম। ওই পাশেই তমসা নদী। ওই আমার গৃহ। পৃথিবীতে যা আমার প্রিয় ছিল এখানে তাই সৃষ্টি করেছি, ওই আমার স্বর্গ। আর তোমাদের সামনে ইনি আমার মানসহৃদিতা—সীতা, যিনি তোমাদের সঙ্গে করে এনেছেন।

পুষ্প, যতীন বিস্মিত, স্তব্ধ। ভারতবর্ষের ছেলেমেয়ে তারা। সীতার নামে ওদের সর্ব

শরীরে বিদ্যুতের টেউ বয়ে গেল। কত যুগ ধরে ভারতের আকাশ বাতাস যে পুণ্য নামে মুখরিত, সেখানকার বনের পাখীও যে নামে গান গায়, সেই ভগবতী দেবী জানকী তাদের সম্মুখে! এ কি স্বপ্ন, না যাত্রা, না মতিভ্রম?

বাল্মীকি বল্লেন—তোমরা বিস্মিত হয়েচ। বোধ হয় এ লোকে বেশী দিন আসনি। সীতাকে আমি সৃষ্টি করেচি। যা ছিলেন পৃথিবীতে আমার কল্পনার মধ্যে—এ লোকে তা মুক্তিমতী হয়েচেন।

যতীন বল্লে—বৃষতে পারলাম না, দেব।

—এ লোকে চিন্তার দ্বারা জীবের সৃষ্টি করা যায়। শুধু যে বাড়ীঘর করা যায় তাই নয়। স্থানের ও সময়েরও সৃষ্টি করা যায়।—আমার আশ্রমের সময় কি দেখচো?

—আজ্ঞে, সন্ধ্যা গোধূলি।

—আমার সময় সন্ধ্যা গোধূলি। আমি ভালবাসি গোধূলি। আমার কল্পনা এই সময় জাগ্রত হয়। তাই আমার আশ্রমে সব সময় গোধূলি।

—আচ্ছা দেব, শ্রীরাগচন্দ্র তবে কোথায়?

—সীতাকে যত আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে সৃষ্টি করেছিলাম, রামচন্দ্রকে তত সহ'হৃভূতি নিয়ে গড়িনি। তাই আমার স্বর্গে আমার প্রিয়তম সৃষ্টি সীতাই আছেন, রামচন্দ্র নেই। লক্ষ্মণ নেই, ভরত নেই,—কেউ নেই।

—তবে কি, দেব, সীতা বা রামচন্দ্র সত্যি সত্যি কেউ ছিলেন না?

—হয়তো ছিলেন। আমি তাঁদের জানি না। আমার কাব্যের রাম, আমার কাব্যের সীতা—আমারই সৃষ্ট জীব। ও প্রায়ই আমার এখানে আসে। নানাকাজে সারা জগৎ ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু আঘাৎ ভোলে না।

ককণা দেবী বল্লেন—বাবা, ওসব এখন রাখো। পৃথিবীতে যাবে?

বাল্মীকি বল্লেন—তুই তো জানিস, পৃথিবীতে গিয়ে আমি কিছু করতে পারি নে। বহুকাল আগে ভবভূতিকে প্রভাবান্বিত করে একথানা কাব্য লিখিয়েছিলাম—চন্দ্রকর কাব্য হয়েছিল। আর বাংলাদেশের মধুসূদনকে দিয়ে আর একথানা কাব্য লেখাতে গিয়েছিলুম—কিন্তু বেশী প্রভাবান্বিত করতে পারি নি—গিয়ে দেখি কয়েকটি ভিন্নদেশীয় কবি তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের প্রভাবই তার ওপর বেশী কাজের হোল। আমি গিয়ে ফিরে এলাম। তুই একাই যা মা—এদের নিয়ে যা—এই ছেলেমেয়ে দুটিকে। এরা নতুন পৃথিবী থেকে এসেচে—এদের দিয়ে কাজ ভাল হবে।

পুষ্প বল্লে—চলুন দয়া করে, যেখানে আমাদের নিয়ে যান যাবো।

ওরা কিছুক্ষণ পরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছলো! পৃথিবীতে তখন সকাল দশটা, কিন্তু দেশটা খুব শীতের দেশ। রৌদ্রের মুখ দেখা যায় না। জুয়ানার চারিদিক ঘেরা। প্রথমে একটা গ্রামে ওরা গিয়ে পৌঁছলো—সেখানে ভয়ানক ছুঁচুক হয়েচে। প্রত্যেক বাড়ীতে অনাহারে-জীর্ণ

বাপ মা ছেলে মেয়ে—পথের ধারে অনাহারে মৃত মানুষের দেহ। পাশাপাশি অধিকাংশ গ্রামেরই সেই অবস্থা। নিকটবর্তী একটা গ্রামে মোটরভ্যান এসেচে মৃতদেহ কুড়িয়ে ফেলবার জন্তে। পুলিশের লোক জেলের কয়েদিদের দিয়ে মৃতদেহ বহন করাচ্ছে। তারা রাস্তার ধার থেকে ঘরের মধ্যে থেকে মৃতদেহের ঠাং ধরে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে মোটরভ্যান বোঝাই করচে! গাড়ীটা ময়লা কেলা গাড়ীর মত বোঝাই হয়ে গিয়েচে মৃতদেহের স্তুপে। তার মধ্যে বালক, বৃদ্ধ, যুব, শিশু সকলের মৃতদেহই আছে। পচা মড়ার গন্ধে চারিদিক নিশ্চয়ই পূর্ণ, কারণ যে সব জেলকয়েদী মূর্দাকরাসের কাজ করচে, তাদের নাকে মুখে কাপড় বঁধা। বীভৎস দৃশ্য।

রোগজীর্ণ ও অনাহারশীর্ণ লোক দলে দলে শহরের দিকে চলচে—সকলের ভাগ্যে শহরে পৌঁছনো ঘটবে না, পথেই অর্ধেক লোক মরবে। তারপর আছে পুলিশের মোটরভ্যান ও জেলকয়েদী মূর্দাকরাসের দল। যারা শহরে পৌঁছতে, তারা অনেকে সেখানে হুঁসল শরীরে দুঃখ শীতের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পেভমেন্টের ওপর ল্যাম্প-পোস্টের তলায় মরে পড়ে থাকবে। বেচারারা ল্যাম্প-পোস্টের তলায় আশ্রয় নিচে ওপরের আলোটা থেকে এতটুকু উত্তাপ পাবার মিথ্যা আশায়। তারপর তাদেরও জন্তে রয়েছে পুলিশের মোটরভ্যান ও সেই জেলকয়েদী শাসনবন্ধুর দল।

পথের ধারে বসে এক জায়গায় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট আট বছর বয়সের বড় ভাই পাঁচ বছর বয়সের শীর্ণকায় কঙ্কালসার ছোটভাইকে একটা ভাতা তোবড়ানো, রাস্তার ধারে কুড়োনো টিনের মধ্যে করে মুসুরির ডাল সিদ্ধ মুখে তুলে খাওয়াচ্ছে। এই সব অসহায় ছেলেমেয়ের কষ্ট সকলের চেয়ে বেশী—দেবীর চোখে জল এল এদের কষ্টে। অধিকাংশ ছেলেমেয়ের বাপ-মা তাদের শহরে ছেড়ে দিয়ে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে গিয়েচে—এই আশায় যে, শহরে থাকলে তবু তাদের পাঁচজন দয়া করবে, একেবারে না খেয়ে মরবে না, কোনো কোনো ছেলেমেয়ের বাপ-মা অনাহারের ও রোগের কষ্টে পথের ধারেই ইহলীলা সংবরণ করে লাসবোঝাই মোটরভ্যানে নিরুদ্দেশযাত্রা করেছে—

আম্র ও কয়েকটি আত্মা এদের মধ্যে কাজ করচে দেখা গেল।

দেবীকে দেখে একটি মেয়ে এগিয়ে এলেন। ঐর দেহ অতি সুন্দর, স্বচ্ছ, সুনীল জ্যোতি-মণ্ডিত—দেখেই বোঝা যায় খুব উচ্চ শ্রেণীর আত্মা।

ঐদের কাজ দেখে মনে হোল দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা যাতে আত্মিকলোকে এসে দিশাহারা হয়ে কষ্ট না পায়—সেই দেখতেই ঐরা সমবেত হয়েচেন।

দেবী সেই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করলেন। মেয়েটি বল্লে—আমার এই দেশ। বহু দিন আগে ভলুগা নদীর ধারে একটি গ্রামে এক কৃষকপরিবারে আমি জন্ম নিয়েছিলাম—জ্বর আইভানের রাজত্বকালে। রাশিয়ার কৃষকেরা চিরদিনই দুঃখী—সোভিয়েট গবর্নমেন্টের আমলে এদের ক্ষেত্রের কসলের ভাগ দিতে হয় কারখানার শ্রমিকদের ও শহরের সুবিধাপ্রাপ্ত নাগরিক শ্রেণীর জন্তে। এদের ভন্তে যা থাকে, তাতে এদের কুলোয় না। ভাই এই ঘোর

হুভিক্ষ। এদের ছেড়ে আমি যেতে পারিনে—তাই এদের সঙ্গে সঙ্গে থাকি। আর একজন লোকের সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই' আসুন।

একজন অতি সুন্দর সুশ্রী যুবক কিছু দূরে একদল হুভিক্ষপীড়িত বালক-বালিকার মধ্যে দাঁড়িয়ে কি করছিলেন।

মেয়েটি বল্লেন—ইনি ডাক্তার আমেগো। রাশিয়ার কৃষকদের জন্তে ইনি সারা জীবন খেটেচেন পৃথিবীতে থাকতে। গবর্ণমেন্টের কুদৃষ্টিতে পড়ে লগুনে পালিয়ে গিয়েছিলেন মহাযুদ্ধের পূর্বে। সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের সময়েও কিরে এসে অনেক হুর্দশা ভোগ করেচেন। স্ট্যালিনের স্ননজরে বড় একটা ছিলেন না। এঁর জীবনের একমাত্র কাম্য হচ্ছে গরীব ও দুঃখী লোকের দুঃখ দূর করা। সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের অনেক জিনিস ইনি স্মৃষ্টিতে দেখতেন না, তারাও এঁকে স্ননজরে দেখতো না। আজ মাত্র পাঁচ বছর হোল আত্মিক লোকে এসেচেন, তাও সেই গরীবদেরই কাজে প্রাণ দিয়ে। আমাশা রোগে আক্রান্ত পল্লীতে ডাক্তারি করতে গিয়ে নিজে সংক্রামক আমাশা রোগেই প্রাণ হারান। এত বড় নিঃস্বার্থ দয়ালু আত্মা এ যুগে খুব কমই জন্মেচে। মরণের পরে এ লোকে এসেও সেই রাশিয়ার গরীব লোকদের নিয়েই থাকেন। যেখানে হুভিক্ষ, যেখানে রোগ-শোক সেখানেই ছুটে আসচেন। চতুর্থ স্তরের আত্মা, কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে যেতে চায় না কোথাও।

ডাক্তার আমেগো এদের সামনে এসে হাঁসিমুখে দাঁড়ালেন। বল্লেন—আপনারা ভারতবর্ষের লোক ছিলেন না? দেখলেই বোঝা যায়। এরা ভগবানকে খেদিয়ে দিচ্ছে দেশ থেকে, যেন ইটপাথরের তৈরী গির্জা ভাঙলেই ভগবানকে তাড়ানো যায়! রাশিয়াতে উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় মূল্যাত্মা যদি দয়া করে আসেন, তবে কিছু কাজ করা যায়।

মেয়েটি বল্লেন—সে দু-একজনের কাজ নয়, ডাক্তার। অনেক আত্মার সমবেত চেষ্টার ফলে যদি চিন্তার চৌম্বক চেউ-এর সৃষ্টি করা যায়—খুব শক্তিশালী চেউ, তবে হয়তো কিছু হতে পারে। তেয়ার আমার ঘারা তা হবে না।

ডাক্তার আমেগো বল্লেন—আর একটা ব্যাপার। পৃথিবীতে এসে এখন দেখছি আমরা বড় অসহায় হয়ে পড়ি। দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরের আত্মার সাহায্য না নিয়ে কিছু করতে পারিনে। জন কতক দ্বিতীয় স্তরের লোক আমরা যোগাড় করে এনেছি কিন্তু ওরা মন দিয়ে কাজ করছে না।

পুণ্য বল্লেন—আমাদের দুজনকে নিন্ দয়া করে আপনাদের দলে। আমাদের দিয়ে যা সাহায্য হয় পাবেন। একটা কথা, আমাদের ভারতবর্ষেও হুভিক্ষে আর বজায় বড় কষ্ট পায় লোকে। সেখানকার জন্তেও আপনারা সাহায্য করবেন—তারা বড় দুঃখী।

ডঃ আমেগো বল্লেন—সে আপনি ভাববেন না। যেখানেই লোকে দুঃখ পাচ্ছে, সেখানেই আমরা থাকবো। দেশ, জাতি, ধর্মের গণ্ডি নেই আমাদের কাছে। সারা পৃথিবী আমাদের দেশ। তবে কি জানেন, এই রাশিয়া আমাদের জন্মভূমি। এখানকার লোকের দুঃখ আমাদের প্রাণকে বড় স্পর্শ করে। ভারতবর্ষেও যখন যেতে বলবেন, তখনই আমরা

যাবো। আমাদের দলে অনেক লোক আছেন—সবাইকে নিয়ে যাবো।

যতীন বলে—আরও উচ্চস্তরের কোনো লোক আসেন না কেন? পঞ্চম বা ষষ্ঠ কি তারও ওপরের স্তরের কাউকে তো দেখতে পাইনে।

ডাঃ আমেগো বলেন—তারা কাজ করেন আমাদের মধ্যে দিয়ে। তারা এলেও আপনি তাদের চোখে দেখতে পাবেন না। পৃথিবীতে এলে তারা আমাদের চেয়েও অসহায় হয়ে পড়েন। পৃথিবীর স্থললোকের স্থল মনের ওপর তাঁদের প্রভাব আদৌ কার্যকর হয় না। তারা উৎসাহ ও প্রেরণা দেন আমাদের—আমরা কাজ করি।

মেয়েটি বলেন—এর মধ্যে আরও কথা আছে। বড় বড় ছুঁড়ি, মড়ক বহা, ভূমিকম্প প্রভৃতি যাতে দেশকে দেশ বা জাতিতে জাতি কষ্ট পায়—এ সবের মূলে অতি উচ্চ দেবতা—যারা গ্রহদেব প্র্যানেটের স্পিরিট—তাঁদের হাত রয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্য বা কর্মপ্রণালী আমরা বুঝিনে। কিন্তু ঐ সব উচ্চস্তরের বড় বড় লোকে তা বুঝতে পারেন। এর হয়তো কোথাও বড় একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। আমাদের দৃষ্টি তত দূর পৌঁছায় না—তারা সেটা দেখতে পান, কাজেই গ্রহদেবদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে যান না। আপনি কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকুন, ঘোঁরাফেরা করুন, অনেক কিছু দেখতে বা জানতে পারবেন। এ লোকের কাণ্ডকারখানা এত বিরাট ও জটিল যে নতুন পৃথিবী থেকে এসে মানুষে হতভম্ব হয়ে পড়ে—কিছুই ধারণা করতে পারে না।

যতীন বলে—কিন্তু জানবার আগ্রহ আমার অত্যন্ত বেশী, দেবী। আমি জানতে চাই কি করে এই বিরাট আত্মিকমণ্ডলী কাজকর্ম চালাচ্ছেন—এঁরা কি করেন, এঁদেরই বা কে চালাচ্ছে, গ্রহদেব যাঁদের বলছেন, তাঁরাই বা কে, কোথায় থাকেন, কত উচ্চস্তরের আত্মা তাঁদের দেখতে পাওয়া যায় না কেন,—কোথা থেকে তাঁরা এলেন—এ সব না জানলে আমার মনে শান্তি নেই।

মেয়েটি বলেন—জানবার ইচ্ছে থাকলেই ক্রমে ক্রমে সব জানতে পারবেন। এই আগ্রহই আসল। বেশীর ভাগ মানুষ পৃথিবী থেকে এখানে এসে কিছুই জানে না। বোঝে না, বোঝবার চেষ্টাও করে না। জানবেন, জান ভিন্ন উন্নতি নেই। এ লোকে আরও শক্ত নিয়ম। সেবা বলুন, ধর্ম বলুন, প্রেম বলুন—ততদিন উল্ললোকে আপনার ঠাই হবে না, যতদিন জ্ঞানের আলো আপনার মনের অন্ধতা দূর না করচে।

ডাক্তার আমেগো বলেন—পৃথিবীতে কি জানেন, নানা মূনির নানা মতে ফৈদে সত্যের সমাধিলাভ ঘটেছে। এখনও পৃথিবীর মন আপনার যায় নি। এ জীবনের বিরাট প্রসারতা এখনও আপনি দেখতে পান নি। আপনি অজর, অমর, আপনার জীবন শাস্ত্র অফুরন্ত। আপনার জন্মগত অধিকার এই জীবনের অমৃতপানে। আপনি তৃতীয় স্তরের মানুষ, আপনি কি ছোট? আপনিও মুক্তাশ্রা, আপনার সঙ্গে এই মহীরসী মহিলা তো সাক্ষাৎ দেবী। এই সব পৃথিবীর হতভাগাদের ভরসার স্থল আপনার। এরা যখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, সে প্রার্থনা যার কাছে পৌঁছায়, তিনি আপনারদের মত পবিত্র মুক্তাশ্রাদের মধ্যে দিয়ে

নিজেকে প্রকাশ করে এদের সাহায্য করেন। তিনি শক্তি বিকীর্ণ করছেন, আপনারা যন্ত্ররূপে সেই শক্তিকে ধরছেন, ধরে কাজে লাগাচ্ছেন। বেতারের চেউএর আপনারা রিসিভার। যন্ত্র যত উদ্দরের, যত নিখুঁত—তার বাণীর প্রকাশ সেখানে তত সুস্পষ্ট, সুন্দর।

যতীন অদ্ভুত প্রেরণা পেলে, ডাক্তার আমেগোর মত এত বড় আত্মার প্রশংসাতে। কিছু লজ্জিতও হোল। এতপাশি প্রশংসার উপযুক্ত সে নয় তা সে জানে। তবে হবার চেষ্টা আজ থেকে তাকে করতেই হবে।

কিছু পরে পুষ্প ও যতীনের পারের তলার বিশাল ভলগা একটা সফরোপ্যান্ড্রের মত হয়ে ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিনের মত ওরা বিদায় নিলে।

পুষ্পদের বুড়োশিবতলার বাড়ীতে আজকাল দেবী প্রায়ই আসেন। একে আমরা করুণাদেবী বলে পরিচয় দেবো। করুণাদেবী অতি উচ্চস্তরের নীলজ্যোতির্বিশিষ্ট আত্মা—কিন্তু পৃথিবীর কাছাকাছি তিনি থাকতে ভালবাসেন, কারণ পৃথিবীর আর্দ্র জীবকুল ছেড়ে উর্দ্ধে স্বর্গে গিয়ে তিনি শান্তি পান না। এঁর চরিত্রের মাধুর্য্য ও সুন্দর ব্যবহারের কথা শুনে পুষ্প ও যতীন এঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল।

যখনই তিনি আসতেন, একরাশ ফুল ও ফল নিয়ে আসতেন ওপরের স্বর্গ থেকে। সে ফুল যেন স্পন্দনশীল আলোর তৈরী—খাওয়া যায়, খুব সুস্বাদু এবং ভারি চমৎকার ভুরভুরে সুগন্ধ তার। সে ফল খেলে মনে শক্তি ও পবিত্রতা আসে, এই তার গুণ। কিন্তু এই নিম্নতর তৃতীয় স্বর্গে সে ফল বেশী সময় থাকতো না—কিছুক্ষণ পরেই ঠিক কপূরের দলার মত উবে যেত। দেবী বলতেন, ওপরকার জগতের এই সব ফল পৃথিবীর ছায় ফুল দেহের স্থিতির জন্তে জন্মায় না, মনের আধ্যাত্মিক পুষ্টির খোরাক যোগানোই এদের কাজ।

সেদিন তখন ওদের বাড়ীতে সকালবেলা করে রেখেছে পুষ্প। ঠিক যেন পৃথিবীর সকাল, লতাপাতায় শিশির, পাখী ডাকচে ও গঙ্গার ওপারে সূর্য্য উদয় হচ্ছে, পুষ্প সবে গঙ্গান্নান করে শিবমন্দিরে পূজা করতে যাচ্ছে, এমন সময় করুণাদেবী এলেন। পুষ্পকে বল্লেন—বেশ সকালটি করে রেখেচ তো! পূজা সেরে নাও, চল তুমি আর যতীন আমার সঙ্গে একজায়গায় যাবে।

যতীন ঘরের মধ্যে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল।

দেবীকে বসবার আসন দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। করুণাদেবী বল্লেন—তুমি পূজা কর না?

—ওতে আমার বিশ্বাস নেই। আমার মনে হয় পৃথিবীতে দেবতা ও ভগবান সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা গড়ে ওঠে, এখানে এসে তার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন আছে। সে ভাবের দেবতা কই এখানে? সে ভাবের ভগবানই বা কোথায়? পুষ্প মেয়েমানুষ, ওর মনে ভক্তি ও পূজার্তনার প্রবৃত্তি কোনো প্রশ্ন ওঠায় না। বিনা বিশ্বাস বিনা প্রেমের পূজার ফল তার মন-গড়া ইষ্টদেবের পায়ে দেয়। আমি তা পারি না। আমার মনে হয়—

করুণাদেবী বল্লেন—তোমার এ কথাই মধ্যে ভুল রয়েছে, যতীন। তুমি ভেবো না ভগবান সশব্দে তুমি কোনো ধারণা কখনো করে উঠতে পারবে। তুমি কোথায়, আর সেই বিরাট বস্তু, যাকে পৃথিবীতে বলে ভগবান, তিনিই বা কোথায়? অতএব ভক্তি ও অর্চনা-প্ররুতি চরিতার্থ করতে হোলে তোমার মনের মত ভগবান তোমাকে গড়ে নিতে হবে। তোমার সেই মন-গড়া দেবতার মধ্যে দিয়েই অর্ঘ্য পৌছোবে সেই বিশ্বদেবের পায়ে। তুমি তৃতীয়-স্বর্গবাসী জীব, এর বেশী কি করতে পারো?

যতীন ছাড়তো না তর্ক করতো, এমন সময়ে পূজা শেষ করে পুষ্প ফিরে এল। দেবী ওদের ছজনকে নিয়ে পৃথিবীতে এলেন।

যে জায়গাটিতে তাঁরা এলেন, সেখানটা একটা নির্জন স্থান। ছোট্ট একটা নদী, তার ধারে অনেকদূরব্যাপী ঘন জঙ্গল।

যতীন বল্লে—এটা কোন্ দেশ?

দেবী বল্লেন—বাংলাদেশ, চিনতে পারচ না কেন? মধুমতী নদী, এইখানে ছিল বড় গঙ্গা নকীবপুর, রাজা সীতারাম রায়ের আমলে। ধ্বংস হয়ে জঙ্গল হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়া তোমাদের আনতাম না—কারণ যে কাজ করতে হবে তাতে বাঙলা ভাষা বলা দরকার হবে। চল দেখাচ্ছি।

নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় ছোট্ট একখানা খড়ের বাড়ী। কিন্তু বাড়ীখানা দেখেই যতীন অবাক হয়ে গেল। ঘরখানা পৃথিবীর বস্তু দিয়ে তৈরী নয়। আত্মিকলোকের চিন্তাশক্তিতে সৃষ্ট আত্মিকলোকের হৃদয় পদার্থে তৈরী ঘর। পৃথিবীতে এমন ঘর কি করে এল, যতীন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছে—এমন সময় একটি বৃদ্ধ এক বোঝা কঞ্চি বয়ে নিয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

যতীন আরও অবাক হয়ে গেল।

বৃদ্ধটি পার্শ্বব স্থল দেহধারী মাহুস নয়—খুব নিম্নস্তরের আত্মা—পৃথিবীতে যাকে বলে প্রেত। তার হাতের কঞ্চির বোঝাও সত্যিকার কঞ্চির বোঝা নয়, সেটা চিন্তাশক্তিতে গড়া আত্মিকলোকের বস্তু দিয়ে তৈরী।

বৃদ্ধের ভাব দেখে মনে হোল সে তাদের কাউকে দেখতে পারনি।

যতীন বিস্মিত ভাবে বল্লে—ব্যাপার কি? এ তো মাহুস নয়। এখানে এ ভাবে কি করচে?

করুণাদেবী বল্লেন—সেই কথা বলবো বলেই তোমাদের আজ এনেছি। বড় করুণ ইতিহাস লোকটির। ওর নাম দীঘু পাড়ুই। স্ত্রীকে সন্দেহ হয় বলে খুন করে নিরুদ্দেশ হয়—দেশ থেকে পালিয়ে পুলিশের ভয়ে নাম ভাঁড়িয়ে নকীবপুরের এই জঙ্গলে অনেক দিন ঘর বেঁধে ছিল। আট দশ বছর পরে ওর নিমোনিয়া হয়, ভাত্তাই মারা পড়ে। যত্ন পরে হয়ে গিয়েচে আজ ত্রিশ বছর। এই ত্রিশ বছরেও ও বুঝতে পারেনি যে-ও মরে গিয়েচে। ভাবে, ওর কি অসুখ করেছে, তাই ওকে কেউ দেখতে পার না। জঙ্গলের মধ্যে খুব কমই

লোক আসে, কাজেই জীবন্ত মানুষের সঙ্গে ওর পার্থক্য কি, বুঝবার সুযোগ ঘটেনি। নিজেও পুলিশের ভয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। অথচ এত স্থূল ধরনের মন, এত নিম্নস্তরের আত্মা যে, আমি কতবার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারিনি। আমাকে ও দেখতেও পায় না। ওর নিজের লোক যারা মারা গিয়েছে, কখনো কেউ আসে না। তাই তোমাদের এনেচি আজ।

যতীন বলে—আশ্চর্য্য!

দেবী বলেন—মরে গিয়ে বুঝতে না পারা আত্মিক লোকের এক রকম রোগ। পুরোনো হয়ে গেলে এ রোগ সারানো বড় কঠিন, কারণ মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ কখনো না জানার দরুন এই সব অজ্ঞ নিম্ন আত্মারা বেঁচে থাকার সঙ্গে মৃত্যুর পরের অবস্থার সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু আদৌ বুঝতে পারে না। এমন কি, বুঝিয়ে না দিলে ষাট, সত্তর, একশো, দুশো বছর এ রকম কাটিয়ে দেয়, এমন ব্যাপারও বিচিত্র নয়।

যতীন এমন ব্যাপার কখনো শোনেনি। সঙ্গে সঙ্গে এই হতভাগা, বন্ধুহীন, স্বজনহীন, অসহায় বৃদ্ধের ওপর তার সহানুভূতি হোল। করুণাদেবী সতাই করুণাময়ী বটে, পৃথিবীর এই সব হতভাগাদের খুঁজে খুঁজে বার করে তাদের সাহায্য করা তাঁর কাজ, তিনি যদি দেবী না হবেন, তবে কে হবে?

যতীন বলে—আচ্ছা এই খড়ের ঘরটা—

এবার উত্তর দিলে পুষ্প। বলে—বুঝলে না? ওর আসল পৃথিবীর ঘরখানা কোন্ কালে পড়ে ভূমিসং হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই ঘরখানার ছবি ওর মনে তো আছে—ওর চিত্তা সেই ছবির সাহায্যে ঘরটা গড়েচে—যেমন আমার তৈরী গঙ্গা আর কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট। এ লোকে তো ও তৈরী করা কঠিন নয়। অনেক সময় আপনা-আপনি হয়।

দেবী বলেন—পুষ্পকে আর আমাকে ও তো দেখতে পাবেই না। যতীন এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াও তো ওর সামনে!

সন্ধ্যা হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে ঘন অন্ধকারে ঝোপে কাড়ে জোনাকি পোকা জলে উঠলো। যতীন গিয়ে বুড়ার সামনে দাঁড়ালো, কিন্তু তার ফল হলো উটো। বৃদ্ধ শুকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠলো এবং ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো। দেবী বলেন, ও তোমাকে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু ভাবচে তুমি ভূত।

পুষ্প ডাবলে, কি মজার কাণ্ড ঘাণে! ভূত হয়ে ভূতের ভয় করচে!

দেবী বলেন—ওর সঙ্গে কথা বলা—

যতীন বলে—ভয় কি বুড়োকর্তা! ভয় পাচ্চ কেন?

বৃদ্ধ ভয়ে কাঁপচে আর রাম রাম বলচে। যতীনের হাসি পেল কিন্তু দেবী সামনে রয়েছেন বলে সে অতি কষ্টে চেপে গেল।

যতীন আবার বলে—বুড়োকর্তা, ভয় কিসের, তুমি এখানে একলা আছ কেন? এবার বোধহয় বৃদ্ধের কিছু সাহস হোল। সে বলে—আজ্ঞে কর্তা আপনি কে?

—আমার এখানেই বাড়ী। কাছেই থাকি। তুমি কতদিন এখানে আছ? একলা থাকো কেন? তোমার কেউ নেই?

বুদ্ধ এইবার একটু ভিজল। বল্লে—বাবু, আপনি পুলিশের লোক নয়? আমার ধরিয়ে দেবেন না?

যতীন বল্লে—না, কেন ধরিয়ে দেবো? কি করেছ তুমি? তা ছাড়া তোমার যা অবস্থা তাতে পুলিশ তোমাকে এখন আর কিছু করতে পারবে না।

বুদ্ধ উৎকণ্ঠিত সুরে বল্লে—কি হয়েছে বলুন তো বাবু আমার? আপনি কি ডাক্তার। সত্যি বাবু, আমিও বুঝতে পারিনি যে আমার একি হোল। একবার অনেককাল আগে আমার শক্ত অসুখ হয়—তারপর অসুখ সেরে গেল, কিন্তু সেই থেকে আমার কি হয়েছে আমার কথা কেউ শুনতে পায় না, লোককে ডেকে দেখেছি আমার ডাক না শুনে তারা চলে যায়। মামুদপুরের হাটে ঘাই, কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। আমার শরীরে যেন খিদে তেঠা চলে গিয়েছে। আগে আগে ভাত খেতাম, এখন খিদে হয় না বলে বহুকাল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শরীরটা কেমন হালকা মনে হয়, যেন তুলোর মত হালকা—মনে হয়, যেন আকাশে উড়ে যাবো। তেঠা নেই শরীরে। আর একটা জিনিস বাবু, কোনো কিছুতে হাত দিলে আগের মত আর আঁকড়ে ধরতে পারিনে। হাত গলিয়ে চলে যায়। একি রকম রোগ বাবুমশাই? পুলিশের ভয়ে কোথাও যেতে পারি নে, নইলে নলদীর সরকারী ডাক্তারখানায় গিয়ে একবার ডাক্তারবাবুকে দেখাবো ভেবেছিলাম।

যতীন বল্লে—বল্ছি সব কথা। কিন্তু পুলিশের ভয় কর কেন? কি করেছিলে?

বুদ্ধ সন্দ্বিগ্নদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বল্লে—কেন বাবু?

—বল না। আমি কাউকে বলবো না। আমার অবস্থা বুঝতে পারচ না? আমিও তোমার দলের একজন। আমিও মাল্লুষজনের সঙ্গে মিশতে পারিনে।

কথাটার মধ্যে দুইরকম অর্থ ছিল। বুদ্ধ সোজাটাই বুঝলে। বুঝে বল্লে—আপনার নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে না কি বাবু? কি করেছিলেন আপনি?

—আমি আমার স্ত্রীকে খেতে দিতাম না। বাপের বাড়ী ফেলে রেখেছিলাম। তার সঙ্গে আমার ঝগড়া হোত প্রায়ই। তারপর একদিন—

বুদ্ধ বল্লে—বাবু মশাই, আপনি পুলিশের লোক। আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি সব জানেন দেখছি। তা ধরুন আমার, আমার যে রোগ হয়েছে, বোধ হয় বেশীদিন বাচবো না। এরকম জ্যান্ত মরা হয়ে থাকার চেয়ে ফাঁসি ঘাই যাবো। এতদিনে আমার ভুল বুঝতে পেরেছি বাবু মশাই। আমার বৌ-এর কোনো দোষ ছিল না, সত্যি সত্যি ছিল সে। আমার মনে মিথ্যে ধুক্ব ছিল, কালীগয়নার ছোট ভাইটার সঙ্গে বড় হাসিঠাট্টা করতো। বারণও করে দেলাম অনেকবার, তাও শুনতো না। তাই একদিন রাগের মাধ্যম—কিন্তু লোহাই চারোগা বাবু, খুন করবো বলে মারিনি। মাঠ থেকে সবে এসে পা দিইচি বাড়ীতে

দেখি কালীগয়লার ভাই ছিচরণ খিড়কী দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ; চাষার রাগ—বল্লম—ও কেন বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছিল ? বউ উত্তর দেবার আগেই রাগের মাথায় তার মাথায় এক ঘা—

বুদ্ধ হঠাৎ কঁদে কঁদে কঁদে। বল্লে—তারপর আমি সব বুঝতে পেরেছিলাম দারোগাবাবু। ছিচরণকে বউ ভাই-এর মত দেখতো। ছিচরণ হাসির গল্প বলতে পারতো, বউ ভাই শুনতে ভালবাসতো। বৌ-এর কোন দোষ ছিল না। সেই পাপের কলে আজ আমার এই ভয়ানক রোগ জন্মেছে শরীরে। আর আমার জীবনে মায়া নেই, সর্বদা বউডার কথা ভাবি আজকাল। অনেকদিন থেকেই ভাবি। একা একা এই জন্মে এই রোগ নিয়ে আর কাটাতে পারিনে, দারোগাবাবু। জেলে গেলে তবুও পাঁচটা মানুষের সঙ্গে কথা বলে বাঁচবো।

দেবী বল্লেন—ওকে জিজ্ঞেস কর, ও কি বৌ-এর সঙ্গে দেখা করতে চায় ?

যতীন বুদ্ধকে কথাটা জিজ্ঞেস করতেই সে অবাক হয়ে ওর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বল্লে—তবে কি বাবু বৌ হাসপাতালে গিয়ে বেঁচে গিয়েছিল ?

যতীন বল্লে—তা নয়, তুমিও আর বেঁচে নেই। তুমিও মরে গিয়েচ, তোমার বৌও মরে গিয়েচে। আমিও মরে গিয়েচি। সবাই আমরা পরলোকে আছি এখন। তোমাকে উদ্ধার করতে আর দু'জন দেবী এখানে এসেচেন, তুমি তাদের দেখতে পাচ্চ না। এখানেই তাঁরা আছেন। তোমার এ অবস্থা দেখে তাঁদের দয়া হয়েছে। এবার তোমার ভাবনা নেই, তোমার স্বীর সঙ্গেও আমরা দেখা করিয়ে দেব।

বুদ্ধ কিন্তু এসব কথা বিশ্বাস করলে না। সে সন্দ্বিগ্ন স্বরে বল্লে—তবে আমার এই রোগটা হোল কেন ? এটা সারবার একটা ব্যবস্থা করে দিন দয়া করে। বৌ-এর সঙ্গে দেখা করে কি হবে বাবু ? হাসপাতাল থেকে সে যদি সেয়ে থাকে, তবে ত ভালই। তার ভাইয়ের বাড়ী আছে বুঝি ? তা থাক, দেখা করে আর কি হবে বাবুশাই, এ রোগ নিয়ে আর কার সঙ্গে দেখা করতে চাইনে বাবু।

যতীন ওর কাছে পরলোক ও মৃত্যুর প্রকৃতি বর্ণনা করলে খানিকক্ষন। কল্পণাদেবী বল্লেন—ও সব বলো না যতীন ওর কাছে। ওতে কোনো উপকার হবে না। ও কি বুঝবে ওসব কথা ? দেখচো না কত নিম্ন স্তরের আত্মা ? বুদ্ধ বলে জিনিস নেই ওর মধ্যে। ওকে বোঝাতে হোলে অল্পপথে যেতে হবে। ওর স্বীকে আনতে হবে খুঁজে পেতে কোনরকমে, তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ওর তো দেখচি ভালবাসার কোনো বন্ধন নেই স্বীর সঙ্গে। এ অবস্থায় দুজনের যোগ স্থাপন করানোই কঠিন কাজ। এ লোকে যার সঙ্গে যার ভালবাসা বা স্নেহ নেই, তার সঙ্গে তার কোনো ঘোঁসাই যে সম্ভব নয়।

আরও কয়েকবার যাতায়াত ও অনবরত চেষ্টা করলে ওরা। বুদ্ধ কিছু বোঝেই না। তাকে তার অবস্থা বোঝানো সাংঘাতিক কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। তাকে কিছুতেই বোঝানো যায় না যে সে মরে গিয়েছে। কারো ওপর তার টান নেই—না স্বী, না ছেলেমেয়ে, না অল্প কারো ওপর।

করুণাদেবী বলেন—শুধু বুদ্ধিহীন বলে নয়, এমন একটি অভুতধরনের হৃদয়হীন প্রেমহীন আত্মা আমি খুব কমই দেখেছি। মনে প্রেম ভালবাসা স্নেহ এসব যদি থাকতো তা হলেও ওর উদ্ধার এত কঠিন হোত না। কি যে করি এখন!

কিন্তু কি অপূর্ণ নিঃস্বার্থ দরদ করুণাদেবীর! পতিত হতভাগ্যদের ওপর কি তাঁর মায়ের মত গভীর সহানুভূতি! কত কষ্ট করে তিনি নিয়ন্ত্রণের বহু জাগ্রতা খুঁজে পেতে একদিন এক স্ত্রীলোককে এনে হাজির করলেন ওর সামনে। যতীন আর পুষ্প সব সময়েই ঠুঁকে সাহায্য করতো, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। কারণ অত নিয়ন্ত্রণের দেবী সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য—পুষ্পও তাই—যতীনের বিনা সাহায্যে কোন কাজই সেখানে হবার উপায় ছিল না। স্ত্রীলোকটিরও তেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই, মনে প্রেম ভালবাসাও তুথিবচ। ধূসরমিশ্রিত লাল রঙের দেহধারী আত্মা। তবে সে সক্রিয় ধরনের বা অনিষ্টকারী চরিত্রের মেয়ে নয়—মোটামুটি ভাল-মাল্লুষ এবং ওর স্বামীর মতই প্রেম ভালবাসার ধার ধারে না।

খুব এমন কিছু উদ্‌দরের আত্মা না হোলেও বুদ্ধের অপেক্ষা কিছু উঁচু। কিন্তু হঠাৎ খুন হয়ে মৃত হওয়ার ফলে অনেকদিন পর্যন্ত তার এ লোকে ভাল জ্ঞান হয় নি। সম্প্রতি কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ করেছে।

যতীন বুদ্ধকে বলে—চিনতে পারো? এগিয়ে এসে দাঁখো তো—

বুদ্ধ চমকে উঠলো, বলে—বড় বৌ যে!

ওর স্ত্রী হেসে বলে—হ্যাঁ, মৃতের বান্ধি মাথায় দিয়ে ভেবেছিলি হাত থেকে বুঝি এড়ালি। তা আর হোল কৈ?

বুদ্ধ অবাক হয়ে বলে—বড় বৌ, তুই তাহলে বেঁচে আছিস?

বড় বৌ বলে—তুইও যা আমিও তাই। দুজনেই মরে ভূত হয়ে গিয়েছি। আজ এঁরা সব এসেচেন তাই এঁদের দয়ায় উদ্ধার হয়ে গেলি। নে এঁদের গড় কবু পায়ে।

—পুলিশের দারোগাবাবুকে?

—যমের অঙ্কটি—পুলিশের দারোগা আবার কে এর মধ্যে? যরচেন কেবল পুলিশ পুলিশ করে; অত যদি পুলিশের ভয় তবে রাগের সময় কাণ্ডজ্ঞান ছিল না কেন রে মুখপোড়া? এঁকে প্রণাম কর, আর দুজন আছেন, তাঁদের দেখবার ভাগ্যি তোর এখনও হয়নি, এই পিটুলি গাছের তলায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর। চল আমার সঙ্গে, তোকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি—এখন কিছু বুঝবিনে।

বুদ্ধ যতীনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। স্ত্রীর কথায় পিটুলি গাছের তলায় মাথা নাচু করে অদৃশ্য পুষ্প ও দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করলে। স্ত্রীলোকটিও সকলকে প্রণাম করলে—তারপর বুদ্ধকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেল।

ফেরবার পথে করুণাদেবী বলেন—যারা কিছুই বোঝে না, তাদের দিয়ে না হয় নিজের উপকার না হয় পরের উপকার। দেখলে তো চোখের সামনে? যারা এই বিরাট বিশ্বরহস্যের কিছুই বোঝে না, তারা নিজেদের মহান্ অদৃষ্টলিপি, আত্মার বিরাট ভবিষ্যৎ

কি বুঝবে? এসব লোকের এখনও কতবার পৃথিবীতে জন্মাতে হবে, তবে এরা উচ্চস্তরের উপযুক্ত হবে। এদের নিয়ে ভাবনার পড়তে হয় এমন।

যতীন মনে মনে ভাবলে—পতিতের ওপর এমন দয়া না থাকলে সাথে কি আর দেবী হওয়া যায়!

পৃথিবী থেকে ফেরবার পথে একজায়গায় শূন্যপথে ক্ষুদ্র একটি জগৎ মহাশূন্য-সমুদ্রের মধ্যে নির্জজন বীপের মত দেখা যাচ্ছে। তার কিছু ওপর দিয়ে যাবার সময় একটি দৃশ্য দেখে যতীন আর পুষ্প দুজনেই থেমে গেল। এ জগতে এসে পর্যন্ত ওরা অনেক উন্নত স্তরের জ্যোতির্ময়ী মহিমময়ী রূপসী দেবীদের দেখেছে, যেমন একজন করুণাদেবী তাদের সঙ্গেই রয়েছেন। কিন্তু এই নির্জজন ক্ষুদ্র জগৎটির একস্থানে প্রান্তরের মধ্যে শিলাখণ্ডের ওপর যে নারীকে ওরা বসে থাকতে দেখলে, তাঁর শ্রী ও মহিমার কোনো তুলনা দেওয়া চলে না। কি তেজ, কি দীপ্তি, কি প্রজলন্ত রূপ—অথচ মুখে কেমন একটা দুঃখ ও বিষাদের ছায়া—তাতে মুখশ্রী আরও সুন্দর হয়েছে দেখতে। স্বচ্ছ নীল আভা তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে বার হয়ে শিলাখণ্ডটাকে পর্যন্ত যেন দামী পান্নার পরিণত করেছে।

করুণাদেবীও সেদিকে চেয়ে চমকে থেমে গেলেন। বল্লেন—ওঁকে চেন না? বহু সৌভাগ্যে দেখা পেলে। বহু উচ্চস্তরের দেবী, চল, দেখা করিয়ে দিই। তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলে উনি বিশেষ খুশি হবেন এই জন্তে যে, উনি প্রেমের দেবী। ওঁর কাজ পৃথিবীতে শুধু চলে না, বহু গ্রহে উপগ্রহে, স্থল ও আত্মিক জগতে, বিশ্বের বহু দূর দূর নক্ষত্রের মধ্যে যেখানেই জীব বাস করে—সেই সব স্থানেই ছুটি প্রেমিক আত্মার মিলন সংঘটন করিয়ে বেড়ান। উনি একা নন, ওঁর দলবল খুব বড়। অনেক সঙ্গিনী আছে ওঁর। উনি অসীমশক্তিময়ী দেবী, আলাপ হোলে হঠাৎ কিছু বুঝতে পারবে না। অত বড় প্রাণ, অত উদার প্রেম-ভালবাসা ভরা আত্মা তোমরা কখনো দেখনি। খুব সৌভাগ্য তোমাদের যে চোখে ওঁকে দেখতে পেরেচ আজ, এর একমাত্র কারণ আজ তোমরা পৃথিবীতে ওই আত্মাটির উদ্ধারের সাহায্য করেচ, সেই পুণ্যে এই মহাদেবীকে চোখে দেখার সৌভাগ্য লাভ করলে। নইলে সাধ্য কি তোমাদের ওঁকে দেখতে পাও? এসো আমার সঙ্গে, আলাপ করিয়ে দিই।

ওরা এসে সেই দেবীর সামনে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল।

—আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেচে—করুণাদেবী বল্লেন—এরা পৃথিবীর লোক, মেয়েটি একে ভালবাসতো বড়। বাল্যপ্রেম। মেয়েটি আগে মারা যায়, তারপর এ লোকে সে বহুদিন প্রতীক্ষা ছিল। সম্প্রতি মিলন হয়েছে।

প্রণয়দেবী স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিয়ে চেয়ে হাসিমুখে বল্লেন—আমি জানি, সখী। এর নাম পুষ্প, ওর নাম যতীন। আমি ওদের ওপরে দৃষ্টি রাখিনি ভেবেচ? এই একটি সত্যিকার প্রেমের উদাহরণ। যেখানেই সত্যিকার জিনিস, সেখানেই আমি আছি। চেষ্টা করি তাদের মিলিয়ে দিতে, কিন্তু সব সময় পারিনে। আরও ওপরে রয়েছেন কণ্ঠের

দেবতারা—লিপিকদের দল। তাঁদের প্যাঁচ ছাড়ানো কত কঠিন তোমার তো জানতে বাকী নেই! এদের পূর্বজন্মের কর্ম ছিল ভাল, তাও এই ছেলেটির গোলমাল রয়েছে এখনও, পরে দেখতে পাবে। তা এনে ভালই করেচ। আমার মণ্ডলীতে এরা আশ্রুক, কারণ এরা আমারই দলের উপযুক্ত লোক।

পুষ্প ও যতীন উল্লসিত হয়ে উঠল।

প্রেমের ব্যাপারে কি সাহায্য তাদের দিয়ে হবে তারা জানেনা, কিন্তু একথা তাদের প্রাণের কথা যে তারা নিজেদের জীবন ধন্য মনে করবে যদি পৃথিবীর একটি বার্থ প্রণয়ীর জীবনেও তারা সার্থকতার আলো জ্বালাতে পারে। এই তাদের অন্তরের কথা। যারা যে দলের, এতদিন পরে যতীন ও পুষ্প যেন সগোত্র আত্মার আত্মীয়মণ্ডলীকে আবিষ্কার করলে।

যতীন আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল, বিশ্বের কি অদ্ভুত কার্যপ্রণালী! অদৃশ্য জগতের কি বিরাট সংঘরাজি, কি বিরাট কর্মপ্রবাহ। পুষ্প ভাবছিল—কিন্তু করুণাদেবীকে ছেড়ে ওরা কি করে যাবে? তাঁকে যে ওরা বড় ভালবাসে—কিন্তু তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া হবে যে!... করুণাদেবী যেন ওর মনের কথা বুঝেই বলেন—তোমাদের প্রকৃত স্থান ঐর মণ্ডলীতে। আমার দেখা সর্বদাই পাবে, যখন চাইবে তখনই দেখা দেবো, সেজন্য ভেবো না। তোমরা যাও ঐর সঙ্গে।

প্রণয়দেবী বলেন—উনি আর আমি পৃথক নই। উনি যেখানে, সেখানে আমি আছি; আমি যেখানে, সেখানে উনিও থাকেন। প্রেম আর করুণা পরস্পর ফুল আর হুতোর মত একসঙ্গে আছে। হুতোকে ফেলে মালা গাঁথা যায় না, ফুলকে বাদ দিয়ে হুতো নিয়ে মালা হয় না।

—কেন, বিনি হুতোর মালা হয় না সখী?

—বড় সন্তুর্পণে গলার দিতে হয়। বড় ঠুনকো হয়। বড় অল্পে মরে বাঁচে। করুণা প্রেমকে সাহায্য না করলে প্রেম হয় ঠুনকো। এদিকে প্রেম পেছনে না থাকলে করুণা রক্তাক্ততা রোগে মারা পড়ে। ছলনা কেন করচো সখী, তুমি নাকি এ জান না।

আবার নীল শূন্যপথে, আবার বাধাহীন তড়িৎ-অভিমান! যতীন ও পুষ্প বুড়োশিব-তলার ঘাটে পৌঁছে গেল।

যদিও তৃতীয় স্বর্ণের দিন নেই রাত নেই, সময় অবিভাজ্য ও মাত্রাংশহীন তবুও যতীনের সুবিধার জন্তে পুষ্প বুড়োশিবতলার ঘাটে পৃথিবীর মতই দিনরাত্রি সৃষ্টি করতো। ঘুমের আবশ্যক না থাকলেও নিজের সৃষ্ট রাতে ঘুমোতো।

দিন কয়েক পরে।

পুষ্প ঘুম ভেঙ্গে উঠেচে। ওর শয়নকক্ষের বাইরের প্রকাণ্ড মুচুকুন্দ চাঁপার গাছটাতে পাখীরা কিচ্-কিচ্ করচে। ও দেখলে জানালা দিয়ে নতুন-ওঠা প্রভাত-সূর্য্যের আলোর রং কেমন অদ্ভুত ধরনের সবুজ ও গোলাপী। আরও বিস্মিত হোল দেখে যে সেই রঙীন আলোর যুহু জ্যোতিটা বাষ্পাধারে তার খাটটা ঘিরে রয়েছে যেন। যতীন বুঝতে পারতো না ব্যাপারটা। পুষ্প বুঝলে ওপরের স্বর্গ থেকে কোনো উচ্চতর আত্মা তাকে স্মরণ করেচেন।

যতীনকে কথাটা বলতেই সে বলে—চল আমিও যাই।

পুষ্প হুঃখিত সুরে বলে—পারবে না যতুদা, নইলে তোমায় ফেলে যেতে কি আমার সাধ? আমার মনে হচ্ছে ইনি সেদিনকার সেই দেবী, কল্পদেবী যার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তা যদি হয়, সে স্বর্গে যাওয়া তোমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তুমি থাকো, আমি যাই, কাজ শেষ হলেই চলে আসবো।

গোলাপী আলোর সরল জ্যোতিরেখা অহুসরণ করে সে মহাশূন্যপথে উঠলো। পুষ্প চতুর্থস্তরের আত্মা, তার শক্তি গতিবেগ যতীনের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু যতীন সঙ্গে থাকলে পুষ্প নিজেকে সংযত করে চলে ওর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে। নইলে লক্ষ লক্ষ মাইল চোখের নিমিষে অতিক্রম করবার শক্তি ধরে সে।

পুষ্প যে স্বর্গে পৌঁছুলো, পৃথিবীর ভাষায় তার হয়তো বাইরের রূপের অনেক-খানিই বর্ণনা করা যায়, কেবল করা যায় না তার অন্তঃপ্রবিষ্ট সুগভীর শান্তি ও বহুগুণে বদ্ধিত সুখদুঃখের অম্লভূতির স্পন্দমান তীব্রতার। সে কি ভয়ানক জীবনছন্দ! সেখানকার মাটিতে পা দিলেই মনের সুখ, দুঃখ, শোক, স্নেহ, প্রেম কল্পনা সব শতগুণ বেড়ে যায়। অম্লভূতির তীব্রতা যারা সহ্য না করতে পারে, তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে সেই মুহূর্তেই। বলহীন মন স্বর্গলাভ করতে পারে না।

পুষ্প শক্তিময়ী, পুষ্প চতুর্থ স্তরের উচ্চ থাকের আত্মা—তাকেও রীতিমত চেষ্টা করতে হোল প্রাণপণে, সংজ্ঞা বজায় রাখবার জন্তে।

চারিপাশের অদৃশ্য ইথারের তরঙ্গ যেন তার দেহের কোন্ অঙ্গানা ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে তাকে সক্রিয় করে তুলেচে। সে অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়ের কাজ যে-অম্লভূতিরাজকে মনের মুকুরে প্রতিভাত করা—পৃথিবীতে, এমন কি নিম্নতর স্বর্গগুলিতেও, সে সব অম্লভূতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে না।

অথচ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তারা থাকতে পারে এবং আছেও, কেবল আত্মদান করবার ইন্দ্রিয় ঘুমিয়ে আছে। উচ্চ জগতের তীব্রতর স্পন্দন-তরঙ্গ তাকে জাগিয়ে তুলতে পারে—কিন্তু যেমন গঙ্গা যখন মর্ত্তে অবতরণ করেন, তখন কেউ তার তাল সামলাতে পারেনি, ঐরাবত পর্য্যন্ত ভেসে গিয়েছিল—উচ্চ স্বর্গের দেবতা মহাদেব নেমে এসে জটাজাল বিস্তার করে না দাঁড়ালে কারো সাধ্য ছিল না সে বেগবতী শ্রোতোধারার মুখে দাঁড়ায়—ঐ সব অম্লভূতির বেগ তেমনি সহ্য করতে পারে একমাত্র উচ্চস্তরের দেবতারা। চারিদিকে ফুল ফুটে আছে সে

সব ফুলের রঙই বা কত রকম, কিন্তু আলোর মত কি একটা অজানা পদার্থে সে সব গাছ, সে সব ফুল তৈরী—একটা ছিঁড়ে নিলে তার জায়গায় তখন আর একটা রকম ফুল গজাবে। বড় বড় জলাশয় আছে, তার নীলাভ নিম্নরঙ্গ বক্ষের উপর দিয়ে লোকেরা হেঁটে যাতায়াত করচে, যেমন মাটির ওপর দিয়ে পৃথিবীর লোক যায়। অথচ সেখানে নৌকাও আছে—যাদের ইচ্ছে, নৌকা করেও বেড়াতে পারে।

এক জায়গায় ক্ষটিক প্রস্তরের মত স্বচ্ছ কোনো পদার্থে তৈরী একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে ঐ রঙীন জ্যোতিরেখা বাড়ীর মধ্যে ঢুক গিয়েচে। পুষ্প সেখানে ঢুকে দেখলে প্রণয়দেবী একটা বড় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছেন।

পুষ্প ঘরে ঢুকতেই ওর দিকে চেয়ে বলেন—তোমায় ডেকেছি বড় বিপদে পড়ে। আমার একটু সাহায্য করো।

পুষ্প বলে—বলুন কি করতে হবে!

দেবী বলেন—বোসো। পৃথিবীতে গিয়ে কাজ করতে পারে, এমন লোকই চাইছিলাম। তুমি ভিন্ন আর কারো কথা মনে উঠলো না। যতীন কোথায়, তাকে আনলে না কেন?

পুষ্প সলজ্জস্বরে বলে—যতুদা এখানে আসতে পারবে না। আসতে চেয়েছিল, আমি আনিনি।

দেবী প্রসন্ন সহাস্র মুখে বলেন—আচ্ছা, এবার থেকে আমি তাকে নিয়ে আসবো।

—আপনি পারেন, আমার শক্তি কতটুকু, আমার কাজ নয়। একবার পঞ্চম স্বর্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলুম, চতুর্থস্তরেই অজ্ঞান হয়ে পড়লো। আর আমি চেষ্টা করিনি।

পুষ্প একটা জিনিস লক্ষ্য করলে।

প্রথমদিন সে প্রণয়দেবীকে যে মূর্তিতে দেখেছিল এ ঠিক সে মূর্তি নয়। প্রণয়দেবীকে আরও তরুণী দেখাচ্ছে, মুখশ্রী আরও সুন্দর। শরীর স্বচ্ছ, সুন্দর, নীলাভ শুভ্র।

দেবী বলেন—কি ভাবচ?

—আপনি জানেন কি ভাবছি।

—আমার চেহারা এখন যে রকম দেখচো, তখন অন্তরকম দেখেছিলে—এই তো?

পুষ্প কথাটা জানতো। সে শুনেছিল বহু উচ্চ স্বর্গে অধিবাসীদের কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। অধিকাংশ সময়েই তাঁরা একটা ডিম্বাকৃতি সোনালী আলোর মত—যখন কারো সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয় না বা মূর্তি গ্রহণ করবার বিশেষ কোনো আবশ্যক থাকে না—তখন তাঁরা শুধু একটা চৈতন্য-বিন্দুতে পর্যাবসিত হয়ে এই ডিম্বাকৃতি আলোর মূর্তিতে অবস্থান করেন। কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হোলে তাঁরা যে কোন মূর্তি ইচ্ছামত ধারণ করতে পারেন—অতি সুন্দর তরুণের রূপ বা মহিমময় গর্জীর বয়স্কলোকের রূপ বা পৃথিবী-প্রচলিত নানা শাস্ত্র ও ধর্ম-গ্রন্থাদিতে বর্ণিত দেব, দেবী, দেবদূত প্রভৃতির রূপ—যাতে মানুষেরা স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় ট্রাডিশন অম্লযায়ী মূর্তিতে তাঁদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারে, প্রাণে বল ও উৎসাহ পেতে পারে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবুও ভাল করে দেবীয় মুখে শোনবার জন্তে তার কোতুহল হোল। প্রণয়দেবী বলেন—
দেখ, পৃথিবীতেও এই একই ব্যাপার হয়। আত্মার অবস্থার সঙ্গে বাইরের আকৃতি বদলায়।
সাধুর একরকম চেহারা, নিম্নস্তরের লোকের আর একরকম। কিন্তু পৃথিবীর স্থল পদার্থের
ওপর আত্মার প্রভাব তত কার্যকর হয় না। এখানে তা নয়। এমন কি এবেলা ওবেলা
রূপের পরিবর্তন হয় এখানে। খুব প্রেম বা সহানুভূতির সময় এখানে মুখশ্রী দেখতে দেখতে
অপূর্ব সুন্দর হয়ে ওঠে, ঠিক পৃথিবীর খুব ভাবপ্রবণ, বঙ্গনাময়ী, অপরূপ রূপসী কিশোরীর মত।
আবার অল্প অবস্থায় অল্প রূপ ফুটে ওঠে মুখে। ইচ্ছামত যেমন পৃথিবীতে পোশাক বদলায়,
এখানে তেমনি মূর্তি বদলানো যায়—

পুষ্প সকৌতুকে ভাবলে—অর্থাৎ কিনা আটপোরে গেরহালি মূর্তি, পোশাকী মূর্তি,
বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করার মূর্তি, প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের মূর্তি, ভক্তের কাছে পূজা নেওয়ার
মূর্তি—এরা আছে বেশ মজায়।

প্রণয়দেবী পৃথিবীর এই প্রগল্ভা বালিকার চিন্তা বুঝতে পেরে স্নেহের হাসি হাসলেন।
বলেন—আমি পৃথিবীতে এখন যেতে পারছি নে। তুমি যাও, যতীনকে সঙ্গে নিয়ে যাও।
এখানে সরে এসো, যে ব্যাপারের জন্তে পাঠাচ্ছি এখানে এসে দেখ দাঁড়িয়ে।

ওদিকের যে প্রকাণ্ড বড় কন্নাসী বে-উইণ্ডার মত জানালার ধারে তিনি পুষ্প আসবার
আগে দাঁড়িয়ে কি দেখছিলেন, পুষ্প গিয়ে সেখানে দাঁড়ালো।

দাঁড়াবামাত্র তার দৃষ্টিশক্তি যেন সহস্রগুণে বেড়ে গেল। লক্ষ কোটি যোজন দূরবর্তী এক
অতি ক্ষুদ্র গ্রহ—পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র গ্রাম ওর নয়নপথে পতিত হোল। দেখেই বুঝলে, বাংলা-
দেশ। সন্ধ্যা নেমে আসচে।

নারিকেল সুপারি গাছে ঘেরা ছোট্ট একটা একতলা কোঠাবাড়ী। বাড়ীতে বিবাহ
হচ্ছে। উঠোনে ক্ষুদ্র শামিয়ানা টাঙানো, বাইরের বৈঠকখানায় করাস বিছানো, বরযাত্রীরা
এখনও আসে নি, কল্হাপক্ষ ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করচে। সকলের একটা ব্যস্ততা ও
উৎসাহের ভাব। কিন্তু সরুপাড় ধুতি পরনে একটি সতেরো আঠারো বছরের
কিশোরী নিরানন্দ মুখে ঘরের এক কোণে চূপ করে বসে আছে। যেন আজকের উৎসবের
সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই—মাঝে মাঝে চোখের উদ্‌গত অশ্রু আঁচল দিয়ে মুছে কেলে
ভয়ে ভয়ে চকিতদৃষ্টিতে চারিদিকে চাইচে, কেউ দেখতে না পায়।

দেবী বলেন—ওই যে মেয়েটা দেখচো, ওর নাম সুধা, বিয়ে ওর ছোট বোনের। ওই
মেয়েটার হুঁখে আমি এত কষ্ট পাচ্ছি যে স্বর্গে থাকি আমার দায় হয়ে উঠেচে। ও অত্যন্ত
প্রেমিকা মেয়ে—অত অল্প বয়সে অত ভাবপ্রবণ প্রেম-পাগলিনী হয়ে বড় একটা দেখা যায়
না। ও আজ বছর-দুই বিধবা হয়েছে—তের বছরে বিবাহ হয়েছিল। স্বামী বেঁচে ছিল
বছর দুই। এই দু-বছরে স্বামীকে ও প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল। রোজ রোজ লুকিয়ে
লুকিয়ে কাঁদে। আজ ওর ছোট বোনের বিয়ে। ওর কেবলই মনে হচ্ছে ওর বিয়ের দিন-
টির কথা। আজ সারাদিন লুকিয়ে কাঁদচে পাছে মা বাবা মনে কষ্ট পায়। আমার আর

সহ্য হয় না ওর দুঃখ—কি যে করি! তার চেয়েও করুণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মেয়েটিকে আমি তিনজন্ম ধরে লক্ষ্য করছি, তিন জন্মই ওর এই অবস্থা, বিশ্বের অল্পদিন পরেই বিধবা হচ্ছে। অথচ কি ভলবাসার পিপাসা ওর! কি প্রেমপ্রবণ হৃদয়!...আর দেখচো তো, গরীব ঘরের মেয়ে!

পুষ্পের হৃদয় গলে গেল অভাগী বালিকার জীবনের ইতিহাস শুনে। চোখে জল এল। সে বললে—কিন্তু আপনার তো অসীম শক্তি, আপনি তো ইচ্ছে করলেই ওর উপায় হয়।

দেবী বিশ্ব মুখে বললেন—তা হয় না, পুষ্প। কেন হয় না, চল তোমায় দেখবো। তুমি আগে যাও—আমি কিছু পরেই যাবো। যতীনকে নিয়ে তুমি চলে যাও।

লক্ষ লক্ষ মাইল চোখের পলকে অতিক্রম করে পুষ্প এল ওদের বুড়োশিবতলার বাড়ীতে। যতীনকে সঙ্গে নিয়ে তারপর সে চলে এল সুখাদের বাড়ী। সুখাদের বাড়ী তখন বর এসেচে। যেয়েই হালু দিয়ে শাঁক বাজিয়ে বরকে এগিয়ে নিয়ে এল। সুখার সেখানে যাবার উপায় নেই। বাড়ীর বিধবা মেয়ে, মাদ্রলিক কোনো অল্পটানে আজ তার সামনে থাকবার জো নেই। তবুও সে কৌতূহলদৃষ্টিতে ঘরের জানালার গরাদে ধরে উঠোনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে বর দেখচে। কৌতূহল অলক্ষণের জন্ত তার শোককে জয় করেছে।

পুষ্প এসে সুখার পাশে দাঁড়ালো। সুখা যে আত্মা হিসেবে উচ্চাঙ্গের তা তখনি বুঝলে পুষ্প, কারণ পুষ্পের প্রভাব সে তখনি নিজের মনের মধ্যে অনুভব করলে। তার ভারী মনটা তখনি হালকা হয়ে গেল। জীবনে সব যেন শেষ হয়ে যায় নি, আরও অনেক কিছু আছে, জীবনের তো সবে শুরু, বহুদূরের পথে কোথায় কোন্ বাকে নক্ষত্রের মত সারারাত জেগে আছে বনফুলের দল, তাঁদের আলোয় জ্যোৎস্নাময় হয়ে আছে সে জায়গা—আবার আশা ফুটে ওঠে মনে—অতীত বাসররাত্রির স্মৃতির আনন্দের মত পবিত্র অনুভূতিতে মন ভরে ওঠে।

যতীন দেখলে একটি আত্মা অনেকক্ষণ থেকে বিবাহসভার এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করচে। যতীনকে দেখে সে কাঁছে এল। বললে—আপনি কে? আপনি এখানে কেন?

যতীন বললে—আপনি কে?

—আমি এই বিধবা মেয়েটির স্বামী।

—ওকে একটু সাহায্য দিন আজ।

—আমি চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি নে। আপনাকে দেখে বুঝেছি আপনি উচ্চ স্বর্গের মাহুদ, আপনি যা পারবেন, তা আমি পারবো না। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম আপনি এখানে কেন।

—এই মেয়েটির দুঃখে একটি দেবীর মন গলে গিয়েছে। তিনি পাঠিয়েচেন এখানে আমাদের।

—কই, আর কেউ তো নেই এখানে? আপনি তো একা—

যতীন পুষ্পের পাশেই ছিল, সুখার স্বামী খুব উচুদরের আত্মা নয়, ওরা দেখেই বুঝেছিল, সে দেখতে পেলো না পুষ্পকে।

যতীন বলে কথটা। সুধার স্বামী বিনীতভাবে তাকে এবং উদ্দেশ্যে পুষ্পকে প্রণাম করলে। বলে—আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি ওর জন্তে। কিন্তু কিছু করার নেই, ও যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ওকে সাহুনা দেবার চেষ্টা করি—কিন্তু আমার চেয়ে ওর অবস্থা উন্নত, আমার ক্ষমতা নেই কিছু করার—

যতীন বলে—উচ্চস্বর্গের একজন দেবী আপনার স্বীয় ওপর কৃপাদৃষ্টি রেখেচেন—তিনি আমাদের এখানে পাঠিয়েচেন। তিনি নিজেকে এখুনি আসবেন—

পুষ্প বলে—তিনি এসেচেন, এই তো এলেন—

সুধার স্বামী পুষ্পের কথা শুনতে পেল না, যতীন প্রণয়দেবীকে দেখতে পেল না। কিন্তু প্রণয়দেবীর শান্ত কোমল প্রভাব সে মনের মধ্যে অহুভব করতে পারলে। প্রণয়দেবী নিজে সব সময় সুধার পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন, বলেন—এদের ফেলে আমার কোথাও থেকে সুখ নেই। এবারও এদের ওই রকম ভুগতে হবে, সুধার স্বামী তত উচ্চ অবস্থার নয়— তা ছাড়া কেন এরা এ রকম ভুগছে তা আমি ঠিক জানি না। জগতে এইসব ঘটে যে অদৃশ্য বিরাট শক্তির নির্দেশ অহুসারে, সে শক্তি বড় রহস্যময়। তার কর্মপ্রণালী বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না, জানি-ও না।

পুষ্প বলে—তিনিই তো ভগবান ?

প্রণয়দেবী চমকে উঠে বলেন—ও নাম কানে গেলে মন অন্তরকম হয়ে যায়। যখন তখন ও নাম নিও না। ভগবান যে কি, তা আমরা জানিনি এখনও। যে শক্তির কথা বলছি, হয়তো তাকেই তোমরা ওই নামে ডাকো।

সুধার বোনের বিয়ে হয়ে গেল, বরকনে বাসরঘরে চলে গিয়েচে এই মাত্র। গরীবের ঘরের বিয়ে, তবুও উঠানে ছোট শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে চেয়ে এনে, আধমণটাক ময়দার লুচি ভাজা হয়েছে বরযাত্রী ও প্রতিবেশীদের খাওয়ানোর জন্তে, তারা খেতেও বসেচে। গ্রামের বৌ-ঝির দল সেজেগুজে বাসরঘরে ঢুকে বরের চারিপাশে ভিড় জমিয়ে তুলচে। প্রণয়দেবী ঘরে ঢুকে এক কোণে দাঁড়িয়ে প্রসন্নদৃষ্টিতে চারিদিকে চাইলেন, ঘেন মনে মনে সকলকে আশীর্বাদ করলেন। আজকার দিন এবং সময় তাঁর চরণপাতের শুভ সুযোগ পেয়ে দত্ত হয়ে গেল।

কিন্তু যতীন বিষন্ন মনে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল—আজকার বিবাহ-উৎসবের দৃশ্যে তার মনে হচ্ছিল, আশার সঙ্গে এমন এক উৎসবের মধ্যে তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু আজ কোথায় সে আর কোথায় আশা! সুধার মত আজ সে বিধবা, জীবনের সব সাধ তারও আজ ফুরিয়ে গিয়েচে—পরের সংসারে পরের হাততোলা খেয়ে—

পুষ্প ধমক দিয়ে বলে—যতীন-দা!

এই সময় প্রণয়দেবী বলেন—সুধা রান্নাঘরের কোণে বসে কাঁদচে, একটু ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াও পুষ্প।

পুষ্প এসে দেখলে সুধার স্বামীও সেখানে উপস্থিত। তারও চোখে জল। মরণের যবনিকার

আড়ালে প্রেমের এই লীলা পুষ্পকে মুগ্ধ করলে। প্রেম মরণজয়ী, এই সত্যটা এই দৃশ্তে যেন পুষ্পের মনে ভাল করে অঙ্কিত হয়ে গেল।

একটু পরে প্রণয়দেবী নিজেকে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। সুধার যাঁখার তাঁর হাত বেধে বলেন—কোনো দুঃখ কোরো না। আমি মিলন করিয়ে দেবো। তোর মত মেয়ে লক্ষ লক্ষ রয়েছে আমার পৃথিবীতে—তাদের ছেড়ে স্বর্গেও যেতে পারি নে।

পুষ্প বলে—আপনার মত দেবী ইচ্ছে করলে সুধার কোনো উপকার হয় না ?

—আমি সেবা করতে পারি, বিশ্বের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করবার আমি কে ? আমার মত হাজার হাজার আছেন দেবদেবী। তা ছাড়া পৃথিবীর মানুষদের নিয়ে আমার কারবার। অগণ্য জীবলোক রয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—তাদের জন্তে অল্প সব দেবদেবী আছেন।

—তাদের আপনি জানেন ?

—জানি তাঁরা আছেন—পরিচয় সকলের সঙ্গে নেই। আমাদের শক্তি মানুষের চেয়ে হয়তো বেশী, তবুও সীমাবদ্ধ। চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সেদিন যতীন বুড়োশিবতলার ঘাটে একা বসে অন্তমনস্বভাবে আশালতার কথা ভাবলে অনেকক্ষণ। পুষ্প ওকে সব কথা বলেছে, প্রণয়দেবীর মুখে যা কিছু শুনেছিল। তিনিই যখন অন্তরীক্রে উন্টে দিতে পারেন না, সে তো অতি তুচ্ছ ঠাণ্ড কাছ—কি করতে পারে সে ? আশাকে তার নিজের ভাগ্যের পথে চলতে হবে।

পশ্চিমাকাশে অন্তর্যর্থের রাঙা আভা। গঙ্গার বুকে পাল তুলে ছোট বড় নৌকার দল চলেছে। দু-একটা মাছরাঙা পাখী ছোঁ মেয়ে মাছ ধরতে ডাঙা থেকে অনতিদূরে। নৈহাটির গঙ্গা, কেওটা-সাগরের গঙ্গা।

কতক্ষণ সে এরকম বসে ছিল জানে না, হঠাৎ সে চমকে উঠে দেখলে একজন জ্যোতির্ষর পুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে। যতীন শশব্যস্তে উঠে তাঁকে প্রণাম করলে।

আগন্তুক বলেন—বেশ করে রেখেচ হে তুমি ! পৃথিবী থেকে অল্পদিন এসেচ ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তাই দেখচি। হুগলী জেলার বাড়ী ছিল ? তাই গঙ্গার ধার-টার ঠিক এই রকম করেচ। এ সব মায়া। জগৎ বা বিশ্বটাও তেমনি মায়া—সেই এক অথও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ছাড়া সব মায়া। কোন কিছুর মধ্যে বাস্তবতা নেই।

যতীন মনের মধ্যে হাতড়াতে লাগলো। এই ধরনের একটা মতের কথা সে শুনেছিল, একবার একটা বইএও পড়েছিল যেন। মনে এনে বলে—অঈশ্বরমত বলচেন ?

মহাপুরুষ যেন একটু বিস্ময়ের ভাবে বলেন—অঈশ্বর বেদান্ত সম্বন্ধে তুমি জানো ? তবে বই পড়লে কি হয় ? প্রত্যক্ষ অনুভূতি চাই। অথও সচ্চিদানন্দের অনুভূতি চাই। তুমি মরে এখানে এসেচ, কিন্তু জ্ঞান জন্মায়নি ভেতরে। এখানে হুগলী জেলার গঙ্গার ঘাট তৈরী করে রেখেচ। এমনি করেচ অনেকই এখানে। সব মায়া। আবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে

গিয়ে—অতবাক্ষতাস্তেবা—আজই হোক, দুশো বছর কি হাজার বছর পরেই হোক। অথও সচ্চিদানন্দের অল্পভূতি ভিন্ন মুক্তি নেই।

যতীন ভয়ে ভয়ে বল্লে—আজ্ঞে, মুক্তি মানে কি ?

—ভগবানের সঙ্গে একাত্মবোধ। যোগসাধনা ভিন্ন তা সম্ভব নয়। উপনিষদে দুটি পাখীর রূপক বর্ণনা আছে। একটি গাছের দুটি ডালে ওপরে নীচে দুটি পাখী বসে রয়েছে। নীচের পাখীটা মিষ্ট ফল খাচ্ছে, কটু ফল খাচ্ছে,—ওপরের পাখী নিরীকার অবস্থায় বসে আছে, সুখ-দুঃখে উদাসীন, নিজ মহিমায় মগ্ন। একটি পরমাত্মা, অপর পাখীটি ইন্দ্রিয়সুখমগ্ন জীবাণু। নীচের পাখীটি যখন ওপরে উঠে ওপরের পাখীটির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে—তখনই তার মুক্তি।

তদা বিদ্বান্ পূণ্যপাপে বিশ্ব্য নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি—

যতীন এমন কথা কখনো শোনেনি। বিশ্ব্যমুগ্ধের মত চেয়ে রইল সন্ন্যাসীর দিকে। সে ভেবেছিল মরণের পর যখন বেঁচে আছে, তখন তার আর ভাবনা কি ? কিন্তু এখন ওর মনে হোল কোথায় যেন কি গলদ রয়ে গিয়েছে। সে বিনীতভাবে বল্লে—আজ্ঞে তবে আমাদের উপায় ? আমাদের কে যোগ-শিক্ষা দেবে, কি হবে—শুনেচি সে বড় খটমট ব্যাপার—ওসব কি আমাদের জন্তে ?

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—খুব সোজা নয়, শক্তও নয়। আমি পৃথিবীতে তোমারই মত মানুষ ছিলাম। যৌবনে স্ত্রী-বিরোগ হোল, সংসার মিথ্যা মনে হোল। তবুও পাঁচ বছর সংসারেই রয়ে গেলাম। তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করলাম। সদগুরু সন্ধান পেলাম। আসামের এক জঙ্গলে পনের বছর যোগ অভ্যাস করবার পর একদিন গুরুর কৃপায় নিরীকল্প সমাধি হোল।

যতীন রুদ্ধনিশ্বাসে বল্লে—তারপর ?

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—তারপর ? তারপর আর কিছুই না। মুখে সে অবস্থার কথা বলা যায় কি ? সে তুমি কি বুঝবে ? এখনও তুমি ছেলেমানুষ মাত্র। বড় উচ্চ অবস্থার কথা সে সব। তুমি আর নিগুণ ব্রহ্ম এক। মায়া তোমার স্বরূপ আবরণ করে বসেচে। তুমি কেন, পৃথিবীর সব কিছু। ছোট কেউ নও। ভোগরা সবাই অজর অমর, শাস্ত আত্মা—তুমিই এ জগতের কর্তা, এ জগৎকে সৃষ্টি করেচ—তবে ছোট হয়ে আছ কেন ? এই লোকে এসেচ—এও উপাধির লোক। এর আরও ওপরে উচ্চতর লোক আছে—মহা জ্যোতির্গয় লোক, দেবদেবীরা সেখানে বাস করেন। তোমার মত লোক তার ধারণা করতে পারবে না। জগৎকে সৃষ্টি ও লয় করতে তাঁরা সমর্থ। কিন্তু সেও অনিত্য। সেও উপাধি ও স্বগুণস্তরের জগৎ। তারও ওপরে নিরূপাধি নিগুণ ব্রহ্ম বিরাজ করেন। সেখানে পৌঁছুনো মানুষের আগ্রহ থাকলেই হয়। আসলে তোমার সঙ্গে তার অভিন্নতা কোথায় ? এ জগতে দুঃখ নেই, পাপ নেই, শোক নেই, ভয় নেই, মৃত্যু নেই সে তো দেখেই নিলে, ক্ষুদ্রত্ব নেই, এসব কিছু নেই—আছে শুধু আনন্দ, অমরত্ব, বিরাটত্ব। আর তুমিই তার অধিকারী।

অতএব ওঠো, জাগো—তৎ স্বমসি—তুমিই সেই।

সন্ন্যাসীর সর্বদেহ দিয়ে একপ্রকার নীল বিদ্যাতের মত জ্যোতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে—তার দিকে চাওয়া যায় না। যতীন তাঁর পদস্পর্শ করবার জন্তে মাথা নীচু করতেই তিনি বলেন—উহ—ছোট ভেবে আমার পা ছুঁয়ে তোমার কি হবে? ছোট তুমি নও। তুমিই দেব, তুমিই দেবী, তুমিই সগুণ ঈশ্বর—তুমিই জগৎকারণ নিকৃপাধি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—একই আছে, আর কিছু নেই জগতে—একম্ এব, অদ্বিতীয়—পৃথিবী বা পরলোক সব হুদিনের খেলা, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু—বার বার আসা-যাওয়া—সব অনিত্য—জেগে ওঠো—ঘুম ভেঙে জেগে ওঠো।

সন্ন্যাসী এত জোরে জোরে কথাগুলো বলেন—যতীনের মনে হোল তার সমস্ত শরীরে হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেল গেল—সন্ন্যাসীর দেহ থেকেই যেন সে বিদ্যুৎতরঙ্গ ছুটে এল তার দেহে। সে চোখের সামনে কতকগুলো গোল গোল জড়ানো জড়ানো গোলকধাঁধা খেলার মত কি দেখলে—তারপর আর তার জ্ঞান রইল না। যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের মধ্যে সে যেন কোথায় চলেচে।

নীল আকাশ, সোম-স্বর্ষ্য-তারকাচিহ্নিত—তার আশেপাশে, উর্দ্ধে, নায়োতে। বহু দূরে নীল সমুদ্রে ডুবে একটা কুণ্ডলীকৃত নীহারিকা পাক খাচ্ছে—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নক্ষত্র, স্বর্ষ্য,—কুয়াসার ডেউএর মত উজ্জ্বলবিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের বহির্দেশে ভ্রাম্যমাণ—লক্ষ লক্ষ জীবজগৎ, কোটি কোটি জীবজগৎ, লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি আত্মিক লোক—কত নীলা, কত খেলা, কত সুখদুঃখের অনন্ত প্রবাহ—অনন্ত জীবজগৎ.....

এ সবও ছাড়িয়ে এক জ্যোতির্ময় রাজ্যের প্রান্তে গিয়ে একটি অপূর্ণ শান্তির অহুভূতি সে অহুভব করলে...সুগভীর আনন্দ ও শান্তি, আর যেন মনে কোনো আশা নেই, কোনো তৃষ্ণা নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই, পাপের ভয় নেই, পুণ্যের স্মৃতি নেই, স্বর্গভোগের আকাঙ্ক্ষা নেই, পুষ্পের প্রতি প্রেম নেই, আশালতার প্রতি অহুকম্পা নেই—মনই নেই—যেন শুধু আছে ‘হামি আছি’ এই অহুভূতি, আর আছে তার সঙ্গে মিশে এক অতি উচ্চস্তরের আনন্দ, শান্তি, মহা উচ্চ জ্ঞান ও স্বয়ম্ভু স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্বের গভীর অনির্কচনীয় আনন্দ।

যতীনের মনে হোল সেই সন্ন্যাসী যেন কোথায় তার আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেচেন...কখনও তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ দেখা যায়, কখনও যায় না।

তারপর সেটি জ্যোতির্ময় দেশের অপূর্ণ শান্তি ও আনন্দময় আবেষ্টনীর মধ্যে সে প্রবেশ করলে...সঙ্গে সঙ্গে সেই সুগভীর পুলকে তার মন আবার ভরে উঠলো—উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় দেহধারী দেবদেবীরা সে রাজ্যের মণ্ডলে বিচরণ করচেন, তাঁরা যে আসনপীঠে ঠাকুর সেজে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন তা নয়, তাঁরা যেন সে জগতের সাধারণ অধিবাসী, নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত আছেন, তাই কেউ আকাশপথে বায়ুভরে চলেচেন, সমতল ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল পৃথিবীর মানুষের মত নন তাঁরা—উর্দ্ধে, নিম্নে—সবদিকে সমান গতি তাঁদের...হুঁ—একজনকে কাছে থেকে দেখবারও অবসর সে পেলে...পৃথিবীর মানুষের মত দেহ বটে, কিন্তু যেন বিদ্যুৎ

দিয়ে গড়া, দেবীদের মুখের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, তাদের পৃথিবীর বাড়ীতে ছেলেবেলায় একটি প্রাচীন পটুয়ার আঁকা রাজরাজেশ্বরী মূর্তি ছিল দেওয়ালে টাঙানো, তার বুদ্ধা ঠাকুরমা রোজ স্নান সেরে সেই পটের পূজা করতেন, খানিকক্ষণের জন্তে যেন পটের মুখ হাসতো—এতদিনের মধ্যে জীবনে সে সেই পটে আঁকা রাজরাজেশ্বরীর মুখশ্রীর মত সুন্দর ও কমনীয় মুখশ্রী আর দেখিনি...এখানে সে দু-একটি দেবীর মুখ যা দেখবার সুযোগ পেল, পটের সে ছবির মুখের চেয়ে অনেক, অনেকগুণে সুশ্রী, আরও মহিমাময়ী, বক্র চাহনির মধ্যে ত্রিভুবন-বিজয়ী শক্তি... অথচ মুখে অনন্ত করুণার বাণীমূর্তি...

কোথায় যেন রাশি রাশি বনপুষ্প ফুটেচে, নির্ঝাঁপত বোম তাদের সম্মিলিত সুবাসে ভরপুর...

এসবও ছাড়িয়ে চললো সে...মহাবিজ্ঞানের মত তার গতি, কোথাও অনন্ত বোম, মহা-শূন্যের সুদূরতম প্রান্তে, অনন্তের জ্যোতি-বাতায়ন ঘেখানে চারিদিকে উন্মুক্ত...দেবদেবীর বাসস্থান এ সব মহাদেশও যেন অপেক্ষিক চৈতন্যের রাজ্য; বাসনার রাজ্য...এদেরও দূর, বহুদূর পারে, সব আকাশ ও সময়ের পারে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘেখানে এক হয়ে মিলিয়ে গিয়েচে—সোম সূর্য্য নেই, তারকা নেই, অন্ধকার নেই, আলোও নেই—সেই এক বহুদূর দেশে সে গিয়ে পৌছেচে...এদেশ আকারধারী জীব বা দেবদেবীর রাজ্য নয়, সর্ববিধ, আকার এখানে জ্যোতিতে লোপ পেয়েচ, অথচ এ জ্যোতিও দৃশ্যমান আলোকের জ্যোতি নয়, আগুন নয়, বিদ্যুৎ নয়—কি তা সে জানে না...তার সবদিকে, তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে এই জ্যোতি...আর কি একটা বিচিত্র, অনির্কচনীয় অতুভূতি...ওর মন লোপ পেয়েচে অনেকক্ষণ, চৈতন্যও যেন লোপ পেতে বসেচে...অথচ যতীনের মনে হোল এই তার আপন স্থান, এতদিনে আপন স্থানে সে ফিরে এসেচে...এই তার বহুপরিচিত স্বদেশ...যুগ যুগান্ত, কত মহাযুগ ধরে সে এখানে আবার ফেরবার অপেক্ষায় ছিল। মহাবোম আর কেউ নেই, আশালতা না, পুষ্প না, তার যতীনও না, সন্ন্যাসী না, তাদের এ লোকে বাঁধা কত সাধের ঘর বা বুড়োশিবতলার ঘাট না, দেব না, দেবী না, পরলোক না, এমন কি ঈশ্বরও না...

মহাবোমের মহাশূন্য অনাদি, অনন্ত, স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ, নির্বিকার, নির্বিকল্প সে শুধু আছে—পাপহীন, পুণ্যহীন, মঙ্গলহীন, অমঙ্গলহীন, সুখহীন, দুঃখহীন সর্বপ্রকার-উপাধিহীন... সে-ই আছে মাত্র একা।

নিঃসঙ্গ মহাবোমে আর কোথাও কিছু নেই, কেউ নেই!

সে-ই সব।

এমন কি, এ মহাবোমও তার সৃষ্টি—সৃষ্টি নয়—সে নিজেই।

যতীন আর কিছু জানে না।

যখন ওর চৈতন্য হোল তখন সে দেখলে সেই মহাসন্ন্যাসী পাশেই বুড়োশিবতলার ঘাটের রাণাতে বসে আছেন—সে তাঁর এপাশে বসে। যেন সে ঘুম ভেঙে উঠেচে এইমাত্র।

সন্ন্যাসী হেসে বলেন—কি হোল ? দেখলে ?

যতীন মুঢ় ও অভিজ্ঞতের মত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলে—কি দেখলাম বলুন দিকি ?

—আমি চললাম। যা দেখলে, দেখলে। মুখে কি বোঝাবো ? মন নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছায় মাত্র, ওর চেয়ে বড় অহুত্বের দরজা যেদিন খুলবে, সেদিন আমার বোঝাতে হবে না, নিজেই বুঝবে। তোমার সে অবস্থার এখনও বহু বিলম্ব। দু-চার জন্মে হবে না। অনেকবার এখনও পৃথিবীতে যাতায়াত করতে হবে।

তিনি যাবার উদ্যোগ করচেন দেখে যতীন ব্যাকুলভাবে বলে—প্রভু, যাবেন না, যাবেন না। পুষ্প বলে একটি মেয়ে আছে, তাকে একবার দেখা দিয়ে যাবেন দয়া করে ?

সন্ন্যাসী হেসে বলেন—সময় হোলে দুজনেই দেখা পাবে আবার। তবে স্ত্রীলোকের পথ ভক্তির, জ্ঞানের নয়। আমি তোমাদের দুজনকেই জানি, গত তিন জন্ম তোমরা আমার দেখা পেয়েচ, তোমাদের ভালবাসি। কিন্তু তাতে কি হবে ? সময় হয়নি। চক্রপথে ঘুরতে হবে অনেকদিন। আমি আছি তোমাদের পেছনে। নতুবা আমার দেখা পেতে না।

সন্ন্যাসী অস্থিরিত হোলেন।

১৩

একটু পরে পুষ্প এল। বলে—কি করছিলে ?

যতীন তার দিকে সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—পুষ্প, তুমি মায়া ? মিথ্যা ?

—সে কি যতীন-না ? ব্যাপার কি ?

—এ সব তেজি ? তুমি ভুল বুঝিয়েচ পরলোক-টরলোক। আমরা মরে ভূত হয়ে আছি। চক্রপথে এখনো আমাদের অনেক ঘুরতে হবে।

পুষ্প খিল খিল করে হেসে বলে—এ তবু তুমি জানলে কোথায় ? নতুন কথা তোমার মুখে !

—হাসি নয়। আমার মনে শাস্তি নেই। এক মহাপুরুষ এসে অদ্ভুত দর্শন করিয়ে গেলেন আমার গা ছুঁয়ে। এখন বুঝেচি সব মিথ্যা।

—কিছুই বোঝোনি। বুঝতে অনেক দেরি ! ভগবানের দয়া যেদিন হবে সেদিন বুঝবে। এ আমি অনেকদিন জানি। কিন্তু তাতে কি ? এতেই আনন্দ। যুগে যুগে আসবো যাবো, এর শোক-দুঃখেও আনন্দ খুঁজে নেবো। লীলাঙ্গী হয়ে থাকবো তাঁর। তিনিই খেলা করচেন, খেলুড়ে না পেলে খেলা করবেন কাকে নিয়ে ? সবাই ব্রহ্ম হয়ে বসে থাকলে সব শূন্য, নিরাকার। তুমি নেই, আমি নেই, জগৎ নেই—ইহলোক নেই, পরলোক নেই। সত্যি কথা। কিছুই নেই—আবার সবই আছে। খেলা করো না ছুদিন, যতদিন তিনি খেলাবেন।

—তারপর ?

—তারপর সকলের যা গতি, তোমারও তাই। তাঁতে ভক্তি রাখো, সব হবে। তুমি তো তুমি, আমি তো আমি—লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অতি উচ্চ স্তরের আত্মা, যারা দেব-দেবী হয়ে গেছেন—তাঁরাও তাই।...সব অনিত্য।

—তুমি এসব কি করে জানলে ?

—করুণাদেবী সেদিন বলেচেন। ও নিজে মন খারাপ কোরো না। ও শেষ অবস্থার কথা। যখন সে অবস্থা আসবে, তখন আর বসে ভাবতে হবে না। তিনিই পথ দেখিয়ে দেবেন। এখন চলো, আশাবোদির বড় বিপদ, কিছু করতে পারি কিনা দেখা যাক—

যতীন ব্যস্ত হয়ে বলে—কি-কি-কি বিপদ ? আশার ? কি হয়েছে ?

পুষ্প কৌতুকের হাসিতে ভেঙে পড়লো যেন। বলে—ঐ! এত বাসনা এত মায়া যার মধ্যে এখনও, তিনি জগৎকে উড়িয়ে দিয়ে ভগবানে মিশে যেতে চান! সন্নিহিত ভেঁকি দেখালে কি হবে, ও অবস্থা তোমার-আমার ক্ষমতা নয়। পৃথিবী ছেড়ে এসে এখনও তার বাঁধন কাটাতে পারেন না, উনি বড় বড় বুলি ঝাড়ে!।

—সন্ন্যাসী তাই বলছিলেন, সময় হয় নি।

—সময় শুধু হয়নি যে তা নয়—হাতে ঢের দেরি। ও নিজে মাথা ঘামাবে না বলে দিচ্ছি। তাঁর লীলাঙ্গী হয়ে থাকো, মনে মনে সর্বদা তাঁকে ভক্তি করে থাকো। তিনিই আলো জ্বালবার কর্তা। করুণাদেবী কি কম উচ্চ স্তরের জীব ? কিন্তু উনি বলেন, আমি মনে-প্রাণে মেয়েমানুষ—সুখদুঃখ স্নেহভালবাসা নিয়ে থাকতে ভালবাসি। তাঁর সঙ্গে মিশে যেতে চাই নে, লীলাঙ্গী হয়ে থাকি তাঁর সৃষ্টিতে। তাঁকে ভালবাসি মনে প্রাণে, তাঁর জীবনের সেবা করি যুগে যুগে। এই আমার তপস্যা। মুক্তি চাইনে।

—সত্যি, এমন না হোলে আর দেবী! দেবী কি—সাক্ষাৎ মা! জগতের করুণাময়ী মা। আমাকে একবার দেখা দিতে বোলো, পায়ের ধুলো নেবো—না ভুল হোলো, ধুলো আর এখানে কোথায় ? তা ছাড়া ওঁদের পায়ে কি ধুলো লাগে। এত উচ্চ জ্ঞান তাঁর এ আমি জানতাম না।

—আচ্ছা আর অত বিচার করতে হবে না তোমায়। আমি বলবো তোমায় দেখা দিতে। ওঁরাই তো দেবী। পৃথিবীতে ওঁদেরই তো মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা হয়। ওঁরাই দুর্গা, ওঁরাই কালী, ওঁরাই সরস্বতী। নামে কি আসে যায় ? অস্ত্র দেশে হয়তো অস্ত্র নামে পূজা করে।

—এখন কিছু কিছু বুঝি। আগে এসব কথাই শুনিনি কখনো পুষ্প—সত্যি বলছি।

—সময় না হোলে শুনতেও পার না কেউ। অবধূত তোমায় কি দেখালেন বোলো না ?

যতীন বর্ণনা করলে। বর্ণনা করবার সময় তার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সেই অপূর্ণ অন্তর্ভূতি ও পুলকের স্মৃতি এখনও ওর মনে খুব জাগ্রত—তাই বর্ণনা করতে গিয়ে এখনও তার কিছুটা যেন আবার সজাগ হয়ে উঠলো মনে।

আবার সেই অতীন্দ্রিয় জগৎ, যেখানে সংকল্পও নেই, বিকল্পও নেই, মনের পারের সেই অনিন্দিত রাজ্য, ক্ষণকালের জন্তও যার মধ্যে প্রবেশের অধিকার সে পেয়েছিল মহাপুরুষ অবধূতের কৃপায়—সে জগতের বর্ণনা মুখে সে কি দেবে? কথা তাঁর জড়িয়ে যেতে লাগলো, ঘন ঘন রোমাঞ্চ হতে লাগলো সে অবস্থার স্মরণে। পুষ্প সব শুনে শুক্ক হয়ে বসে রইল।

পরে হাত জোড় করে উদ্দেশে প্রণাম করে বল্লে—তাঁর চরণে প্রণাম করো যতীন-দা। বড় ভাগ্যে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েচ! সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সমান গুণ। কি পুণ্য না জানি ছিল তোমার।

দুজনে পৃথিবীতে নেমে এসেচে।

সন্কার কিছু পরে। যতীন কবি নয়, কিন্তু পৃথিবীর এক সন্ধ্যা, কি যে ভাল লাগলো ওর। পৃথিবীতে বৈশাখ মাসের প্রথম, আত্মনিকুঞ্জের নিভৃত অন্তরালে কোকিলের ডাক, সন্ধ্যা হওয়ায় প্রস্ফুটিত বিবপুষ্পের ঘন সুবাস, একটি জামগাছে কচি সবুজ খোলো খোলো জাম ধরেচে, রাঘবপুরের হাট সেরে হাটুরে গোবর গাড়ীর সারি চুয়াডাঙ্গার কাঁচা সড়ক ধরে চলচে আম-কাঁঠাল বাগানের তলায় তলায়, মাঠে মাঠে আউশ ধানের ক্ষেতে সবুজ ধানের জাওলা।

আশাদের পুরুষের ধারের তেঁতুল গাছের তলায় ওরা বসলো। যতীনের মনে হোল, কি সুন্দর পৃথিবীর বসন্ত! সেই বহুপরিচিত প্রিয় পৃথিবী, কত দুঃখ-সুখ, আশা-আনন্দের স্মৃতিতে ভরা। সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়ে ভাল আছে কি মন্দ আছে জানে না, কিন্তু পৃথিবীতে এলেই মন সরে না এখান থেকে যেতে। এই বৈশাখে কচি আমের ঝোল, বেলের পানা, ঐ অদূরবর্তী চুনী নদীতে এই গরমের দিনে অবগাহন স্নান, হাট থেকে পাকা তরমুজ কিনে আনা...নাঃ, পৃথিবীই ভালো। কোথায় এ সব সুখ? মাটির পথে চলার ছোটখাটো কত আনন্দ, কত স্মৃতি...হাসি অশ্রু...

পুষ্প হঠাৎ বল্লে—কি ভাবচো যতীন-দা? ব্রহ্মজ্ঞান পেতে গিয়েছিলে না?

—না পুষ্প, বড় ভাল লাগচে। অনেকদিন পরে এসে—

—পৃথিবীর বাতাসে বাসনা কামনা ভাসচে, এজন্ত বড় বড় আত্মারা পৃথিবীতে আসতে চান না। ছেলেবেলায় যাত্রা হয়েছিল একটা গান শুনেছিল নৈহাটিতে? ‘এ বাঁধন বিধির স্বজন, মানব কি তার খুলতে পারে’—পৃথিবীতে কিরে এসে বৈশীক্ষণ এই জন্তে থাকতে নেই। ঐ ছোটখাটো সুখদুঃখের সোনার শেকলে বাঁধা পড়তে সাধ যায়। ‘পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে’—তুমি তো তুমি!

—যা বলেচ পুষ্প, তুমি দেখছি অনেক কিছু জানো—

—সত্যি যতীন-দা। আমার কি হয় না? এখনই হচ্ছে। বড় বড় আত্মা পর্যাস্ত অনেক সময় পৃথিবীতে কিছুক্ষণের জন্তে কিরে পুনর্জন্ম গ্রহণের কামনা করেন। নিম্নস্তরের দুর্বল আত্মার তো কথাই নেই। খুঁৎ খুঁৎ করে পৃথিবীর কাছাকাছি ঘোরে। নয়তো কষ্ট করে আবার জন্ম নিয়ে বসে। তাদের ঘন ঘন পৃথিবীতে আসা বারণ।

যতীন হেসে বলে—যেমন আমি—

—তুমি কেন, অনেক মহারথীর এই দশা হয়। কিন্তু তাই যদি হবে, তবে মানুষ এগিয়ে চলবে কবে? ভগবানের তা ইচ্ছে নয়। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—এক জাগ্রায় বাধা পড়ে থাকলে চলবে না। পথ অফুরন্ত, পথের পাশে ফুলের শগন্ধে গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়তে ভাল লাগে বটে কিন্তু তা আমাদের গতি আটকে দেবে। অতীঃ, ভয় নেই—এগিয়ে চলো, অতীঃ—

—ওঃ তুমি এত কথা জানলে কবে পুষ্প?

—করুণাদেবীর সঙ্গে কি এমনি এমনি বেড়াই। তা ছাড়া আমি তোমার কত আগে এখানে এসেছি জানো তো? দয়া করে ওঁরা আমাদের শিখিয়েচেন। ভগবানের মহাশক্তিই এগিয়ে নিয়ে চলেচে সবাইকে—

হঠাৎ পুষ্প পুরুষপাড়ের ওদিকে চেয়ে বলে—ঐ ঠাথো যতীন-দা—

যতীন চেয়ে দেখলে পুরুষপাড়ের আমবাগানের তলায় চুপি চুপি চোরের মত একটি লোক এসে দাঁড়ালো। একটু পরেই ওদের বাড়ীর খিড়কিদোর খুলে আশা বের হয়ে এল এবং গাছতলায় লোকটির সঙ্গে যোগ দিলে। যতীন সর্কশরীরে কেমন একটা জালা অমুভব করলে। সংস্কারের প্রভাব, জালা তো দেহের নয়, আসলে মনের।

সে আপন মনে বলে উঠলো—যহু মুখুয্যের ছেলে নেতানারান—

পুষ্প বলে—চেন ওকে?

—কেন চিনবো না? শশুরবাড়ীর এ পাড়াতেই ওদের বাড়ী, ও কলকাতায় কি চাকরী করতো জানি, বি-এ পর্যন্ত পড়েছিল তাও জানি। আশা বলতো প্রায়ই, আমাদের গাঁয়ের নেতাদা এবার বি-এ পাশ দেবে। উঃ আশা যে এতদূর নেমে যাবে—! এখনও আমি ছবছর মরিনি—এর মধ্যেই—পাণীয়সী!

—যাত্রীদের ভীমের মত কথা শুরু করে দিলে যে যতীন দা! আশা-বৌদির বয়সের কথা ভেবো। জড়দেহ থাকলেই তার কামনা বাসনা আছে। বড় বড় হাতী তলিয়ে যাচ্ছে তো মূর্খ আশা-বৌদি।

যতীন বিরক্ত হয়ে বলে—লেকচার রাখো। এই দেখাতে নিয়ে এলে! উঃ, ইচ্ছে হচ্ছে ছোকরার ঘাড়টা মটকাই—পারি কই? হাত পা যে হাওয়া!

—অত অধৈর্য্য হয়ো না। খুন করবার প্রবৃত্তি জাগলো কেন? একটা কিছু করতে হবে। সে কিন্তু ওভাবে নয়। একটা ছোকরাকে মারলে আরও অনেক ছোকরা জুটবে। মন নীচু দিকে নামলে জলের মত গড়িয়েই চলে। আশা-বৌদির অদৃষ্ট ভাল না। এখনও অনেক দুঃখ, অনেক অপমান আছে ওর ভাগ্যে, তুমি আমি কি করবো? কর্মকল ওর। বোচাৰী! এখন ওরা যা করচে, তাতে বাধা দিতে তুমি আমি কেউ নই। মাহুদ স্বাধীন, সে পুতুলখেলার পুতুল নয়। বাসনানদী পাপের পথেও বয়, পুণ্যের পথেও বয়। চলো, এক কাজ করি।

যতীন কিন্তু এগিয়ে গেল পুকুরের ওপাড়ের দিকে। আশার পরনে সরু কালোপাড় ধুতি, হাতে ক'গাছা সোনার চুড়ি, যতীন চিনতে পারলে তাদের গ্রামের মহেন্দ্র সেকরার দোকান থেকে বিয়ের পরের বছর গড়া। আশা বসে পড়েচে গাছের গুঁড়ির আড়ালে, নেতানারান কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে।

আশা বলচে—বাড়ী করে দিলে গাঁয়ের লোক যদি কিছু বলে ?

নেতা হাত নেড়ে বল্লে—খোড়াই কেয়ার। এ শর্খা আর কাউকে ভয় করে না। তুমি ঠিক থাকলেই হোল। তুমি বলবে, বাপের বাড়ীর সংসার আর ছুদিন পরে ভাই-এদের সংসার হবে। আমার শশুরবাড়ীর টাকায় আমি বাড়ী করচি। মিটে গেল, কার কি বলবার আছে ?

—ও জমিটা তা হোলে কিনতে হবে তো ?

—সে লেখাপড়া আমি করে দেবো। বেশ হবে, ইটের দেওয়াল আর খড়ের চালা করে দিই। তুমি ওখানে চলে যাও। পাড়ার বাইরে ঘর হবে, একটু বেশী রাত করে চলে যাবো, শেষ রাতে উঠে চলে আসবো। এমন বনে-জঙ্গলে ভয়ে ভয়ে আর দেখা করতে হবে না। সারারাত্রি মজা করো, কি বলো ?

—তুমি যা বোঝো। আমার কিন্তু হাতে মাত্র পঞ্চাশটি জমানো টাকা আছে, আর কিছু নেই বলে দিচ্ছি—হু এক কুঁচো গহনা-ভাঙা সোনা হয়তো আছে। বাড়ী করবার খরচ কিন্তু তোমায় দিতে হবে।

নেতা হাসিমুখে বল্লে—দেখি মুখখানা ? ও মুখ দেখে বাড়ী তো বাড়ী, পরস্যা থাকলে মটোর গাড়ী কিনে দিতে পারতাম। কিন্তু বলে দিচ্ছি, ও শত্ৰু চক্ৰতিটার সঙ্গে আর কথা বলতেও পাবে না কোনো দিন।

আশা হেসে বল্লে—আহা! শত্ৰুদার ওপর তোমার অত হিংসে কেন ? আমি কবে কি করচি তার সঙ্গে ? সে আসে যায়, পাশের বাড়ীর ছেলে, তাড়িয়ে তো দিতে পারিনে ?

—আচ্ছা, ভালো কথা। নিজের বাড়ী হোলে সে তো আর পাশের বাড়ীর ছেলে থাকবে না, তখন নতুন বাড়ীতে না চোকে যেন।

আশা একটু ভেবে বল্লে—হ্যাঁগো, এতে গাঁয়ে কোনো কথা উঠবে না তো ? আমি মেয়েমানুষ, কি বুঝি বলো। তুমি রাগ কোরো না—আমার ভয় করে।

—কোনো ভয় নেই। নেতা মুখুয্যে যে কাজে হাত দেবে, তাতে কিছু গোলমাল হবে না। কিছু ভেবোনা।

কথা শেষ করে নেতা আশার পাশে বসে পড়ে তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বল্লে—আমায় ভালোবাসো আশা ?

আশা এদিকে ওদিক চেয়ে মুহূর্তে বল্লে—নিশ্চয়ই।

—সত্যি বলচো ?

—কেন, সন্দেহ আছে নাকি ?

—তোমাদের যে মতিস্থির নেই কিনা, তাই বলছি। কাল সারাহুপুর শুল্লু চক্কতির সঙ্গে গল্প করেচ।

—আহা! মা সেখানে সব সময়ে বসে। শল্লুদা একটা কবিতার বই পড়ে শোনাচ্ছিল।

—কি কবিতা ?

—তা জানি নে। কিন্তু সেজন্তে তুমি ভাবো কেন ? আমার একটা উপায় যেখানে হয়, সেখানেই আমি থাকবো। মা বুড়ো হয়েচেন, আমার নিজের হাতে সঞ্চাল নেই। ভাইবোরা এসে যদি জালা দেয়, দুকথা শোনার, সে সংসারে থাকা আমার পোষাবে না। যদি অদৃষ্টই মন্দ না হবে, তবে এত শীগ্গির কপাল পুড়বে কেন আমার ?

আশা মুখ নীচু করে আঁচলে চোখের জল মুছলে। যতীনের মন করুণা ও সহানুভূতিতে ভরে উঠলো ওর ওপরে—তাহলে জীবনের এসব সঙ্কটময় মুহূর্তেও আশা তার কথা মনে করে! এখনও তাকে সে ভোলেনি! পুষ্প ওর পাশে এসে মুহূর্তের বন্ধ—চলে এসো যতীনদা, এখানে থেকে কিছু করতে পারবে না।

গভীর রাত্রি।

আশা তাদের বাড়ীর ছোট্ট ঘরে ময়লা বাগিশ মাথায় দিয়ে মেজ্জেতে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। গরমের দরুন শিয়রের জানালাটা খোলা। পুকুরপাড়ের অভিসার থেকে কিরে সে ছুটি মুড়ি খেয়ে শয্যা আশ্রয় করেছে। গরীবের ঘরের বিধবা, রাত্রে লুচি পরোটা জোটে না।

যতীন বলে—আহা, কি খেলে দেখলে তো পুষ্প ? পেট পুরে খেতেও পায় না।

—তা তো হোল, কিন্তু এখনও ঘুমোয়নি ভালো। গরমে ঘুমতে পারচে না। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এখন সামনে যেও না। এই রকম আধ-তন্দ্রা অবস্থার তোমাকে ও দেখতে পেতে পারে। তোমার দেহও এখনও তেমন হৃদয় হয়নি। তাতে কল হবে উট্টো! ও আঁক-পাঁক করে উঠবে ভূত দেখচে বলে, সেবারে সেই জানো তো ?

যতীন বাইরের রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালো। যতীনের বন্ধা শাওড়ী পাশের ঘরে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। যতীনের মনে পড়লো, আশার সঙ্গে প্রথম বিয়ের পরে এই ঘরে তাদের বাসর হয়। তারপরে জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়ীতে এসে সে এই ঘরে নববিবাহিতা বধূর সঙ্গে রাত্রিযাপন করেছে। কোঁথায় গেল সে সব দিন! তার ইচ্ছে নেই অল্প কোঁথাও যাবার। আশা বিপন্ন, সে এখানে আশার কাছেই থাকবে। স্বর্গ-টর্গ তার জন্তে নয়। ঐ সেই কুলুদ্বি, আশার জন্তে এক শিশি গন্ধতেল কিনে এনেছিল একবার, ঐ কুলুদ্বিটাতে থাকত, দুজনে মাখতো। তার মাথায় জোর করে বেশি তেল ঢেলে দিয়ে আশা নিজের হাতে মাখিয়ে দিত। কাঁড়াকাড়ি করে মাখতো দুজনে।

সেই আশা কেন এমন হয়ে গেল ?

পুষ্প এসে বল্লে—এসো যতীন-দা। আশাবোধি ঘুমিয়ে পড়েচে।

আশা খানিকক্ষণ আগে ঘুমিয়েচে। ময়লা বালিশটা মাথায় দিয়ে ছেঁড়া মাদুরের শরীর এলিয়ে দিয়েচে। যতীনের মন করুণার ভরে উঠলো। মেয়ে-মাল্লুষ অসহায়, ওদের কি দোষ। সংসারে বহুলোক ওং পেতে আছে ওদের বিভ্রান্ত করে ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্তে। একটু আশ্রয়ের আশায় ওরা না বুঝে না ভেবে দেখে, সে পথে ছোটো। যতীন কাছে গিয়ে ডাকলে—আশা ?

পুষ্প বল্লে—দাঁড়াও, শুধু ডাকলে হবে না, লেকচারের কাজ নয়। ওর মনে তোমাদের কোনো একটা সুখের রাত্রির ছবি আঁকো। যেমন ধরো তোমাদের ফুলশয্যার রাত্রি, তোমাদের গায়ের ভিটেতে।

—সে কি করে করব ?

—সেদিনের কথা একমনে চিন্তা করো—

একটু পরে আশার হৃদয় শরীর ওর দেহ থেকে বের হয়ে মুট, অভিজ্ঞতের মত চারিদিকে চাইলে। কিন্তু পুষ্প দেখেই বুঝলে সে দেহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগতের উর্দ্ধের অতি নিম্নস্তরেও নিজের চৈতন্য প্রকাশ করতে অসমর্থ।

পুষ্প বল্লে—ওকে ছবি দেখাও যতীন-দা—

—ছবি দেখবে কে ? ওর তো এ লোকে জ্ঞান নেই দেখছি—

—ছবি দেখাও, তা হোলে একটু চান্সা হয়ে উঠবে—

—ফুলশয্যার রাত্রিরের ?

—বা যে কোনো একটা সুখের দিনের। পারবে তো ? আমার দ্বারা তো হবে না। তোমার নিজের ছবি তোমাকে দেখাতে হবে।

যতীন একমনে ভেবে সত্যিই একটা ছবি তৈরি করতে সমর্থ হোল। এ স্তরে চিন্তার শক্তি ক্ষণস্থায়ী আকার নির্মাণ করতে সমর্থ—একটা পুরোনো কোঠার ঘর আশাকে এবং ওদের সকলকেই যেন চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে। কাঁঠাল-কাঠের পুরোনো তক্তপোশে লেপ তোলাক পাতা বিছানা যতীনের পৈতৃক, জানালায় বাইরে মনসাতলায় আমগাছটা, ঘরে জল-চৌকীর ওপর বক্ষককে পুরোনো পেতল কাঁসা, যতীনের মায়ের হাতে মাজা। যতীনের শোবার সেই ঘরটি এমন বাস্তব হয়ে উঠলো যে আশার ঘরবাড়ী মিলিয়ে গেল। যতীনও যেন অবাঁক হয়ে গেল তার চিন্তাশক্তির কার্য দেখে। আশা তার শব্দরবাকীর ঘরটাতে শুয়ে আছে—প্রায় নিখুঁত শব্দরবাকীর ঘর, দেওয়ালে টাঙানো কাঠের আশিটা পর্যন্ত। আশার হৃদয় দেহ তখনও অর্দ্ধ-অচেতন। যতীন স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকলে—আশা, ও আশা—

আশা যেন ঘুম ভেঙে উঠে চারিদিকে চাইলে এবং কি দেখে একটু অবাঁক হয়ে গেল। যতীন আবার ডাকলে—আশা, ও আশা—

আশা যতীনের মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল, যেন কিছু বুঝতে পারলে না।

—আশা, ভাল আছ ?

পুষ্প বল্লে—অমন ধরনের কথা বোলো না। ছবির সঙ্গে খাপ খাইয়ে পুরোনো দিনের মত কথা বোলো।

যতীন বল্লে—আশা, কাল সকালে উঠে কাপাসডাঙার যাবো কাজে। ভোরে একটু চা করে দিতে পারবে ?

আশা উত্তর দিলে—খুব ভোরে যাবে ? কত ভোরে ?

—সাতটার মধ্যে।

আশার চোখের মুচ দৃষ্টি তখনও কাটেনি। সে বল্লে—আমি কোথায় ?

যতীন বল্লে—কেন, তোমার স্বত্তরবাড়ীতে—চিনতে পারচো না ? কি হয়েছে তোমার ? চা দেবে করে ?

—হ্যাঁ।

—খাবার দেবে না ?

—কি খাবে ? চিঁড়ে দিয়ে ঘোল দিয়ে খেও এখন।

একদিন আশা সত্যিই এই কথা বলেছিল। যতীনের চোখে জল এল আবেগে। সে আবার তার পুরোনো পৈতৃক বাড়ীর বিন্দুত দিনে ফিরে গিয়েচে নববিবাহিতা আশার পাশে। যতীনের অমুভূতির তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে তার তৈরি ছবি আরও স্পষ্ট নিখুঁত হয়ে উঠলো। আশা এবার আরও সজাগ হয়ে উঠে চারিদিকে চাইলে, কিন্তু তার বিন্দুতের দৃষ্টি এখনও কাটেনি।

যতীন বল্লে—তাহলে তাই। আমার তুমি ভালবাসো আশা ?

কথা বলেই নেতা চক্কতির মত সে আশার হাতখানা নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে রাখলে। তারপর পেছনে চেয়ে দেখলে পুষ্প সেখানে নেই। মেয়েমানুষ, যত উচ্চস্তরের হোক না কেন, প্রেমাস্পদ অন্তরে ভালবাসচে, এতে মন স্থির রাখতে পারে না।

আশা বল্লে—হ্যাঁগা, তুমি কখন এলে ?

—কোথা থেকে আসবো ?

—যেন তুমি অনেকদিন বাড়ী ছিলে না !

—নিশ্চয়ই ছিলাম। কোথায় আমি যাবো ? খেপলে নাকি আশা ?

আশা প্রবোধপ্রাপ্ত ছোট মেয়ের সুরে বল্লে—যাওনি তাহলে ?

—না আশা—কোথায় যাবো ?

—আমার কল্লে একজোড়া শাড়ী এনে দিও কাল। আটপোরে শাড়ী নেই।

—ক' হাত ?

—এগারো হাত দিও, দশহাতে ঘোমটা দিতে পারিনে মার সামনে, লজ্জা করে।

—বেশ।

তারপর আশা ভেবে ভেবে বল্লে—আচ্ছা, আমার কি একটা হয়েছিল বলা তো, কিছুতেই

যেন মনে নিয়ে আসতে পারছি নে।

—কি আবার হবে, কিছুই না।

—ও! তবে বোধহয় স্বপ্ন দেখেছিলাম। না?

—তাই হবে। লক্ষ্মীটি, ও সব ভাবতে নেই। তুমি আমার ভালবাসো?

আশা সলজ্জ স্বরে বললে—হঁ-উ—

যতীন ভাবলে, কোন্ জগৎ সত্য? এই ছবিতে গড়া স্বপ্নের জগৎ, না বাস্তব জগৎ? না কি সবই স্বপ্ন? সেদিন সেই অবধূত যা বলে গিয়েছিল। জগৎটাই জাগ্রত স্বপ্ন ছাড়া আর কি? কোথাকার আশা, কি সে দেখচে, কে তাকে কি ভাবাচ্ছে। অথচ আশা ভাবচে এই বৃষ্টি সত্য। ভগবান কি জীবকে ছবি দেখাচ্ছেন না তাঁর সৃষ্ট জগতের মধ্যে দিয়ে, যেমন সে এখন দেখাচ্ছে আশাকে?

সে স্নেহে স্বরে বললে—তা হলে তুমি ঘুমিয়ে পড় আশা, রাত হয়েছে—

—আজ বড্ড গরম, না? ঘুম হচ্ছে না। একটা মশারি এনে দিও—বড্ড মশা—

—তা হবে। সকালে সকালে উঠে চা করে দিও তাহলে?

—আচ্ছা।

পুষ্প বাইরে থেকে বললে—চলো, যতীন দা। একদিনে ওর বেশি আর কিছু তুমি করতে পার না।

ওরা চলে যাওয়ার একটু পরে আশার ঘুমও ভেঙে গেল। সে খড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে চারিদিকে দেখলে। এ কোথায় সে আছে? এমন স্পষ্ট স্বপ্ন সে আর কখনো দেখেনি। কতদিন পরে সে তার স্বামীকে এত স্পষ্ট ভাবে দেখেচে, এইমাত্র যেন তিনি পাশে বসে ছিলেন। কতক্ষণ স্বপ্নের কথা সে ভাবলে। সব কথা তার মনে নেই, এইটুকু মনে আছে, তিনি যেন বলছেন—একটু চা করে দিতে পারো? চা খাবো—

সেই পুরোনো হাসি, পুরোনো আমলের স্নেহদৃষ্টি স্বামীর চোখে। আশা উদ্ভ্রান্তের মত জানালার বাইরে চেয়ে রইল। কোথায় আজ সেই স্বামী, কোথায় তার সেই খগুরবাড়ী! নিজের প্রতি করুণায় তার মন ভরে গেল, চোখে জল এল।

১৪

সেদিন পুষ্প বললে—যতীন দা, মন খারাপ করে বসে আছ নাকি? চলে করুণাদেবীর কাছে যাবে।

—আমি সেখানে যেতে পারবো না। অত উঁচুতে উঠলে আমার চৈতন্ত থাকে না জানো—সব সময় তাঁকে দেখতেও পাইনে। কি করবো বলো। তা ছাড়া, আমার অল্প অনেক রকম ভাবনা—

—ভাবনা তো জানি। ও ভেবে কোনো লাভ আছে? যার যেমন অদৃষ্টে আছে, তেমনি হবে। চেষ্টা তো করলে অনেক। ওর কর্মফল ওকে ওই পথে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি আমি কি করবো বলো।

আরও কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। আশালতার মনের অবস্থা দিনকয়েকের জন্ত একটু ভাল হয়েছিল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনো ফল তাতে হয়নি। নেতা তাকে গ্রামের প্রান্তে আলাদা বাড়ী করেও দেয়নি। ভুলিয়ে তার কতকগুলো সোনার গহনা হাত করে সেই টাকায় ওকে কলকাতায় এনে রেখেছে। যতীন রোজ সেখানে যায় রাত্রে, একটা লম্বা ব্যারাকমত পুরনো বাড়ীর একটা ঘরের সংকীর্ণ রোয়াকে আশা বসে রাঁধে, এখানে সে পাশের ভাড়াটীদের সামনে সামাজিকতা বজায় রাখবার জন্তে বিধবার বেশ ঘুচিয়ে নেতার স্ত্রী সেজেছে, হাতে চুড়ি পরে, কপালে সিঁদুর দেয়। প্রথমে যেদিন নেতাই তার কাছে এ প্রস্তাব করে যতীন সেখানে উপস্থিত ছিল।

নেতা বলে—রাস্তা থেকেই তোমাকে এটি করতে হবে আশা। এখানে যাবে, সেখানে আশ-পাশের ঘরে অনেক ক্যামিলি বাস করে। তাদের সামনে কি বলে দাঁড়াবে, কি পরিচয় দেবে? বাড়ীওয়ালাই বা জায়গা দেবে কেন?

আশা বলে—সে আমি পারবো না। ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা হয়ে আবার পেড়ে কাপড় পরবো, সিঁদুর পরবো—এ হবে না আমার দিগে নেতা দা—

নেতা শ্রবণের সুরে বলে—নাও নাও আর ছাকামি করতে হবে না। ব্রাহ্মণের বিধবার তো সব রাখলে, এখন যার সঙ্গে বেরিয়ে এলে তার কথামত চলো।

—আশা বিশ্বাসের সুরে বলে—বেরিয়ে এলাম।

—আহা হা নেকু! বেরিয়ে আসার কি হাতীঘোড়া আছে না কি? আবার তুমি ঘরে ফিরে যাও তো মানিক। এতক্ষণ গায়ে ঢি-ঢি পড়ে গিয়েছে ছাখে গে যাও—

—বা-রে, তুমি বলে আমাকে কলকাতায় আলাদা বাসা করে দেবে। আমি আমার গহনা বিক্রি করে চালাবো—তারপর মাকে সেখানে নিয়ে এসে রাখা হবে। বলো নি।

—হ্যা গো হ্যা। এখনও তো ভাই বলচি, বলচি নে? আমার হাত ধরে যে-মান্তর বাড়ীর বাইরে পা দিয়েচ, সেই মান্তরেই তুমি বেরিয়ে এসেচ। ওকেই বলে বেরিয়ে আসা। এখন আর কেবাবার পথ নেই—যা বলি, সেই রকমই করো। তোমার ভালোর জন্তেই তো বলচি। দেখো কত সুবিধে হবে, কলকাতায় বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হবে। আখেরে ভালো হয় কিনা দেখে নিও।

যতীন সেদিন কিয়ে এসে পুষ্পকে সব বলেছিল। পুষ্প বলে—আশাদি বড় নির্বোধ, নেতা লোকটা ওকে ভুলিয়ে এই কাণ্ডটা ঘটাবে। কিন্তু কিছু করবার নেই।

—কেন পুষ্প? এক অবলা মেয়েকে দরুনেশের পথ থেকে বাঁচাতে পারো না তোমরা?
—কই পারি। যে যার কর্মফলের পথে চলে, কে কাকে সামলায়?

এরপর প্রায় তিন মাস কেটেছে। আশা ও নেতা বাসাবাড়িতে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে

বসে স্বামী-স্ত্রীর মত সংসার করচে। নেতা বাজার করে নিয়ে আসে, আশার সামনে বসে গল্প করে, দু'বার সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েচে, একবার পাশের ঘরের ভাড়াটেদের সঙ্গে আশা কালীঘাটেও ঘুরে এসেচে।

পুষ্প কত চেষ্টা করেছে যতীনকে ওখান থেকে আনবার। কিন্তু যতীন শোনে না, পুষ্পকে লুকিয়ে সে আজকাল প্রায়ই আশার বাসায় যায়। একদিন রাতে একটা স্বপ্নও দেখিয়েছিল, কিন্তু পুষ্পের সাহায্য না পাওয়ার সে স্বপ্ন হয় বড় অস্পষ্ট, তাতে ঘুম ভেঙে উঠে আশা সারা সকালটা মন ভার করে থেকে নেতার কাছে বসুনি খায়।

পুষ্প বলে—চলো আজ করুণাদেবীর কাছে গিয়ে বলি—

—এইখানেই তাঁকে আনো। আমি কোথাও যাবো না।

—পৃথিবীর মধ্যে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াবে এই রকম?

—কি করি বলো। আমরা তো খুব উচুদরের মানুষ নই তোমাদের মত, এই আমাদের পরিণাম। কর্মকল!

যতীনের ঠেস দেওয়া কথায় পুষ্প মনে আঘাত পেলেও মুখে কিছু বলে না। সে বেশ বুঝেছে যতীনদাকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত না করলে ওর উন্নতি হবে না। যতদিন আশা বাঁচবে, তার পেছনে অস্থানে কুস্থানে ও ঘুরে ঘুরে বেড়াবে—তাতে কোনো পক্ষেরই কোনো সুবিধে হবে না।

ইতিমধ্যে একদিন একটা ব্যাপার ঘটে গেল আশাদের বাসায়। আশার গ্রামের শঙ্কু চক্কতি বলে সেই ছেলেটি অনেক খোঁজাখুঁজির পরে আশার সন্ধান পেয়ে সেখানে এল। আশা তখন রান্না করচে। শঙ্কুকে ঢুকতে দেখে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। শঙ্কু এসে বলে—কি আশাদি, চিনতে পারো?

আশা শুকনো মুখে ভয়ের সুরে বলে—এসো বোসো শঙ্কুদা—কি করে চিনলে ঠিকানা?

—নেতা স্বাউণ্ডেলটা কোথায়? আমি একবার তাকে দেখে নিতাম। তারপর, কি মনে করে এখানে এসে আছ?

—কারণ দোষ নেই শঙ্কুদা, আমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি।

—গায়ে কি রকম স্বেচ্ছা পেয়ে গিয়েচে তুমি জানো না। কেন তুমি এরকম ক'রে এলে? কতদূর খারাপ করেচ তা তুমি বুঝেচ?

—গায়ে থেকেই বা কি করতাম শঙ্কুদা। এ বেশ আছি। আমাদের মত মানুষের আবার গী আর অগী কি? কি ছিল জীবনে? মা মরলে কোথায় দাঁড়াইতাম? এখানে খারাপ নেই কিছু! কীরে যখন খেতে পারবো না, তখন সেকথা ভেবে আর কি হবে!

—আমি তোকে বোনের মত ভালবাসি আশা, চল তোকে এখান থেকে নিয়ে অল্প জমিগায় রেখে দেবো।

আশা কি একটা জগাব দিতে যাচ্ছে এমন সময়ে নেতা এসে হাজির। শঙ্কুকে ওখানে দেখে সে খুব চটে গেল মনে মনে, তখন কিছু বলে না, কিন্তু তারপর আশাকে যথেষ্ট তিরস্কার

ও অপমান করলে। তার ধারণা আশাই শত্রুকে লুকিয়ে খবর দিয়ে এনেছিল।

যতীন সব দেখলে দাঁড়িয়ে। আজকাল সে সন্দেহ করে এই নেতার জন্মেই আশা শত্রুবাড়ী যেতে চাইত না। পুষ্প সব জানে কিন্তু তাকে কখনো কিছু বলেনি। তবুও রাগ হয় না আশার ওপর—গভীর একটা অমুকম্পা, সে দ্বিতীয় স্তরের প্রেত যদি হোত, তবে নেতাকে একদিন এমন বিভীষিকা দেখাতো যে মরে কাঠ হয়ে যেতো নেতা, কেমন নেতা সে দেখে নিত!

করুণাদেবীর কাছে এইজন্মেই সে গেল পুষ্পকে নিয়ে। একটা ক্ষুদ্র ঘ্রীণের মত স্থান অসীম ব্যোমসমুদ্রে, চারিদিকে উপবন, কুম্মমিত বহুলতা, কিছুদূরে একটা বর্ণা পড়চে পাহাড়ের মাথা থেকে। বনানীর বহু সৌন্দর্য্য ও উপবনের শোভা এক হয়ে মিলেচে। একটা প্রাচীন বৃক্ষতলে ঝরা পাতার রাশির ওপর দেবী এলিয়ে শুয়ে পড়েছেন। কেউ কোথাও নেই, শূন্য ঘ্রীণ, শূন্য ব্যোমতল। দেবীর অপরূপ রূপে সেই প্রাচীন বনস্থলী উজ্জল হয়ে উঠেচে। যতীন ভাবলে, এই তো স্বর্গ। এত সৌন্দর্য্য দিয়ে গড়া যে ছবি তা স্বর্গ ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীতে এমন বনবনানীর সমাবেশ কই, যদি বা থাকে এমন রূপসী মেয়ে কই, তাও যদি থাকে, এত নির্জনতা কই—যদি বা থাকে, এতিনের অদ্ভুত সমাবেশ কোথায়? দেবীর মাথায় কি এই তৈরি হয়েছে? হয়তো তাই। এতটুকু একটা গ্রহ বা উপগ্রহ, শুধু বনবনানীতে ঘেরা, সেখানে আবার অল্প কেউ নেই উনি ছাড়া, আবার দিব্য পাখীর ডাকও আছে! করুণাদেবীর মুখশ্রী কি সুন্দর! আর কি মহাহুভূতি ও করুণায় ঈষৎ বিষাদমাখা। মাতৃমুন্তির এমন অপূর্ব্ব মহিমময় জীবন্ত অলেখ্য তার সামনে থাকতেও যদি সে ঈশ্বরের দয়ায় কি দেবদেবীতে বিশ্বাস না করে, তবে সে নিতান্ত নিকোঁধ। শুধু পুষ্পের জন্মেই সে এখানে আসতে পারচে বা দেবীকে দেখতে পাচ্ছে—নইলে তাঁর দর্শন পাওয়া তার পক্ষে কি সহজ হোত?

যতীনের বক্তব্য পুষ্পই বললে। আশাবোদি কলকাতার বাসাবাড়ীতে কাল রাত্রে মার পর্য্যন্ত খেয়েচে—সারারাত কৈদেচে, যতীনের মনে বড় কষ্ট। এই আকর্ষণ তাকে সর্ব্বদা পৃথিবীতে টানচে, এখন কি করা যায়?

করুণাদেবী সব শুনে বলেন—এতে কিছু করবার নেই। কত্যা যতদিন ঠেকে না শিখবে, তার জ্ঞান হবে না।

যতীন ভাবলে—একি কথা হোল! এত বড় দেবীর মুখে এ কি সাধারণ পৃথিবীর মানুষের মত কথাবার্তা! এ কথা তো পৃথিবীতে যে কোন জমিদারগিন্নি কি দারোগা ইন্সপেক্টরের বৌ শুনেই বলতো।

সে বললে—আপনি মন করলে কি ওকে দয়া করতে পারেন না?

করুণাদেবী হেসে বলেন—আমি খেটেই মরি, ভেবেই মরি। দয়া কি করতে পারি সে-ভাবে বাছা? এদের যেদিন ভালো হবে, সেদিন আমারও ছুটি। এ সব অতি নিয়মের আত্মা, কেউ ওদের ইচ্ছে করে কষ্ট দিচ্ছে না, নিজের কষ্টফলে কষ্ট পাচ্ছে। ভগবান প্রত্যেক

বিভূতি-রচনাবলী

লোককে বড় দেখতে চান, সৎ, সুন্দর, নির্মল দেখতে চান, উচ্চ প্রকৃতি জাগলো কিনা দেখতে চান—যেমন ধরো সেবা, স্বার্থত্যাগ, দয়া, ভক্তি, ভালবাসা। এ যাদের মধ্যে নেই বা জাগেনি, তাদের সেগুলো জাগিয়ে দেবার কৌশল তাঁর জানা আছে। কষ্ট দিয়ে, শোকের বোঝা রোগের বোঝা দিয়ে যে করেই হোক ও-লোকে কি এ-লোকে তার চোখ কোটানোর চেষ্টা হয়ই, তাও যাদের না হয়, অন্তগ্রহে তাদের জন্মগ্রহণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, যে গ্রহ পৃথিবীর চেয়েও দীর্ঘ গতিতে চলে। সেখানে লোকে আস্তে আস্তে অনেক সময় নিয়ে সব জিনিস শেখে। জড়বুদ্ধি জীবেরা তাড়াতাড়ি শিখতে পারে না—সেটা তাদের উপযুক্ত পাঠশালা। এলোকেও নরকের মত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা আছে, অতি নিম্নস্তরের পাপী জীবেরা সেখানে ঠেকে শিখে মাহুষ হচ্ছে। এ একটা মস্ত বড় বিতালয়। দেখতে চাও? একবার নিয়ে যাবো—

পুষ্প জিজ্ঞেস করলে—তাহলে আশা বোঁদির কি হবে বলুন—

—আমি দেখি একটু ভেবে, দাঁড়াও।

পরে তিনি চোখ বুজে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। চোখ চেয়ে ওদের দিকে চেয়ে বলেন—
এখনও তিন জন্ম। ওর হৃদয়ে প্রেম নেই। সব স্বার্থ। যে কোনো লোককে ভালবাসলেও তো বুঝতাম। এখন যার সঙ্গে আছে, তাকেও তেমন ভালবাসে না। সাংসারিক স্বার্থ। বড়ো মার সেবা না করে তাকে ছেড়ে এসেচে। যতীনের মনে ভালবাসা আছে, তাই সেখানে যায়। কিন্তু ওর স্বীর কোনো উপকার আপাতত কিছু হবে না।

যতীন বলে—ওর জন্মে মন বড় ধারাপ, ওর কষ্ট দেখে—

—তুমি যাকে ভাবচো কষ্ট বা পাপ, ও তাকে ভাবচে সুখ, সাংসারিক সুবিধা। ও যেদিন পাপ ভেবে ত্যাগ করবে, সেদিনই না ওর উন্নতি। তোমার ভাবনায় কি হবে?

—আমি কি ওর কোনো উপকার করতে পারিনে? আপনি যদি দয়া করে ওকে পাপী ভেবে ওকে সাহায্য করেন—

—পাপ বলে যে না বুঝেচে, অনুতাপ যার না হয়েছে, পাপকেই যে আনন্দের পথ বলে ভাবচে, যার মনে ত্যাগ নেই, কর্তব্যবুদ্ধি নেই, কোনো উচ্চ ভাব নেই—আনবার চেষ্টাও নেই—তাকে শুধু দয়া করলেই ভালো করা যাবে না। ওর ভার আছে যাঁদের হাতে তাঁরা অসীম জ্ঞানের প্রভাবে জানেন, এই সব নিম্নশ্রেণীর মনকে কি ভাবে সংশোধন করতে হয়। সেই পথ দিয়ে ওরা উঠবে। কোনো আত্মীয় প্রভাব ওর মনে রেখাপাত করবে না।

পুষ্প বলে—যদি আমরা রোজ ওর মনে ভাল ভাব দেবার চেষ্টা করি?

—উষর মরুভূমিতে বীজ বুনলে কি হয়? যে চায়, সে পায়। যে কৈঁদে বলে, ভগবান আমায় ক্ষমা করো, আমায় পথ দেখিয়ে দাও, সে পাপপুণ্য বুঝেচে। তখন তাকে আমরা সাহায্য করতে ছুটে যাই। যে যা চায়, সে তা পায়। যে জ্ঞান চায় তাকে জ্ঞানের পথ দেওয়া হয়। যে ভগবানের প্রতি ভক্তি চায়, তাকে সাধুজনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়, মনে ভক্তির সঞ্চার করে দেওয়া হয়।

—যে বলে আমি ভগবানকে দেখবো ?

—ভগবান তাঁকে দেখা দেন।

যতীন বিশ্বয়ের সুরে বলে—তিনি দেখা দেন ?

—অবিধাস করবার কি আছে বোলা। সে যে-ভাবে চায় সেই রূপ ধরে তাকে দেখা দেন। ভগবানের বিরাট রূপের ধারণা কে করতে পারে। ইষ্ট মূর্তিতে দেখতে চায়, যার যা ইষ্ট। যে রূপ যে ভালবাসে, তাকে তিনি সেইরূপেই দেখা দেন। তিনি করুণার সাগর, কত বড় করুণা তাঁর—তা তুমি জানো না, বুঝতেও পারবে না। ক্ষুদ্র বুদ্ধির গম্য হয়ে ক্ষুদ্র সযক্স পাতিয়ে মা, ভাই, বোন, সন্তান, বন্ধু সেজে দেখা দেন।

—আমার প্রতি একটা আদেশ করুন দেবী, আপনার কাছে এসেছি অনেক আশা নিয়ে, শুধু হাতে ফিরে যাবো ?

—আমি যা করতে পারি, এখন তা করবো না। সময় বুঝলে পৃথিবীর যে কোনো ভ্রাস্ত্র ছেলেমেয়ের সাহায্যে আমিই সকলের আগে ছুটে যাবো, বাঁছা। আশালতার কথা আমার মনে রইল। কিন্তু এখনও অনেক বাকি, অনেক দেরি, যতদূর বুঝি। তুমি পৃথিবীতে বেশি যাতায়াত কোরো না। পৃথিবীতে গেলে এমন সব বাসনা কামনা জাগবে যা তোমাকে কষ্ট দেবে শুধু—কারণ পৃথিবীর মানুষের মত দেহ না থাকলে সে সব বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। তখন হয়তো তোমার ইচ্ছে হবে আবার মানুষ হয়ে জন্ম নিই। প্রবল ইচ্ছাই তোমাকে আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করাবে। অথচ এখন পুনর্জন্ম নিয়ে কি করবে ? গত জন্মে বা করে এসেছে তাই আবার করবে। সেই একই খেলা আবার খেলবে। তাতে তোমার উন্নতি হবে না। অথচ যার জন্তে করতে যাচ্ছ, তারও কিছু করতে পারবে না। কারণ ও সব ভালমন্দ করবার কর্তা তুমি নও। যে যার পথে চলেছে, তোমার পথ তোমার, তার পথ তার। পর্ততকে টলাতে পারবে না, বিশ্বজগতের নিয়ম বড় কড়া, একচুল এদিক-ওদিক করবার শক্তি নেই কারো।

—আপনারও না ?

করুণাদেবী হেসে বলেন—তুমি এখনও ছেলেমানুষ। আমি তো আমি, পৃথিবীর গ্রহদেব স্বয়ং পারেন না। তিনি তো অসাধারণ শক্তির দেবতা, ভগবানের ঐশ্বর্য রয়েছে তাঁর মধ্যে। তবে আমরা যেখানে যাই, সময় হয়েছে বুঝে যাই। যেখানে সাহায্য করলে সত্যকার উপকার হবে আত্মার, এ আমি মনে মনে বুঝতে পারি। সে ক্ষমতা আছে আমাদের। সেখানেই যাই শুধু। ঐ যে বল্লম, পাপ বুঝে যে সে পথ থেকে ফিরতে চায়, ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকে, বলে, আমি ভুল বুঝি, আমায় ক্ষমা করো, দয়া করে পথ দেখিয়ে দাও—ভগবান সেখানে আগে ছুটে যান—তাঁর কতবড় করুণা, কত প্রেম জীবের প্রতি—তা ক'জন মানুষে বোঝে ? সবাই পৃথিবীতে টাকা নিয়ে যশ নিয়ে মান নিয়ে উন্মত্ত—

যতীন ও পুষ্প তাঁকে প্রণাম করে চলে আসতে উদ্ভত হোলে তিনি ওদের দিকে চেয়ে

প্রশ্ন স্বন্দর হেসে বালিকার মত ছেলেমানুষী সুরে বলেন—আমার এ জায়গাটা তোমাদের কেমন লাগে ?

হুইজনেই বলে, ভা'রি চমৎকার স্থান, এমন তারা কখনো দেখেনি।

দেবী বালিকার মত খুশি হোলেন ওদের কথা শুনে। বলেন—মাঝে মাঝে এখানটাতে বিশ্রাম করি। তোমরা মাঝে মাঝে এসো। একাই থাকি।

যতীন বিনীত সুরে বলে—গ্রহদেব বৈশ্রবণকে দেখাবেন একবার ?

কল্পদেবী হেসে বলেন—তোমার দেখচি বড্ড বড় সাধ।

যতীন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফেরবার পথে সে পুষ্পকে বলে—এমন না হোলে দেবী! কি সরলতা! জায়গাটা সবকিছু আমাদের সার্টিফিকেট পেয়ে খুশি হয়ে গেলেন!

উচ্চ স্বর্গে আজ পুষ্পকে নিয়ে গেলেন প্রেমের দেবী। বহু বিচিত্র বর্ণের মেঘের মধ্যে দিয়ে সে অগ্নীয়া যাত্রা। অনন্তের জ্যোতি-বাতায়ন খুলে গিয়েচে যেন, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েচে সে আলো।

দেবী বলেন—সারা পৃথিবীতে প্রেমের জন্ত এত হুংখণ্ড পাচ্ছে মানুষ! ইচ্ছে হয় সব মিলিয়ে দিই।

—দেন না কেন দেবি ?

—দিই তো। কাজই ওই। আমার যা ক্ষমতা তা করি। তবে আমাদের ক্ষমতারও সীমা আছে—দেখচো তো সুধার কিছুই করতে পারচি নি। সুধার মত লক্ষ লক্ষ নরনারী পৃথিবীতে—তবে আমরা আত্মপীড় করি নে তোমাদের মত। সময় অনন্ত, সুযোগ অনন্ত—তোমরা ভাবো অমূল্য দিন যাবে যাবো কবে আর কাজ করবো? আমরা জগৎকে দেখি অন্ধ চোখে—

পুষ্প হেসে বলে—মরেচি তো অনেকদিন, তবে আর কেন এ অন্ধযোগ দেবি ?

প্রশ্নদেবী হঠাৎ থকে দাঁড়িয়ে বলেন—আঁহা! আজ একাদশী। সুধা শুয়ে আছে ঘরে দোর দিয়ে—দেখো এখানে এসে।

একটা আলোকের পথ যেন তৈরী হয়ে গিয়েচে এই অসীম ঝোঁমের দুক চিরে। পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভাঙা কোঠার ভাঙা ঘরকে তার নোনাল চূর্ণ-বালি-বস্মা দেওয়ালের বাবধান ঘুচিয়ে যুক্ত করেচে অনন্ত তারালোক-পাতি মহাকাশের সঙ্গে, দেবদানের পথে।

পুষ্পের সারাশরৎ আনন্দে ও সন্তোর অল্পভূতিতে শিউরে উঠলো—যেখানে প্রেম, যেখানে সত্য, যেখানে গভীর বসন্তভূতি বা হুংখণ্ড, যেখানে স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের যোগ ক্ষণে ক্ষণে নিবিড় হয়ে ওঠে—সংঘট সে অদৃশ্য যোগের বাস্তব পৃথিবীর মানুষ জানেও না, বিশ্বাসও করে না।

কোকিল ডাকে বৈশাখের অপরাহ্নে, চাঁদাতরা মাঠে, নদীতীরে। সে সুরের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর বনবোপ যুক্ত হয় সুরলোকের আনন্দবীণার বঙ্কায়ের সঙ্গে। কে জানে সে কথা।

—আর একটি দেখবে? এদিকে চেয়ে দেখ—

পুষ্প কিন্তু সে দেশ চিনতে পারলে না। খুব ফর্সা মেয়েটি, বয়স নিতান্ত কম নয়—
দেখেই বোধ হয় আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থার মেয়ে। একটা পুরোনো সোফায় বসে বসে কি
পরিষ্কার করচে। জিনিসটা পুষ্প কখনো দেখেনি, বুঝতে পারলে না।

দেবী বল্লেন—ওর স্বামী ছিল শিকারী, কার্পেথিয়ান পর্বতে শিকার করতে গিয়ে বুনো
শুওরের হাতে মারা পড়ে। সে আজ সতেরো আঠারো বছরের কথা—স্বামীর তামাক খাবার
নলটা যত্ন করে রোজ পরিষ্কার করে, ফুল দিয়ে সাজায়। সুন্দরী ছিল, বিধবা বিবাহ
করবার জন্তে কত লোক খুঁকেছিল—কারো দিকে কিরেও চায় নি। দুঃখ কষ্ট কত গেয়ে
আসচে, খেতে পায় না—তবুও স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান।

পুষ্প কি ভেবে বল্লেন—বিবাহিত স্বামী যদি না হয়, তবে কি আপনাদের দৃষ্টি সেদিকে
পড়ে না?

প্রণয়দেবী হেসে বল্লেন—পুষ্প!

পুষ্প সলজ্জ ভাবে চোখ নিচু করলে।

—আমাদের অবস্থাস ক'রো না, ছিঃ—আমি তোমাকে কতদিন থেকে দেখছি জানো,
যতদিন তুমি পৃথিবী থেকে প্রথম এখানে এলে। যতীনের সঙ্গে আমিই তোমাকে মিলিয়ে
দিয়েছি—নইলে তুমি ওর দেখা পেতে না। প্রেমের আকর্ষণ না থাকলে পৃথিবী ছেড়ে এসে
সকলের সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে।

—এমন হয়?

—কেন হবে না? সেই তো বেশি হয়। একটি মেয়েকে জানি, সে পৃথিবী থেকে
এসেচে আজ তিনশো বছর। তার স্বামী এসেচে তার আসবার পঁচিশ বছর পরেই। কিন্তু
তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি আজও। এই তিনশো বছর। কারণ প্রেম নেই। প্রেম না
থাকলে আমরা মিলিয়ে দিই না। তাতে পরস্পরের আত্মার ক্ষতি বই লাভ হবে না
কিছু।

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লেন—উঃ! তিনশো বছর স্বামী-স্ত্রীর দেখা হয় নি?

দেবী বল্লেন—মানে, আর হবেও না। তারা কেউ নয় পরস্পরের। এতে বিস্মিত হবার
কিছুই নেই। সত্যিকার প্রেম দুটি আত্মাকে পরস্পর সংযুক্ত করে। যে-প্রেম যত কামনা-
বাসনাশূন্য সে প্রেম তত উচু। এই ধরনের প্রেমের জন্তই আমাদের কত খাটুনি।

পুষ্প ফিরে এসে দেখলে যতীন নেই, আবার পৃথিবীতে চলে গিয়েচে আশার কাছে।
পুষ্পের মনে কেমন একটা ব্যথা জাগলো—এতে করেও যতীনরা আপনাদের হোল না!
পরক্ষণেই সে নিজের দুর্বলতা ঝেড়ে কেলে দিলে। পৃথিবীর সম্পর্কে আশা বৌদিদির
অধিকার তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ছায়া। ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে।

যতীন কলকাতার সেই ছোট্ট বাসাবাড়ীতে আবার এসে দাঁড়িয়েচে। নেত্যা বাসাতে

উপস্থিত আছে বটে কিন্তু ঘুমুচ্ছে। আশা বসে বসে পরদিন রাত্রির জন্তে মোচা কুটচে। যতীনের মনে হোল এমনি একদিন সে কুড়ুলে বিনোদপুরের বাড়ীর রোয়াকে বসে আশাকে মোচা কুটতে দেখেছিল, যতীনের মা তখন বেঁচে, পাশেই তিনিও ছিলেন বসে সেদিন। যতীন কোথা থেকে এসে হঠাৎ এ দৃশ্য দেখে বড় আনন্দ পেয়েছিল। পল্লীসংসারের সেই শাস্ত পরিচিত পরিবেশ! এখনও তাই, সেই ছবিটিই অবিকল, কিন্তু কি অবস্থায়! কোথায় মা, কোথায় কুড়ুলে বিনোদপুরের সেই যত্নে পাতানো সংসার—কোথায় সে।

কোথায় যেন কি অবাস্তবতা লুকিয়ে ছিল আপাতপ্রতীয়মান বাস্তবতার পেছনে। আসল রূপটি চিনতে দেয়নি সংসারের। ছেলেবেলায় শোনা যাত্রার পালার সেই গান মনে পড়লো—

কেবা কার পর, কে কার আপন,

কালশয্যা পরে মোহতজ্জা ঘোর,

দেখি পরস্পরে অসার আশার স্বপন।

সব মিথ্যে। সেই সম্মানীর দেখানো নিরীকল্প সমাধির অবস্থা মনে পড়লো। কেউ কারো নয়। সব স্বপ্ন, সব মায়া, সব অনিত্য।

পুষ্প এসে পাশে দাঁড়াতেই যতীনের চমক ভাঙলো। এ তো এসেচে, একে কিন্তু মিথ্যা বলে মনে হয় না তো? 'নৈহাটির ঘাটে, বসে পৈঠার পাটে'—সেই পুষ্প কি অখণ্ড-সত্যরূপে বিরাজ করচে চিরদিন এই খণ্ডিতসত্য খণ্ডিতসত্তা জীবনের আপাতপ্রতীয়মান স্থায়িত্বের মধ্যে?

আশা মোচা কুটে উঠে নেতাকে ডাকতে লাগলো—ওগো, ওঠো—ভাত বাড়ি?

নেত্যা জড়িতস্বরে কি বলে, তারপর চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসলো বিছানায়। বলে—কি? বাবাঃ, এতক্ষণ বসে বসে মোচা কুটলে? রাত কত?

—তা কি করে জানবো?

—দেখে এসো চৌধুরী মশায়ের ঘরে।

—হ্যাঁ, এখন বুড়ো খেটে খুটে এসে শুয়েচে, আমি গিয়ে ওঠাই—

—শত্ৰু চক্রান্তি আজ এসেছিল?

—আমি জানিনি অতশত খোঁজ। এখন উঠে দয়া করে খেয়ে আমার হাত অবসর করে দাও—

এ কথার উত্তরে নেতা আবার সটান বিছানায় শুয়ে পড়ে একটা অলীল কথা উচ্চারণ করে চোখ বুজলে।

পুষ্প বলে—যতীন দা, তুমি চলে এসো, এখানে থেকে না।

—পুষ্প, তুমি চলে যাও, আমি আর একটু থাকি।

যতীনের মুখের ও চোখের ভাব যেন কেমন। ও মোহগ্রস্ত হয়ে উঠেচে পৃথিবীর স্থল আবহাওয়ায়। এ সব জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা ওর পক্ষে ভালো না। চুষকের মত আকর্ষণ

করে পৃথিবীর যত বাসনা কামনা আত্মিক লোকের জীবকে। টেনে এনে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করে—ওপরে উঠতে দেয় না। অবিশি যে বাসনা কামনা বিসর্জন দিয়েচে, সে কামচর, স্বাধীন, মুক্ত। শত পৃথিবী তাকে বাঁধতে পারে না! কিন্তু যতীনের মত আত্মার পক্ষে এমন ঘন ঘন যাতায়াত বড় বিপজ্জনক।

পুস্প কিছু বলবার আগেই যতীন আবার বল্লে—আমার বড় ইচ্ছে, ককর্ণাদেবীকে আর একবার আশার বিষয় বলি। তোমার কি মত?

—যতীনদা,—তাতে কল হবে না। আশা বৌদির কৰ্ম ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ কিছু করতে পারবে না। নইলে চেষ্টা তুমি আমি কম করি নি। ওর মন ওকে টানচে নিচের দিকে—অধঃপতনের পথে। বাঁধা দেবার সাধ্য কার! এক যদি ভগবান সাহায্য করেন, কৃপা করেন—

কথাটা যতীনের মনঃপুত হোল না। সে বল্লে—ভগবান সাহায্য করলে এই অবস্থায় এসে ও দাঁড়ায় আজ? তিনি চোখ বুজে আছেন।

পুস্প বল্লে—ভুলে যাচ্ছ যতীন দা, ভগবান তাকেই সাহায্য করেন, যে অকপটে সৎ হবার চেষ্টা করচে, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। যেচে তিনি সাহায্য করতে গেলে তাতে কোনো ফল হবে না বলেই তাঁর কাছ থেকে সাহায্য আসে না।

—কেন?

—যে ভগবানকে চেনে না, তাঁকে স্বীকার করে না, তার হোল আচ্ছাদিত চেতন। তার চেয়ে যে ভালো, তাকে বলে সঙ্কুচিত চেতন। এই দুই ধরনের লোককে ভগবৎকথা শোনালে উল্টো উৎপত্তি হয়। আশা বৌদির আচ্ছাদিত চেতন। আলো জ্বাললে কি হবে? ঢাকনির মধ্যে আলো সঁধোবে না। এদের ওপরে মুকুলিত চেতন, তাদের মনে ভগবানের জ্ঞান জাগতে সুরু করেছে। তারও ওপরে বিকচিত চেতন, সবায় ওপরে পূর্ণ বিকচিত চেতন—যেমন বড় বড় ভক্ত কি সাধকেরা। কত নিচে পড়ে আছে আশা বৌদি আর নেতার দল ভাবো!

যতীন কৌতূকের সুরে বল্লে—ও বাবা, তোমার পেটে এত! নবদ্বীপের ভট্টাচার্যদের মত শাস্ত্রের কথা সুরু করলে যে। তোমার কী চেতন পুস্প, বিকচিত না পূর্ণ বিকচিত? আর আমিও বোধহয় আচ্ছাদিত চেতন—না, কি বলো?

পুস্প খিল্ খিল্ করে হেসে বল্লে—আলবৎ। নইলে তুমি কি ভাবো তুমি খুব উন্নতি করেচ?

—না, তাই জেনে নিচ্ছি তোমার কাছে।

—জেনে নিতে হবে কেন, নিজেকে বুঝতে পারচো না, না? কখনো ভগবানকে ডেকেচ? তাঁর দিকে মন দিয়েচ জীবনে? তাঁকে বোঝবার চেষ্টা তো দূরের কথা। আমার কথা বাদ দাও যতীনদা, আমি তুচ্ছদপি তুচ্ছ, কিন্তু বড় বড় বিদ্বান, জ্ঞানী, গুণী লোকের মধ্যেও অনেকে মুকুলিত চেতনও নয়। পূর্ণবিকাচত তো ছেড়ে দাও, বিকচিত চেতনই বা ক'জন?

পৃথিবীতে বা এই লোকে কোথাও জিনিসটা পথে ঘাটে মেলে না। তবে নেই তা নয়, আছে।

—একজন তেমন লোকের কাছে একদিন নিয়ে যাবে ?

—আমার কি সাধিা যতীনদা ? তাঁদের দেখা পাওয়া কঠিন, ধরা দিতে চান না সহজে। আচ্ছা, একজন মানুষকে আমি জানি—যাবে দেখানে ? চলো, একটুখানি দেখিয়ে দিই, দেখানে গিয়ে দেখে চলে আসবে, কোনো কথাবার্তা বোলো না। আশা বৌদিকে ছেড়ে একটু চলো দিকি। পৃথিবীর এ সব আবহাওয়া তোমার পক্ষে যে কত খারাপ তা তুমি বুঝতে পারবে না।

যতীন হেসে বলে—কেন, ম্যালেরিয়া ধরবে ?

—আত্মারও ম্যালেরিয়া আছে। দেহ থেকে মুক্ত হয়েচলে গুণের কোরো না। এমন ম্যালেরিয়া ধরে যাবে মনের আত্মার যে কৈদে কূল পাবে না যতীনদা। তখন ডাক্তার দেখাতে হোলে এই ছাই-ফেলতে-ভাঙা-কুলো পুষ্প হতভাগীকেই দরকার হবে।

পৃথিবী দেখতে দেখতে নিচে মিলিয়ে গিয়েচে ততক্ষণ। সাদা সাদা মেঘ, অনন্ত আকাশ। হৃদয়ের আলোর রং আরও সাদা। 'মানুষের স্থূল চোখ হোলে ধাঁধিয়ে যেতো। যতীন ভাবলে, এই তো রাত দেখে এলাম কলকাতা সহরে, এখানে চোখ-ধাঁধানো হৃদয়ের আলো! জগতে সব ভেল্‌কিবান্ডি, অথচ পৃথিবীতে বসে কিছু বোঝবার জো নেই।

ভুবলোকের বিশাল আলোর সরগী দিক থেকে দিগন্তের বিসর্পিত তাদের সামনে! বহু লোক যাতায়াত করচে, কেউ ধূসর বর্ণের, কেউ লাল মেটে সিঁদুরের রং, কচিং কেউ নীল রঙের। পুষ্পকে যতীন বলে—আগে বেশির ভাগ আত্মাই কিন্তু ছাই রঙের আর লাল রঙের। নীলবর্ণের আত্মা পথে-ঘাটে কত কম।

পুষ্প হেসে বলে—তুমিও ওদের দলে। ভেবো না তুমি নীলবর্ণের দেহধারী আত্মা। অনেক উচু জীব তাঁরা। পথে-ঘাটে তাঁদের কি ভাবে দেখবে ? ও যা দেখেচো, ওরাও তেমন উচু স্বরের নয়। পঞ্চম স্বর্গের লোকের দেহ উজ্জল নীল, দামী নীল রঙের হীরের মত। সে বড় একটা দেখতে পাবে না।

—তারও ওপরে ?

—উজ্জল সাদা। ষষ্ঠ সপ্তম স্বর্গের আত্মারা দেবদেবী, তাঁদের দিকে চাইলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

—তোমার মত ?

হঠাৎ যতীন লক্ষ্য করলে সে এমন এক স্থানে এসে পড়েচে যেখানকার বায়ুমণ্ডলে একটি অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও পবিত্রতা আত্মার চিরযৌবন নির্দেশ করচে যেন। কিশোর স্নগন্ধ সর্বত্র, সেই গন্ধে ভরা বনপথের আবহাওয়া অককারণে শত শত চিরযৌবনা অভিসারিকা যেন চলেচে তাদের পরমপ্রিয়ের মিলন আকাজক্ষায়, কত যুগের কত রাজ্য-সাম্রাজ্যের অতীত কাহিনীর

দুঃখবেদনা যেন এর পরিবেশকে কোমল করুণ করে রেখেচে—মুখে ঠিক বোঝানো যায় না, কিন্তু যতীন যেন হঠাৎ বুঝলে মনে সে অনন্তকালের শাস্ত অধিবাসী, চিরযৌবন, অমর আত্মা—অনাচ্ছত্ত বিশ্বের লীলাসহচর, সে ছোট নয়, পালী নয়, পরমুখাপেক্ষী নয়—ভগবানের চিহ্নিত শিশু, অস্ত্র হতভাগ্য আত্মাকে টেনে তোলবার জন্তে তার জন্মমৃত্যুর আবর্ত-পথে স্থ-দুঃখময় পরিভ্রমণ।

অদূরে একটি সাদা পাথরের মন্দির, মন্দিরের চূড়োটা তার গম্বুজের তুলনায় একটু যেন বেশি লম্বা বলে মনে হোল যতীনের। কিন্তু আশ্চর্য্য রকমের দুঃখ-ধবল কী পাথরের তৈরী, না মার্বেল, না এলাবেস্টাস, যেন স্বয়ংপ্রভ পালিশ করা স্ফটিক প্রস্তরে ওর বিমান ও জজ্বা গাঁথা।

পুষ্প বজ্জে—খুব বড় একজন ভক্ত সাধকের আশ্রমে তোমায় এনেচি।

মন্দিরের চারিপাশে খুব বড় বাগান। প্রায় সবই ফুলের গাছ, কিন্তু অত সুন্দর ও সুগন্ধি ফুল এ পর্য্যন্ত যতীনের চোখে পড়ে নি। খুব বড় উজ্জানশিল্পীর রচনার পরিচয় সেখানকার প্রতিটি ফুলগাছের সারিতে, লতাবিতানের সমাবেশে। যতীন ভাবলে—এ সুরেও বাগান থাকে? এসব করে কে? কে গাছ পোতে না জানি! পৃথিবীর মত কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে হয় নাকি?

পুষ্প একটি নিভৃত লতাবিতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল যতীনকে সঙ্গে করে।

ভেতর থেকে কে বজ্জে—এসো মা, তোমায় অপেক্ষা করচি—

পুষ্প ও যতীন দুজনে লতাকুঞ্জের মধ্যে ঢুকে দেখলে একজন জ্যোতির্ষদেহ সুশ্রী বুদ্ধ পাথরের বেদীতে বসে। দুজনে পাদম্পর্শ করে প্রণাম করলে।

ভূর ভূর করচে চন্দন ও ফুলের সুবাস লতাবিতানে, অথচ শৌখীন বিলাসলালসার কথা মনে হয় না সে স্নগন্ধে, মনে জাগে অতীতকালের ভক্তদের প্রেমোচ্ছল অমুভূতি, মনে জাগে ভগবানের নৈকট্য, শান্ত পবিত্রতার আনন্দময় মর্ম্মকেদ্র। দিগন্তে বিলীন প্রেমভক্তির মধুর বেগুণব কান পেতে শোনো এখানে বসে বসে, শুনে নবজন্ম লাভ করো।

বুদ্ধ বজ্জেন—আগে গোপাল দর্শন করে এসো—

মন্দিরের কাছে গিয়ে ওরা দেখলে নীল রঙের পাথরের অতি সুশ্রী একটি গোপালমূর্তি, যেন হাসচে—এত জীবন্ত। নানা রঙের ফুল দিয়ে বিগ্রহের পাদপীঠ সাজানো, গলায় বনফুলের মালা। পুষ্প করজোড়ে কতকণ ভাবে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—যতীন ভক্ত টক্ট নয়, সে একটু অধীর ভাবেই পুষ্পের ভাব ভাঙবার প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

যতীন অবশেষে পুষ্পকে বজ্জে—ইনি কে?

—ইনি কে আমি জানিনে। সেকালের একজন বড় বৈষ্ণব আচার্য্য—পৃথিবীতে নাকি এখনও ঐর আবির্ভাবের তিরোভাবে উৎসব হয়। বহুদিন পৃথিবী ছেড়ে এসেচেন।

বৈষ্ণব সাধু জিজ্ঞেস করলেন—বিগ্রহদর্শন করলে?

যতীন বজ্জে—দেখিচি, অতি চমৎকার। প্রভু, আপনি কতদিন পৃথিবী থেকে এসেচেন?

বি. র. ৮—৬

—অনেককাল। এখানে ওসব হিসেব রাখবার মন হয় নি, কি হবেই বা পৃথিবীর হিসেব রেখে ?

যতীনের মনে অনেক সংশয় উকি মারছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে—প্রভু, এখানেও বিগ্রহ ?

—কেন বল তো ? কি আপত্তি তোমার ?

—এ তো স্বর্গ। ভগবানের সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যাবে। কাঠ পাথরের মূর্তি পৃথিবীতে দরকার হতে পারে, এখানে কেন ?

বৈষ্ণব ভক্তটি হেসে বললেন—ভগবানের সাক্ষাৎ তুমি যেভাবে বলচো ওভাবে পাওয়া যায় কিনা জানিনে। আমি পৃথিবীতে এই বিগ্রহের পূজারী ছিলাম, বড় ভালবাসি ওকে, ছেড়ে থাকতে পারিনে—তাই এখানে এসে এই মন্দির স্থাপন করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছি, ঠুঁই সেবা-আরাধনার দিন কাটে বড় আনন্দে। মন্দির আর বাগান সবই মানসী কল্পনায় সৃষ্টি করেছি, এ স্বর্গে তা করা যায় তা নিশ্চয়ই জানো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা এর নিচের স্বর্গেও দেখেছি।

—আমার দেবতা শুধু পাথরের নয়, জীবন্তও বটে। কিন্তু তোমাকে তো দেখাতে পারবো না। আমার মা দেখতে পারেন। দেখেচেনও একবার।

পুষ্প আবদারের সুরে বললে—আপনি দয়া করলে ইনিও দেখতে পারেন, বাবা।

সাধু হেসে বললেন—ইনি দেখতে পারেন না। ইনি ভাবেন, ভগবানকে নিয়ে আমি এভাবে পুতুলখেলা করছি। বালগোপাল বড় লাজুক ঐরামনে বার হবেন না। যে তাঁকে মন অর্পণ করে ভাল না বেসেচে, বিশ্বাস না করেছে—তিনি যেচে অপমান কুড়ুতে যাবেন সেখানে ? ভগবান যখন ইষ্টদেবের বেশে লীলা করেন কৃষ্ণ সেজে, কালী সেজে—তখন তিনি মাছুষের বা দেবদেবীদের মনোভাব—যেমন রাগ, লজ্জা, মান অভিমান, এমন কি ভয় পর্যন্ত পান ? এই তো লীলা—এরই নাম লীলা। বিরাট ঐশী শক্তি যা বিশ্বচরাচর নিয়ন্ত্রণ করচে, তাকে কে ভালবাসতে পারে আপনার ভেবে ? শত শত নক্ষত্র, শত শত সূর্য্য যার ইচ্ছিতে লয় হয়, যে পলকে সৃষ্টি, পলকে স্থিতি, পলকে প্রলয় করতে পারে—তাকে কে ভক্তি করতে পারে, যদি তিনি—

মন্দির থেকে চঞ্চল, মধুর, সজীব কণ্ঠে কে বলে উঠলো—ওখানে বসে বক্বক না করে এখানে এসে আমায় একবার জল খাইয়ে যাও না বাপু ? তেঁটায় মলুম—

সাধু চমকে উঠলেন, পুষ্প ও যতীন চমকে উঠলো।

পুষ্প হেসে বললে—যান, যান, জল খাইয়ে আনুন—

যতীন অবাক হয়ে বললে—কে ছেলেটি ?

সাধু যতীনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—বুঝতে পারলে না ? ঐ তো বালগোপাল। তোমার খুব ভাগ্য তোমাকে গলার স্বর শুনিতে দিলেন। আমার পুষ্প মায়ের ভাগ্য। যাই আমি—

সাধুর মুখে স্নেহ বাৎসল্যের রেখা ফুটে উঠলো, তৃষ্ণার্ত সন্তানকে পানীয় জল দেবার ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি মন্দিরের দিকে অদৃশ হোলেন।

যতীন ভাবলে, এও পুতুলখেলা; নয় আবার!

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলে। সাধু অস্ত্রযামী, সবার মনের কথা বুঝতে পারেন, অন্তত তার তো মনের অঙ্গিসন্ধি খুঁজে বার করেছেন। এখানে কিছু ভাবা হবে না।

পুষ্প হঠাৎ বলে উঠলো—মনে পড়েচে, ইনি বৈষ্ণব আচার্য্য রঘুনাথ দাস।

বেলা পড়ে যেন অপরাহ্ন হয়ে এসেচে। অপূর্ণ পুষ্প-সুবাসে আশ্রম আমোদিত। বৈষ্ণব সাধু বলেন—বিকেল বড় ভাল লাগে, তাই সৃষ্টি করি। নইলে এখানে আর সকাল বিকেল কি? সূর্য্য নেই, চন্দ্র নেই, অন্ধকারও নেই। হ্যাঁ, কি সংশয় তোমার, যতীন? এখনও যায়নি, অন্ধকার বড় একগুঁয়ে। তাড়ানো যায় না।

—প্রভু কি করি বলুন। আপনি বৈষ্ণব আচার্য্য, কতদিনের লোক আপনি?

—মহাপ্রভুর সমসাময়িক। সপ্তগ্রামের নাম শুনেছিলে? সেই সপ্তগ্রামে বাড়ী ছিল আমার।

—আপনি এখানে কেন? আর সব কোথায় আপনার দলের? সাড়ে তিনশো বছর ধরে এ পুতুলখেলা নিয়ে—

—তোমার মন এখনও কাঁচা। আমি তোমাকে তো বলেচি, মুক্তি চাইনি। সপ্তগ্রামে হরিদাস শিক্ষা দিয়েছিল ভক্ত চার ভগবানের প্রতি ভক্তি, তাঁর প্রতি যেন মন থাকে। আমাদের তাতেই আনন্দ। তাঁর ভজন আরাধনা নিয়েই আছি। খুব স্নেহে আছি। মহাপ্রভু ভগবানে মিলিয়ে গিয়েছেন, তিনি নারায়ণের অংশ, মাঝে মাঝে আমাদের আহ্বানে প্রকট হন, এই আশ্রমে আসেন। তাঁর পৃথিবী থেকে এখানে আসার দিনে আশ্রমে উৎসব হয়, সে উপলক্ষে বড়বড় বৈষ্ণব আচার্য্য এমন কি জীবগোস্বামী মীরাবাই পর্য্যন্ত আসেন। ওঁরা আরও উচ্চ লোকে আছেন। অনেকে জীবকে শিক্ষা দিতে ছু একবার ইতিমধ্যে পৃথিবীতে নেমেছিলেনও।

—আর একটা কথা আপনাকে—

—বুঝেছি। তুমি যা জিজ্ঞেস করবে তার মুখে উত্তর চাও, না সে জগৎ দেখতে চাও? অর্থাৎ তুমি জানতে চাইচ, পৃথিবী ছাড়া অন্য জীবলোক আছে কি না—কেমন তো? বহু বহু আছে। বিশ্বের অবিদেবতার ভাণ্ডার অনন্ত। কোনো কোনো জগৎ পৃথিবী থেকেও তরুণ, সজীব। সেখানে সব মানুষ অত্যন্ত বেশি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে মরে যায়। আবার বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত জগৎ আছে—সেখানে মানুষ পৃথিবীর চেয়ে অনেক দীর্ঘজীবী, ধীরেন্দ্ৰে জীবনের কাজ করে। পৃথিবীর হিসেবে যার বয়স পঁচিশ বছর, সেও বালক। ষাট বছর যার বয়স, সে নব্যযুবক। যাদের উন্নতি হতে দেরি হবে জানা যাচ্ছে পৃথিবীতে, এমন সব আত্মাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না, দিলে সে পূর্ণ

জন্মের জীবদেবেরই পুনরাবৃত্তি করবে মাত্র। সুতরাং তাদের এই সব ধীর সানন্দ প্রৌঢ় পৃথিবীতে পাঠানো হয়। অনেকদিন সময় পায় বলে শেখবার ও শোধরাবার অবকাশ ও সুযোগ পায়। বিশ্বের দেবতার এমন আইন, সকলকেই অনন্ত মঙ্গলের পথে যেতে হবে—যে সহজে না যাবে, তাকে দুঃখ দিয়ে পীড়ন করে চোখ কোটাবেনই। সেসব পৃথিবীতেও জীবশিক্ষার জন্তে উচ্চ-স্তরের আত্মারা নেমে যান দেহ গ্রহণ করে। পৃথিবী থেকেও বেশি কষ্ট পেতে হয় তাঁদের সে সবখানে। কিন্তু ভগবানের কাজ ষাঁরা করেন, তাঁরা জানেন, হৃদিনের দেহ, হৃদিনের কষ্ট, হৃদিনের অপমান। শাস্ত-আত্মার কোনো বিকার স্পর্শ করে না, তার জরা নেই, মৃত্যু নেই।

যতীন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল মহাপুরুষের কথা, এর মধ্যে অবিশ্বাস এনে লাভ নেই। আজ তার অত্যন্ত হৃদিন, এমন একজন লোকের দর্শনলাভ করেছে সে।

বৈষ্ণব সাধু আবৃত্তি করচেন—

মুকং করোতি বাচালং পঙ্কুং লজ্জয়তে গিরিং

যংকুপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।

যতীনের দিকে চেয়ে বলেন—তোমাকে যা কিছু বলেছি, সব তাঁর কুপা। শ্রীধর স্বামীর ঐ শ্লোক তো শুনলে? তিনিই, মুক যে, তাকে করেন বাচাল। গোপালের এমনি কুপা, এমনি শক্তি। তাঁর বিশ্ব, তিনি যা কিছু করতে পারেন।

যতীন বলে—এ ভাবে কত কাল থাকবেন আর?

—অনন্ত কাল থাকতে পারি, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়।

হঠাৎ তিনি উৎকর্ষ হয়ে বলেন—বৃন্দাবনে গোবিন্দ বিগ্রহের আরতি হচ্ছে, চলো দেখে আসি—

পুষ্প খুশি হয়ে বলে—আমাদের নিয়ে যাবেন! আপনাদের বড় কুপা—

বৈষ্ণব সাধুর জ্যোতির্ময় ঈষৎ নীলাভ দেহ ব্যোমপথে ওদের আগে আগে উড়ে চলেচে, ওরা তাঁর পেছনে পেছনে চলেচে। নভচারী দু একটি আরও অল্প আত্মাকে ওরা পরে দেখতে পেল। যতীন কখনো বৃন্দাবন দেখেনি, তাই বৈষ্ণব সাধু ওকে চার পাঁচটি বড় বড় গাছের ক্ষুদ্র বাগান দেখিয়ে বলেন—ওই দেখ চীরঘাট, ওখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য স্নান করে উঠে গোপালের দেখা পেয়েছিলেন। বড় পুণ্যস্থান, প্রণাম করো।

তার পরেই একটা বড় মন্দিরের গর্ভগৃহে সেকালের বুলোনা প্রদীপের আলোয় একটু সুন্দর বিগ্রহের সামনে ওরা গিয়ে দাঁড়ালে। অনেক লোক আরতিদর্শন করচে। একটা আশ্চর্য্য দৃশ্য যতীন এখানে প্রত্যক্ষ করে স্বর্গ-মর্ত্যের অপূর্ব সন্ধ্যা দেখে অবাক হয়ে গেল। দেহধারী দর্শকদের মধ্যে বহু অশরীরী দর্শক এসে দাঁড়িয়ে বিগ্রহের আরতি দর্শন করছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকটি আত্মার দিব্য জ্যোতির্ময় দেহ দেখে যতীন বুঝলে ওরা উচ্চ শ্রেণীর ভক্ত সাধক।

যতীনের সঙ্গে বৈষ্ণব সাধু একজনকে দেখিয়ে বলেন—কবি কেমদাস। উনি বৃন্দাবনের

বড় ভক্ত, এর মন্দির, এর কুঞ্জবন ছেড়ে থাকতে পারেন না।

যতীন বলে—একটা কথা শুনেছিলাম, আত্মিক লোক থেকে বায় বার এলে নাকি আত্মার অনিষ্ট হয় ?

সাধু বলেন—এসো, কবিকে প্রশ্নটা করি।

সাধু ও ক্ষেমদাস পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। সাধুর প্রশ্ন শুনে কবি ক্ষেমদাস হেসে বলেন—শ্রীকৃষ্ণগোষ্ঠামীর উজ্জল নীলমণিতে গোপীদের বিরহের দশদশার বর্ণনা আছে— চিন্তা, উত্তোষ, প্রলাপ এমন কি মৃত্যুদশা, উন্মাদ রোগ পর্যন্ত। আমার এমন এক সময় ছিল বৃন্দাবনের যমুনা তট না দেখলে প্রায় তেমনি অবস্থা-প্রাপ্তি ঘটতো। বৃন্দাবনের মত স্থানে এলে অনিষ্ট হয় না, কৃষ্ণে আসক্তি তো আত্মার ইষ্টই করে, উর্দ্ধলোকে নিয়ে যায়।

বৈষ্ণব সাধু বলেন—কৃষ্ণে আসক্তি কৃষ্ণপদে মতি এনে দেয়। হরিদাস স্বামী কি বলেছিলেন সপ্তগ্রামে মনে নেই ?

ক্ষেমদাস বলেন—শুনেছি বটে। তবে মনে রাখবেন, আমি কবি ছিলাম, ভক্ত ছিলাম না আপনাদের মত। আপনারা ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বক, আপনাদের মত ভাগ্য আমি করি নি। আমার কৃষ্ণ বিশ্বের বনে বাঁশি বাজিয়ে বেড়ান, বালকস্বভাব—উদাস ; কেউ যদি ডাকে তাঁর কাছে যান, না ডাকলে আপন মনেই একা একা থাকেন। অনাদিকাল থেকে এমনি। তাঁকে যদি ভালবেসে কেউ ডাকে, তবে তিনি সঙ্গী পেয়ে খুশি হন—তিনি করুণ-স্বভাব, ভালবাসার বশ।

পুষ্প বলে—কেন একা থাকেন ? রাধা কোথায় ?

—ও সব কল্পনা। এই সব ভক্তপ্রভুরা বানিয়েছেন। কে রাধা ? যে নারী ভালবাসে তাঁকে, সেই রাধা। সেই তাঁর নিত্যলীলার সহচরী। মীরাবাঈ যেমন।

—মীরাবাঈ আছেন ?

—আছেন। তাঁরা নিত্যলীলার সহচরী ভগবানের—যাবেন কোথায় ? বহু পুণ্যে তাঁদের দর্শন মেলে। বহু উর্দ্ধ লোকে তাঁদের অবস্থিতি। আবার বিশ্ব ব্যোপে তাঁদের অবস্থান, তাও বলতে পারো। পৃথিবীর ব্যক্তিত্ব তাঁর নষ্ট হয়ে গিয়েচে বহুকাল, ও তো স্থূল দেহ ধরে লীলা করবার জন্তে যাওয়া। ওটা কিছু নয়। পৃথিবীর সেই মীরাবাঈকে কোথাও পাবে না। আছেন খাটি তিনি—অর্থাৎ যে শুদ্ধ, বুদ্ধ, চৈতন্তস্বরূপ আত্মা মীরাবাঈ সেজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন হৃদিনের জন্তে, তিনি আছেন।

যতীন বলে উঠলো—তাই আপনার মত একজন কবি বলেচেন—All the world's a stage, and the men and women merely players—অর্থাৎ—

ক্ষেমদাস মুহূ হেসে বলেন—বুঝেছি। গভীর সত্যবাদী। নানাদিক থেকে সত্য—নানাভাবে।

যতীন একটু বিশ্বয়ের সুরে বলে—আপনি কি ইংরিজি জানেন ?

—ভাষার সাহায্যে বুঝিনি, তোমার মনের চিন্তা থেকে ও উজ্জ্বল অর্থ বুঝেছি। ওঁর সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছে। পঞ্চম স্তরে কবি-সম্মেলন হয়, সেখানে পৃথিবীর সব দেশের বড় বড় কবি আসেন—

যতীন ব্যাকুল আগ্রহের সুরে বলে, আপনি কালিদাসকে দেখেছেন? ভবভূতি?

—সে সৌভাগ্য আমার হয়েছে। পৃথিবীর সে কালিদাস নয়—যে নিত্য মুক্ত কবি-আত্মা কালিদাসরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই আত্মার সঙ্গে আমার পরিচয়। একবার নয়, অনেকবার নানা দেশে নানা প্রাকৃত দেহ ধারণ করে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি অপ্রাকৃত দেহধারী চিদানন্দময় আত্মা; আজ নাম কালিদাস, কাল নাম চণ্ডীদাস, পরে ক্ষেমদাস—তাতে কি?

—কবি-সম্মেলন হয় কোন্ সময়?

ক্ষেমদাস জিজ্ঞেস করলেন—তুমি বুঝি নতুন এসেচ পৃথিবী থেকে? তোমার কথাতে মনে হচ্ছে। এখানে সময়ের কি মাপ? কালোহরং নিরবধিঃ—অনন্তকাল বায়ুর মত শন শন বইছে। বিদগ্ধমাধবে শ্রীকৃপগোষ্ঠায়ী বলেছেন তাই—অনপিতচরীঃ চিরায়ৎ—কৃপ-গোষ্ঠায়ীও কবি, তিনিও আসেন। আর তুমি জানো না, যাঁর সঙ্গে এসেচ এই আচাৰ্য্য রঘুনাথ দাসও কবি? এঁর রচিত ‘চৈতন্যস্বকল্পবৃক্ষ’ কি পড়ে থাকবে? বলে মনে হচ্ছে না। শোনো তবে—

কচিমিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতশ্রোতুবিরহাৎ

শ্রথাৎ শ্রীসন্ধিদাদধতি দৈর্ঘ্যং ভূজপদোঃ।

কেমন ছন্দ? কেমন লাগচে ওঁর শ্লোক?

যতীন বিষমমুখে বলে—আজ্ঞে বেশ!

বৃন্দাবনের গোবিন্দ-মন্দিরের আরতি বহুক্ষণ থেমে গিয়েছে। পাশের রাজপথ দিয়ে দু একখানা গাড়ী যাতায়াত করছে, মন্দিরের বড় বড় দরজায় আলো জ্বলচে, কোথা থেকে উগ্র বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসচে বাতাসে, মন্দিরের সামনে একটা হিন্দুস্থানী টাঙ্কাওয়ালা যাত্রীর সঙ্গে ভাড়া নিয়ে কি বকাবেকি করছে। যতীন ভাবলে, স্বর্গ-মর্তের কি অভূত সম্বন্ধ! অথচ বেঁচে থাকতে পৃথিবীর লোকে কেউ এরহস্য জানে না। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়, এত বড় জীবনের খবর যদি কেউ রাখতো, প্রেম-ভক্তির এ সম্পর্ক যদি রাখতে জানতো ভগবানের সঙ্গে—তবে কি তুচ্ছ বিষয়-আশয়, টাকা-কড়ি, জমিদারী নিয়ে ব্যস্ত থাকে? এই মাত্র যে লোকটা সামনের রাস্তা দিয়ে মোটর চড়ে গেল ও হয়তো একজন মাড়োয়ারী মহাজন, সারাজীবন ব্যাঙ্কে টাকা মজুত করে এসেচে—জীবনের অন্ত কোনো অর্থ ওর জানা নেই, কেবল তেজীমন্দী, লাভ-লোকসান এই বুঝেছে। জয়পুর শহরে হয়তো ওর সাততলা অট্টালিকা। কিন্তু হয়তো ছেলে-গুলো অবাধ্য বেঙ্গাসক্ত, স্ত্রী কুচরিত্রা। মনে সুখ নেই—অথচ ও কি জানে, এই পাশেই মদনমোহনের মন্দিরে এই গভীর রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন লোকের কবি সাধুরা আজ সমবেত হয়েছেন, সেখানে পুষ্পের মত নারীর স্নেহ, কত শতাব্দীর পথ থেকে ভেসে আগা অমর মহাপুরুষদের

বাণী, বকুলপুষ্পের সুবাস, ভগবানে অর্পিত মধুর প্রেমভক্তির পরিবেশ—এইখানেই স্বর্গ-মর্ত্যের বিশাল ব্যবধান রচনা করেছে। হায় অন্ধ পৃথিবীর মানুষ!

১৫

পৃথিবীর হিসেবে দীর্ঘ দু বছর কেটে গেল।

সেদিন পুষ্প ও যতীন বসে কথা বলতে বুড়োশিবতলার ঘাটে, এমন সময় পুষ্প হঠাৎ চীৎকার করে বলে—এই! থামো—থামো—খবরদার—

পরক্ষণেই সে ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন মুখে বহুদূর আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলে—যতীনদা, যতীনদা—

যতীন বিস্মিত সুরে বলে—কি হোল? পুষ্প বলে—কিছু না। যতীন নাছোড়বান্দা, সে বার বার বলতে লাগলো—কি হোল বল না পুষ্প? বলবে না?

অবশেষে পুষ্প বলে—আশা-বোদিকে খুন করতে যাচ্ছে তার সেই উপপতি নেতা—

—সে কি!

—ঐ যে, দেখতে পাচ্চ না?

যতীন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে—চলো চলো ছুটে যাই, সামলাই গিয়ে—আমি তো কোনো দিকে কিছু দেখছি নে—ওঠো।

বিস্মিত যতীন পুষ্পের দিকে চেয়ে দেখলে যে তার যাবার কোন ব্যস্ততা নেই। সে চুপ করে বসেই রইল, কিছুক্ষণ পরে পুষ্পের বিশাল আয়ত চোখ দুটি বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

যতীন বলে—কি হয়েছে, চলো চলো—

—গিয়ে কি হবে। এ যাত্রা রক্ষা হোল গিয়ে—

—বৈচে গিয়েচে?

—আপাতত বটে। আহা, কি দুঃখ আশা-বোদির!

—আমি সেখানে যাবো পুষ্প। চলো দেখা যাক—

—না।

—তোমার ওই সব কথা আমার ভাল লাগে না পুষ্প, সত্যি বলছি। আমি আলবৎ যাবো সেখানে। আমার মন কেমন হচ্ছে বল তো?

—সেজ্ঞেই তোমার আরও যাওয়া উচিত নয়। দেখে কষ্ট পাবে খুব।

—চলো পুষ্প, তোমার পায়ে পড়ি, আচ্ছা তুমি বোঝো সব, অথচ মাঝে মাঝে—

অগত্যা পুষ্প ওকে নিয়ে কলকাতায় আশার বাসায় এসে উপস্থিত হোল। তখন যতীন বুঝতে পারলে কেন পুষ্প এখানে তাকে আনতে চায় নি। নেতা আজকাল মদ খায়, মাতাল অবস্থায় এসে দিন-দুপুরে সে আশাকে এমন মার দিয়েচে যে, সে ঘরের মেঝেতে পড়ে ভয়ানক

চোখে দুর্দান্ত মাতালটার দিকে চেয়ে আছে। দরজার চৌকাঠের এপারে একখানা নেপালী কুকুর পড়ে, সম্ভবত নেতার হাত থেকে ঠিকরে পড়ে থাকবে। ওদের দোরের বাইরে আশপাশের ঘরের ভাড়াটেরা জড়ো হয়ে উকি মেরে মজা দেখচে। নেতা মত্ত অবস্থায় টলচে ও হাত নেড়ে নেড়ে জোর গলায় আশ্বালন করচে—ওকে আমি আজ খুন করে ফেলবো—আচ্ছা পাল মশায়, আপনি বিচার করুন, ওকে কে খেতে দিচ্ছে, পরতে দিচ্ছে? ও দেশে না খেয়ে মরছিল কিনা ওকে জিজ্ঞেস করুন না? আমি মশাই হুক কথা হুক কাজ বড় ভালবাসি। আমি আনলাম ওকে এখানে, খাওয়াই পরাই, অথচ সেই শমু ব্যাটা এসে তলায় তলায় ফুটি মারে। কত দিন পই পই করে বারণ করিচি—করি নি? তেমন পুরুষ বাপে নেতানারায়ণের জন্ম দেয় নি—আজ তাকে খুন করে ফাঁসি যাবো, সেও খোড়াই কেয়ার করে এই শর্খা। এত বড় তোর বদমাইসি! কম করেচি আমি তোর জন্তে? তোর নিজের বিয়ে করা ভাতার কোনো দিন তাকে খেতে দেয়নি আর আমি কিনা...দিয়েচে কোনো দিন সেই যতীন?

এই সময় আশা আধ-বসা অবস্থায় উঠে বাঁঝের সঙ্গে বলে—খবরদার! তিনি স্বগ্গে গিয়েচেন, তার নামে কিছু বোলো না—

নেতা বিজ়পের মূরে বলে—ওরে আমার স্বামী-সোহাগী সতী রে! মারে মুখে বাঁটা, বলতে লজ্জাও করে না? আমি বলচি, নু তুই বলতিসু সেই যতনেটা বেঁচে থাকতে? আবার স্বামী-সোহাগ দেখাতে এসেচেন, মরণ নেই? ভারি স্বামী ছিল মুরোদেঁর, সব জানি, বিয়ে করে একখানা কাপড় কিনে দেবার, এক মুঠো অন্ন দেবার ক্ষমতা হয় নি—

আশা আবার উঠে বলে—আবার ওই কথা! তিনি মরে স্বগ্গে গিয়েচেন, তার নামে কেন বলবে তুমি?

নেতা হঠাৎ ভেড়ে এসে আশার কাঁধে এক লাথি মেরে বলে—স্বামীর সোহাগ উথলে উঠলো বদমায়েশ মাগীর, যে বেরিয়ে এসেচে তার মুখে আবার—গলায় দড়ি দিগে যা—

আশার চেহারা আগের চেয়ে খুব খারাপ হয়ে গিয়েচে, গায়ের রঙেরও আগের মত জলুস নেই, লাথি খেয়ে সে কিস্তি এবার ঠেলে উঠলো। বলে—তাই দেবো, গলায় দড়ি দিয়ে তোমার পুলিশের হাতে যদি তুলে না দিই—

—চুপ—পুলিশ তোর বাবা হয়!

—আবার মুখে ওই সব কথা?

এই বার একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক এগিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। বলে—এসব আপনাদের কি কাণ্ড? আপনারা না ভদ্র লোক? আশপাশের বাড়ীতে গেরস্তর বি-বউ সব রয়েছে, এখানে মদ খেয়ে চেঁচামেচি চপবে না। হ্যাংগামা করতে হয়, ছাকরা করতে হয়, সরকারী রাস্তা পড়ে রয়েছে। আমার বাড়ী ওসব করলে পুলিশে খবর দিতে হবে—

পালমশায় এবার বোধ হয় সাহস পেয়ে এগিয়ে এসে বলেন—আমিও তাই বদ,। বলি এখানে ওসব কোরোনি—তা মাতালের সামনে এগোতে কি সাহস হয়!

শ্রৌতা স্ত্রীলোকটি আশাকে ধরে ঘরের বাইরে আনতে আনতে বলে—যাতালের নামনে তুকে কো কতে আছে, ছি: মা—দেখচো না গুর এখন কি ঘটে জ্ঞান আছে? এসো আমার ঘরে—

আশা চলে যায় দেখে নেতা জড়িত কর্তে বাজখাই আওয়াজে বলে—এই, কোথাও যাবিনি বলে দিচ্ছি—হাড় ভাঙবো ঘেরে—থবরদার! এই! আমি এখন চা আর ডিম ভাজা খাবো—করে না দিয়ে যদি নড়বি—নিয়ে যেও না মাসী—

শ্রৌতা স্ত্রীলোকটি যেতে যেতেই বলে—আচ্ছা, চা করে ডিম ভেজে আমার ঘর থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বাবা—আপনি একটু শান্ত হয়ে শুয়ে থাকুন—

পালমশায় উপস্থিত লোকজনদের দিকে চেয়ে বলে—চলো সব চলো, কি দেখতে এসেচে সব? ছুটো হাত পা বেয়িরেচে কারো, না ঠাকুর উঠেচে? বরু তখন শুখানে যেওনি, যে যার ঘরে যা খুশি করুক না, তোমার কি? আশুক দিকি আমার নিজের ঘরে। দেখি কত বড় কে বাপের ব্যাটা!

শেষের কথা ক'টি পৌরুষগর্বে উচ্চারণ করবার সময় তিনি নেতানারায়ণদের ঘর থেকে বেশ একটু দূরে বারান্দার প্রায় ওপাশে চলে গিয়েচেন যদিও, তবুও চলতে চলতে একবার পেছন কিরে দেখে নিলেন, দুর্দান্ত যাতালটা তাঁর কথা শুনলো কিনা।

যতীন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—এতদূর নেমেচে গুর অবস্থা! এ আমি ভাবিনি—

পুষ্প বলে—ভাবা উচিত ছিল, এ সব জিনিসের এই কিন্তু পরিণাম—এখান থেকে চলো যাই—

যতীন চুপ করে বসে ছিল, আশার দুর্দশা তার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। সে দুঃখিত ভাবে বলে—তুমি কেবলই এসে চলে যেতে চাও, কিন্তু আমি কোথায় গিয়ে শান্তি পাবো পুষ্প? আমার কর্তব্য পালন করিনি বলেই আজ গুর এই দুর্দশা। আমি যদি স্বামীর কর্তব্য পালন করতাম, যদি আশার জন্তে তেমন টাকাকড়ি রেখে যেতে পারতাম, তাহলে—

—তোমার ভুল এখনো গেল না।

—কেন, ঠিক কথা বলচি কি না? ভুলটা কোথায়?

পুষ্প মুহূর্তে হেসে গুর পাশে এসে বলে—তোমাকে এত ভাল ভাল জায়গায় নিয়ে গেলাম, তোমার বুদ্ধিটা যেমন খুল তেমনই রইল—

—কেন?

—আশা বৌদি নিজের কর্ম-কলে এখনও অনেকদিন এই রকম ভুগবে। তুমি গুর কর্মের বন্ধন কাটাতে পারো সাধি কি? টাকা রেখে যেতে, টাকা সুদু চলে যেতো। বড় লোকের ছেলেদের তো অনেক টাকা দিয়ে বাপ মা মরে যায়—তারা উজ্জ্বল যায় কেন?

—আমি এখানে থাকবো পুষ্প। ওকে কেলে যেতে পারবো না এ ভাবে—

—তুমি কেন, দরকার হোলে আমিও থাকবো। এখানে থাকতে আমার রীতিমত কষ্ট

হয়—তবুও আমি তোমার জন্তে, যদি আশা বৌদির এতটুকুও উপকার করতে পারতাম তবে এখানে থাকতে কিছু আপত্তি করতাম না। কিন্তু তুমি এখনও অনেক জিনিস বোঝো নি। এসব নিফল চেষ্টা। করুণাদেবীর মুখে শুনেচি করুণার পাত্র মেলানো বড় দুর্ঘট। নয়তো করুণাদেবীর মত শক্তিশালিনী দেবী আশা বৌদিকে এখান থেকে উদ্ধার করতে পারেন না? এফুনি পারেন—কিন্তু তাঁরা জানেন, তা হয় না। জীব নিজের চেষ্টায় উন্নতি করবে, বাশ দিয়ে ঠেলে উচু করে দিলে জীব উন্নতি করে না। নয়তো ভগবান এক পলকে সব পাপী উদ্ধার করতে পারতেন। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে কাজ করতে হয়। সে তুমি আমি বুঝিনে, কিন্তু করুণাদেবী, প্রেমদেবীর মত দেবদেবীরা অনেকখানি বোঝেন—তাই তাঁরা অপাত্রে—

—আমি না বুঝতে পারি, কিন্তু তুমি ঠিক বোঝো। তোমার দেখবার ক্ষমতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। তবুও তোমার সঙ্গে এখানে ওখানে গিয়ে আমার অনেক উন্নতি হয়েছে আগেকার চেয়ে—এখন বুঝিয়ে বুলে বুঝি। তোমার সেই সন্ন্যাসীর মতে এখন বোধ হয় আমার মুকুলিত চেতন—নয়তো বুঝিয়ে বুলেও বুঝতাম না, মনে সংশয় জাগতো, অবিশ্বাস জন্মাতো, তা হোলে সে সব তত্ত্ব আমার কোনো কাজে লাগতো না।

এই সময় নেতানারাণ ডাকতে লাগলো চৈচিয়ে—ও আশা, শোনো এদিকে—এই আশা—

প্রোট বাড়ীওয়ালী বারান্দার বার হয়ে বুলে—একটু চা খাচ্ছে, আপনাকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি তৈরী হোলে। আশা এখন যেতে পারবে না।

নেতা গরম মেজাজে বুলে—কেন যেতে পারবে না—শুনতে পাই কি? ও আমার মেয়েমানুষ, আমি যখন ডাকবো, আলবাৎ আসবে—ওর বাবা আসবে—

এই কথাটা যতীনের বুকে যেন গরম শ্লের মত বিধলো। আশা তার স্ত্রী, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে যার সঙ্গে সে পরিণয়হৃত্রে আবদ্ধ হয়েছে—সেই আশা অপরের ‘মেয়েমানুষ’? নেতার হুকুমে তাকে চলতে হবে? যতীনের মাথা যেন ঘুরে উঠলো। এক মুহূর্তে সমস্ত দুনিয়া বিস্বাদ, মিথো, জ্বালো হয়ে দাঁড়ালো—মস্ত একটা ফাঁকি, মস্ত একটা ধাপ্পাবাজির মধ্যে পড়ে পিয়েচে সে। পুষ্প-টুপ্প, সন্নি-টন্নি সব এই মস্ত জুরোচুরির অন্তর্গত ব্যাপার। নইলে অরিসাক্ষী করে, হোম করে, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে থাকে সে সহধর্মিণী করেছিল—

কিংবা এই হয়তো নরক!

সে হয়তো নরক ভোগ করচে—স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করেনি, জোর করে তাকে শব্দরবাড়ী থেকে এনে কাছে রেখে সংশোধনের চেষ্টা করে নি, ক্রীকের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিল, সেও তমোগুণ। তার জন্তেই এই দারুণ নরক তাকে স্বচক্ষে দেখতে হচ্ছে, কে যেন টেনে নিয়ে আসচে এখানে, এই শোচনীয় দৃশ্য দেখতে কে যেন তাকে বাধ্য করচে, নিয়তির মত নিহর সে আকর্ষণ, রেহাই দেবে না তাকে।

পুষ্প বুলে—চলো যতীনদা, আর এখানে থেকে কষ্ট পেয়ো না—

যতীন হৃৎখমিশ্রিত হতাশার সুরে বুলে—তুমি অতি করুণাময়ী। তুমি জানো যে এ

আমার কর্মকলের ভোগ, এ নরক। তুমি দয়া করে তাই কেবল এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইচ, আমি সব বুঝতে পেরেচি এবার। কিন্তু পুষ্প দয়াময়ী, আমার সাধ্য কি, আমি যাই? চুষক যেমন লোহাকে টানে, আশার ভাগ্য ও আমার কর্মফল পরস্পরকে তেমনি টানচে। টেনে আনচে কোথার তোমাদের সেই তৃতীয় স্তর থেকে—আমার সে টানে আসতেই হবে এবং আমি কোথাও যেতেও পারবো না।

পুষ্প দৃঢ়স্বরে বলে—তুমি হুর্কল হয়ে হাল ছেড়ে বসে থেকো না, সেও কি পুরুষের কাজ, বীরের কাজ? তা ছাড়া তোমাকে এই বন্ধন থেকে বাঁচাবো আমি। নইলে তুমি বুঝতে পারচো না কি বিপদ তোমার সামনে—

কিন্তু যতীন কিছুতেই না যেতে চাইতে পুষ্প কিছুক্ষণের জন্তে পৃথিবীতে থেকে চলে গেল, বলে—পৃথিবীর ভোরের দিকে সে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু রাত দুটোর পর নেত্যা মত্তপানের অবসাদে ঘুমিয়ে পড়াতে যতীন ভাবলে এবার সে স্বস্থানে ফিরতে পারে। আশা বাড়ীওয়ালীর ঘরেই ঘুমুচ্ছে, সুতরাং এখন আর কোনো ভয় নেই, উদ্বেগ নেই। যেন ভয় বা উদ্বেগ থাকলেই সে ভয়ানক কিছু সাহায্য করতে পারতো!

পৃথিবী ছেড়ে বাইরের আকাশের এসে সে দেখলে শূন্য পথের সাধারণ চলাচলের মার্গগুলি একেবারে জনশূন্য। কেউ কোথাও নেই। যতীন একটু বিস্মিত হয়ে গেল। পৃথিবীর লোক না দেখতে পাক, কিন্তু অসীম ব্যোমের নানা স্থান দিয়ে বিশেষত ভূপৃষ্ঠ থেকে একশো দেড়শো গজের ওপর থেকেই মেঘপদবীর সমান্তরালে বা তদুর্দ্ধে বহু পথ সীমা-সংখ্যাহীন অনন্তের দিকে নিক্রদেশ যাত্রা করেছে। এই সব পথ কোনো বাধাধরা সুরকি সিমেন্টের তৈরি রাস্তা নয়—আত্মিক জীব, দেব-দেবী, উচ্চ জীবগণের গমনাগমন ঘরা স্থানির্দিষ্ট একটা অদৃশ্য জ্যোতিরেক্ষা মাত্র।

সাধারণত বিশ্বের এই রাজমার্গগুলিতে আত্মিক পুরুষেরা সর্বদা যাত্রায়াত করেন কিন্তু আজ সেখানে একেবারে কেউ নেই—আরও ওপরে এসে যে স্থান ধূসরবর্ণ আত্মাদিগের অধিষ্ঠানভূমি, সেও জনহীন।

যতীন বুঝতে পারলে না, এরকম ব্যাপারের কারণ কি। আজ এত বছর সে এসেচে আত্মিকলোকের তৃতীয় স্তরে—কিন্তু এমন অবস্থা সে দেখেনি কখনো। তার মনে যেন কেমন ভয়ের সঞ্চার হোল। অথচ কিসের ভয় সে নিজেই জানে না। যে একবার মরচে, সে আর মরবে না, তবে ভয়টা কিসের?

হঠাৎ যতীন দেখলে একটি লোক যেন আতঙ্কে চারিদিকে চাইতে চাইতে ঝড়ের বেগে উড়ে দ্বিতীয় স্তরের আত্মিক লোক থেকে আরো উর্দ্ধলোকের দিকে পালাচ্ছে। পৃথিবী হোলে বলা চলতো লোকটা দ্বিধাদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উর্দ্ধবাসে ছুটে পালাচ্ছে। ব্যাপার কি? এর নিশ্চয় কোনো গুরুতর কারণ আছে।

যতীন তাকে কিছু বলতে গেল, কিন্তু তার পূর্কেই লোকটা অন্তর্হিত হোল—মনে হোল

পলায়মান ব্যক্তি যেন হাতের ইঙ্গিতে তাকে কি বলে—কি বিষয় সাবধান করতে গেল।

লোকটি অদৃশ্য হবার কিছু পরেই যতীনের মনে হোল কী এক ভীষণ টানে তাকে নীচের দিকে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অতি ভীষণ সে টানের বেগ, তিমির-প্রসারক যেন কোন্ বিশাল চৌম্বক শক্তি জগৎব্রহ্মাণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ করে তার জাল বিস্তার করেছে—যতীনের সামনে, পাশে, দূরে, চারিদিকে ঝড়ের মত কোথা থেকে সেই ভীষণ শক্তির লীলা এক মুহূর্তে বাণ্ড হয়ে গেল। যতীন যেন ভীম আবার্তে তলাতল পাতালের অভিমুখে কোথায় চলেচে...তার জ্ঞান লোপ পেয়ে আসচে...কেবল এইটুকু সে লক্ষ্য করলে, শুধু সে নয়, ঝড়ের মুখে তার মত বহু জীবাত্মা কুটোর মত কোথায় চলেচে বিষম ঘূর্ণিপাকের টানে!...তারপর একটা আর্ত চীৎকার স্বর, এক কি বহু সম্মিলিত কণ্ঠের আর্তনাদ, যতীন ঠিক বুঝতে পারচে না, তার সংজ্ঞা নেই, অতিপ্রাকৃত কী এক বিষম শক্তির অমোঘ আকর্ষণ তাকে খেলার পুতুলে পরিণত করেছে...

ভয়ানক অন্ধকার তার চারিদিকে, এই কি তলাতল পাতাল? পৃথিবী কোথায়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্র সূর্য্য কোথায়, পুষ্প কোথায়? কল্পণাদেবী কোথায়, হতভাগিনী আশা কোথায়—সব লুপ্ত, একেবারে! কোন্ রসাতলে সে চলেচে দুর্লভ্য আকর্ষণে।

অনেকক্ষণ...অনেক যুগ যেন কেটে গিয়েছে...জ্ঞান নেই যতীনের। অন্ধকার ছাড়া আর কোনদিকে কিছু নেই। বহুদিন সে কী এক গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে ছিল। সব অন্ধকার...বিস্মৃতি...

পুষ্পের ডাকে তার চৈতন্য হোল। পুষ্প তাকে ডাকচে, ও যতীনদা, যতীনদা, বেরিয়ে এসো।

পুষ্প ও আর একজন তাকে প্রাণপণে ডাক দিচ্ছে, যেন কতদূর থেকে...

যতীন বলে উঠলো—আ্যা!—

—শীগগির চলে এসো—ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করো—ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ কৃষ্ণ—

পুষ্প, পুষ্প ডাকচে!

যতীনের জ্ঞান একটু একটু ফিরে এসেচে—এ কোন স্থান!

কে যেন ওর হাত ধরলে এসে। পুষ্পের কর্ণস্বর ওর কানে গেল আবার। পুষ্প যেন কাকে বলচে—এবার যতীনদা বৈচে গেল! তবে এখনও ঠিক জ্ঞান হয়নি—

আবার আত্মিকলোকেব নির্মল বায়ুস্তরে ওর নিশ্বাসপ্রশ্বাস সহজ ও আনন্দময় হয়ে আসচে। যতীন জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলে, সামনে পুষ্প ও পুষ্পের মা। সে বিস্ময়ে ওদের দিকে চেয়ে বলে—কি হয়েছিল বল তো? এ কি কাণ্ড! এমন তো কখনো—

তারপর সে চারিদিকে চেয়ে দেখে আরও অবাক হয়ে গেল। সে পৃথিবীর এক গরীব গৃহস্থের পুরোনো কোঠাঘরের মধ্যে। পৃথিবীতে রাত্রিকাল, সম্ভবত গভীর রাত্রি। বর্ষাকাল,

বাইরে ঘোর অন্ধকার, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়চে বাড়ীর পেছনের বাঁশবনে। ঘরের এক কোণে কিছু পেতল কাঁসার বাসন একটা জলচৌকির ওপরে, একটা পুরোনো তক্তাপোশ, দুতিনটি বস্তা—একটার ওপর আর একটা সাজানো—সম্ভবত ধান। ঘরের মেঝের একপাশে একটা জলের বালতি, ওদের ঠিক সামনে মেঝের ওপর মলিন কাঁধা পাতা একটা বিছানার একপাশে ছোট ছোট বালিশ পাতা আর একটা ছোট বিছানা কিন্তু সে ছোট বিছানাটা খালি। আর বিছানার সামনে মেঝের ওপরেই মলিন শাড়ী পরনে একটি মেয়ে বসে অঘোরে কাদচে, মেয়েটির কোলে একটি মৃত শিশু, সম্ভবত ছ'সাত মাসের। ঘরের দরজার কাছে একটা পুরোনো হ্যারিকেন লঠনে বোধ হয় লাল তেল জ্বলচে, কারণ আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশি হয়ে লঠনের কাঁচের একটা দিক কালো করে ফেলেচে। ঘরের মধ্যে আরও দুতিনটি মেয়ে ও পুরুষমাত্র সবাই ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে ঘিরে নিঃশব্দে বসে।

মেয়েটি কাদচে আর বিলাপ করচে—ও আমার ধনমণি, ও আমার সোনা, হাসো, দেয়ালী করো, ও আমার মানিক, চোখ চাও—আমার কোল খালি করে পালিও না আমার সোনা—কোথায় যাবা আমার ফেলে?

যতীন বিশ্বয়ের দৃষ্টিতে পুষ্পের ও পুষ্পের মার দিকে চেয়ে বলে—এ সব কি ব্যাপার! এরা কারা? আমি কোথায়?

মেয়েটি একমনে বিলাপ করেই চলেচে কোলের মৃত শিশুর দিকে চোখ রেখে।

—কাল থেকে তুমি একবারও মাইএ মুখ ছাওনি যে বাবা আমার! মাই বাবা? মায়ের মাইএ মুখ দেবা না, ও মানিক আমার? আর মুখ দেবা না? চোখ চাও দিনি—

মেয়েটির আকুল ক্রন্দনে যতীনের মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের চঞ্চলতা দেখা দিল, পরের কান্না শুনে এমন কখনো তার হয়নি—সম্পূর্ণ অননুভূত কৌন অনুভূতিতে ওর চোখে জল এসে পড়লো।

পুষ্প বলে—চলে এস যতীন দা, চলো সব বল্চি। তুমি পুনর্জন্মের টানে পড়ে পৃথিবীতে জন্মেছিলে আজ ছ' সাত মাস। ওই তোমার মা। আজ আবার দেহ থেকে মুক্তি পেলে। ওই মৃত শিশুই তুমি—কি বিপদেই ফেলেছিলে আমাদের।

যতীন অবাক হয়ে বলে—পুনর্জন্মের টান! সে কি! আমি এই বাড়ীতে—

—এই ঘরেই জন্মেছিলে। এরা ব্রাহ্মণ, গ্রামের নাম কোলা বলরামপুর, জেলা যশোর। ভগবানের কাছে বহু ডাক ডেকে আর করুণাদেবীর দয়ায় আজ উদ্ধার পেলে—নতুবা দেহ ধরে এই সব অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ে এখন বহুকাল কাটাতে হোত—পুনর্জন্মের ঠালা বুঝতে পারতে। ব্যর ব্যর পৃথিবীতে যাওয়া-আসার কুফল এখন বুঝতে পারচো তো? কতবার না বারণ করেছি?

যতীনের মন তখন কিন্তু পুষ্পের ওসব আধ্যাত্মিক তিরস্কারের দিকে ছিল না। তার সামনে বসে এই তার পৃথিবীর মা, গরীব ঘরের মা, তারই বিষোগব্যথার আকুলা, অশ্রুমুখী। গত ছ'মাসের শৈশবস্বৃতি কোনো দাগই কাটেনি তার শিশু-মস্তিষ্কে। কিন্তু কত

বিনিদ্ভ রজনী যাপনের মৌন ইতিহাস ওই দরিদ্রা জননীর তরুণ মুখে! তারই মা, তারই নবজন্মের দুঃখিনী জননী, যার বজ্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে ছ'মাস পূর্বে এই দরিদ্র গৃহে কত আশা আনন্দের ঢেউ তুলে একদিন সে পুনরায় ধরণীর মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। কি অদ্ভুত মোহ, কি আশ্চর্য্য মায়ার বাঁধন, মনে হচ্ছে, স্বর্ণ চাইনে, করুণাদেবীকে চাইনে, পুষ্পকে চাইনে, আশাকে চাইনে, আধ্যাত্মিক উন্নতি-টুন্নতি চাইনে—এই পৃথিবীর মাটিতে পৃথিবীর এই মায়ের কোলে স্নেহদুঃখে সে আবার মানুষ হয়! এই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিধারা, এই বর্ষার রাত্রিটি, এই গরাব মায়ের তারই জন্তে এ আকুল বুকফাটা বিলাপ—এ সব জীবনস্বপ্নের কোন্ গভীর রহস্যময় অন্ধ অভিনয়ের দৃশ্যপট? ভগবান হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠিত স্বপ্ন।

ওর মনে পড়ল যাত্রার শোনা গানের দুটো লাইন—

এ নাটকের এ অঙ্কে পেয়েছি স্থান তোর অঙ্কে,

হয়তো যাবো পর অঙ্কে পর অঙ্কে পুত্র সেজে।

ওদের মধ্যে একজন প্রোঢ়া বলে—আর কেঁদো না বোঁ, যা হবার হয়ে গেল, এখন উঠে বুক বাঁধো—মনে করো ও তোমার ছেলে নয়—ভারত করতে যদি ও আসতো তা হোলে কোলজোড়া হয়ে থাকতো, তা ভারত করতে তো আসে নি—কেঁদো না—

একজন আধবুড়ো গোছের লোক বলে—বিষ্টি মাথার এখন আর কোথায় যাবো—সকালের আর বেশি দেরি নেই, সাধন আর হরিচরণকে নিয়ে আমি যাবো এখন—

প্রোঢ়া বলে—বিষ্টিরও বাপু কামাই নেই—সেই যে আরম্ভ করেছে বিকেলবেলা, আর সারারাত—

কথা বলতে বলতে কাক কোকিল ডেকে রাত ফসাঁ হয়ে গেল। পুষ্পের বার বার আহ্বানেও যতীন সেখান থেকে নড়তে পারলে না। পুত্রহারা জননীর আকুল কান্না, ও আছাড়ি-বিছাড়ির মধ্যে সেই আধ-বুড়ো লোকটি আর দুজন ছোকরা মৃত শিশুদেহ নিয়ে বৃষ্টিধারা মাথায় বাঁশবনের পথে চললো। যতীন, পুষ্প ও পুষ্পের মা গেল ওদের সঙ্গে। বাড়ী থেকে দু'শি আন্দাজ দূরে ছোট্ট একটা নদী, কচুরিপানার দামে আধ-বোজা; ওরা সাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে মৃত দেহটা নদীর ধারে পুঁতে ফেললে। তখনও ভাল করে দিনের আলো ফোটেনি, বৃষ্টিধারায় চারিদিক ঝাপসা। পথে-ঘাটে লোকজন নেই কোথাও—বর্ষাকালের ধারামুখর প্রভাতকাল।

পুষ্প যতীনকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীর বৃষ্টিধারা-মুখর ঝাপসা আকাশের উর্দ্ধে এক সু-উচ্চ পর্বত-চূড়ায় এসে বসলো। পুষ্পের মা বলে, আমি যাই মা পুষ্প, বসো তোমরা।

নিম্নে পৃথিবীর চারিদিকে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জ থেকে বিদ্যুৎ খেলচে, দিক্-

চক্ৰবালে সুনীল আকাশে সূর্য্যোদয় হচ্ছে, অনেক দূর পর্য্যন্ত আকাশ রাত্তা ওরা। ওরা যেন পার্থিব বাসনা কামনার বহু উর্দ্ধের কোনো নির্মল দেবলোক থেকে পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে। বাংলা দেশের উত্তরে এ বোধ হয় হিমালয় পর্ব্বতের চূড়া। দূরে নিকটে তুষারমাশি সূর্য্যালোকে ঝক্‌ঝক্‌ করছে। যতীনের মনে হচ্ছিল এই সবই মায়া, ভেল্কিবাজি, ভগবানের ভেল্কিবাজি। মৃত্যুর অসত্যতা সে ভাল ভাবে বুঝেছে। মৃত্যু বলে তাহোলে কোনো জিনিস নেই; এই তো সে যশোর জেলারই কোলা-বলরামপুর গ্রামে মরে গেল শেষ রাত্রে, অথচ এখানে সে পর্ব্বতশিখরে বাহাল-তবিরতে সমাসীন। মরণ নেই, বিচ্ছেদ নেই, দুঃখ নেই, আমরা অমর—জীবনমরণের সঙ্গে, সুখদুঃখের সঙ্গে—সনাতন, নিত্য, অনন্তর আমাদের এ ক্ষণিক লীলাখেলা।...

পুষ্প যতীনের মনের ভাব বুঝতে পারলে। হাজার হোক, যতীনদা পুরুষ মানুষ, ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল, জিনিসগুলো চট করে ধরতে পারে। পেটে একেবারে বিত্তে না থাকলে অন্ধকার ঘোচে? সে গম্ভীর মুখে বলে, এবার বেঁচে গেলে বটে, কিন্তু বার বার আশা বৌদির কাছে যাতায়াতের ফলে তোমার এই বিপদ। অনেকবার তোমার সাবধান করেছিলাম, শোনো নি। পুনর্জন্মের আবর্ত মাঝে মাঝে আত্মিক স্তরে ঝড়ের মত এসে পৌঁছয়, কোথা থেকে আসে তা জানিনে, কটা ব্যাপারই বা বুঝি জগতের! সেই সময় যে কেউ সামনে পড়ে, তাকে নিয়ে এসে পৃথিবীতে ফেলে ঘুরিয়ে। ও থেকে রেহাই নেই। তাই এসে জন্মেছিলে পৃথিবীতে—

—আমার মনে আছে সে ভীষণ টানের কথা—জ্ঞান ছিল না আমার।

—তোমার উচিত হয়নি আশাদের বাসায় অতক্ষণ থাকা। ও একটা ঝড়ের মত, ভূমিকম্পের মত বিপর্য্যয়; তবে তৃতীয় স্তরের নীচের অঞ্চলেই ও আবর্তের সৃষ্টি, চতুর্থ স্তরের আত্মারা তত বিপদগ্রস্ত হন না ওতে—যদিও পালিয়ে যান সকলেই; ও একটা অন্ধ শক্তি—ওকে বিশ্বাস নেই। কোথায় ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে পুনর্জন্ম ঘটাবে পৃথিবীতে। অনেকেই পৃথিবীতে জন্ম নিতে চায় না, সকলেই শুটাকে ভয় করে।

—ভূমি আমাকে কোনোদিন এই ব্যাপারটার কথা বলে নি তো?

—ভূমিকম্পের কথা পৃথিবীতে সবাইকে সবাই বলে বেড়ায়? হয়তো জীবনই ঘটলো না, নয় তো এসে সব গুলটপালট করে দিয়ে গেল—এও তেমনি। পৃথিবীর বাসনা কামনা আসক্তি যখন মনের মধ্যে বেশি হয় বা যখন তৃতীয় স্তরের নীচেকার আত্মিক লোকে থাকে—তখনই ওই আবর্ত বড় বিপজ্জনক। সেইজন্মেই তোমার বার বার বারণ করতাম। একা আর তোমাকে বেরুতে দেবো না—

—ভূমি জানতে পারলে কখন?

—তখন। আমি তখন জপে বসেছি—

লজ্জায় পুষ্প নিজেকে হঠাৎ সামনে নিলে, সে জপ ধ্যান করে লুকিয়ে, যতীনদার সামনে সে মস্ত বড় কোনো যোগিনী সাজতে চায় না।

—হ্যা, হ্যা—তারপর ?

—তারপর তখন বুঝলুম, তুমি মাতৃগর্ভে ঢুকে গিয়েচ। সঙ্গে সঙ্গে তোমার তো সব বিস্মৃতি এসে গেল, আমি মরি ছোটোছোট করে। ছুটি করুণাদেবীর কাছে, আমার গুরুদেবের কাছে ছুটি। করুণাদেবী বলেন, মার মনে দুঃখ দিয়ে তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না—

যতীন হেসে বলে—পৃথিবীতে মরে গেলুম, আর তোমাদের এখানকার ভাষায় বেঁচে গেলুম, এ বেশে মজার কথা বলচো কিন্তু পুষ্প ! আরও দুবার এর আগে এমনি বলেচ ‘বেঁচে গেলে যতীনদা’—আরে, মরেই তো গিয়েচি আজ সকালে পৃথিবীতে ?

পুষ্প হেসে বলে—তারপর শোনো। করুণাদেবী মাকে কাদাতে পারবেন না—গুরুদেব বলেন—তোমাকে মাতৃগর্ভে দশমাস দশদিন থাকতে হবে—তারপর ভূমিষ্ঠ হতে হবে, তবে তিনি চেষ্টা করবেন—

—কি চেষ্টা করবেন—শিশুহত্যার ?

—তোমার অজ্ঞান অন্ধকার কাটেনি দেখচি এখনও—

—না, আমার মনে খটকা লেগেচে। পুষ্প, আমার—তোমাদের ভাষায়—‘বাঁচিয়ে’ খুব ভাল করেচ, কিন্তু ওই মেয়েটির কান্না—আমার মায়ের ওই কান্না—

যতীনের চোখে জল এসে পড়লো।

পুষ্প হেসে বলে—চলো গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাই। এতদিন তোমার বলিনি তাঁর কথা—তোমার মন আজ ভাল না, চলো আমার সঙ্গে—

—সে কতদূর ?

—পঞ্চম স্বর্গের দ্বিতীয় স্তরে—তোমাকে আবরণ দিয়ে শক্তি দিয়ে নিয়ে যাবো, নইলে, তোমার জ্ঞান থাকবে না অত ওপরে। কিছু দেখতেই পাবে না—

যতীন খানিকক্ষণ কি ভাবলে, তারপর বলে—বোসো পুষ্প, দেখে আসি মা কি করছেন—

পুষ্প ধমক দিয়ে বলে—কে মা ? কিসের মা ? বৈষ্ণবী মায়ার ভুলোনা। অনন্ত পথে কত মা, কত বাবা, কত ছেলে, কত স্ত্রী। প্রত্যেকেই অ-বিনাশী আত্মা, প্রত্যেকেই লীলা করচে। চলো—

—না পুষ্প, আমার সত্যিই এখনো তোমার মত জ্ঞান জন্মায় নি মনে। এখনো মায়ার দয়্য মন থেকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারিনি। তোমাদের ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে তোমরা থাকো—আমি ওর মধ্যে নেই, সত্যি বলচি। আমাকে যেতেই হবে মাকে দেখতে। আজ সকালে মার সেই বুককাটা কান্না আমারই জন্তে, সে আমি ছেলে হয়ে কি করে ভুলি ?

পুষ্প বৃদ্ধ হেসে একটু দীরভাবে বলে—উঃ, কি বাধন, তাই দেখচি ! মায়ার শক্তি আছে বটে ! এড়ানো বলেই কি এড়ানো যায় ? মাতৃশব্দে নিয়ে পৃথিবীর লীলা তা হোলে হয় কি করে !

পরে সে হঠাৎ স্নায়ুগে গিয়ে উঠলো দুটো মাত্র কলি—

‘এ বাঁধন বিদ্রি স্বজন, মানব কি তায় খুলতে পারে ?

কারাগার ভাঙতে কি পারে, ও যে মান্নার পাঁচিল আছে ঘিরে !’

যতীন ব্যঙ্গের সুরে বল্লে—থাক্, থাক্ ব্রহ্মবিষ্ঠে এখন তুলে রেখে দাঁও, ওসব সহিবে না খাতে ।

পুষ্প হেসে বল্লে—কেমন গলা, যতীনদা ?

—চমৎকার ।

—তা এখন মার কাছে না গিয়ে এর পরে যেও ।

—আমি একবার দেখে আসি, বোসো— ।

আবার সেই কোলা-বলরামপুর গ্রাম । বেলা দুপুর । বৃষ্টি থেমেচে, কিন্তু আকাশ মেঘ-মেহুর । সজল বর্ষার বাতাস বইচে, সারারাত্রি বর্ষণের ফলে পথে-ঘাটে জল দাঁড়িয়েচে ! বৃষ্টি-সিক্ত লতাকাণ্ডের পত্রপুঞ্জ থেকে টুপটাপ বৃষ্টির জল ঝরে পড়চে এখনও ।

রান্নাঘরের দাওয়ায় মেয়েটি খেতে বসেচে । কলাইয়ের দাল, মোচা ছেঁচকি আর কাঁচকলা ভাজা । সকালবেলার সেই প্রোঁচাও পাশে বসে থাক্চে । সে খেতে খেতে বল্লে—একটু ডাল দেবো বৌ ?

—না, আমি আর কিছু খাবো না মাসী । যা খেয়েচি সকালবেলা, পেট ভরে গিয়েচে—

—ছিঃ অমন কথা বলতে নেই বৌ, আবার কোলজোড়া ছেলে পাবে, হাতের নোয়া সিঁথের সিঁহুর বজায় থাক্ ।

মেয়েটি ভাত খাওয়া ছেড়ে হাত তুলে বল্লে—কি মুখ চোখের ছিри, মাসী—ও যে বাঁচবে না সে আমি জানি—আমার কপালে কি অমন ছেলে বাঁচে । সেবার কিসে কামড়ালো রাত্তিরে, ছেলে ককিরে কৈঁদে উঠলো, আমি তাড়াতাড়ি টেমি জ্বলে দেখি ছেলের কাঁথার তলায় এতবড় কাঁকড়া বিছে ! সেই রাত্তিরে কাঁটানটের শেকড় বেটে, জলপড়া এনে নাপিত-বাড়ী থেকে দিই । আহা, অশ্বিন মাসে একবার এমন কাসি হোল যে বাছাদম আটকে বৃষ্টি যায়—কি যে বল্লে শিবু ডাক্তার, ছপিং কাশি না কি—যে কদিন ছিল, কি কষ্টই পেয়ে গিয়েচে বাছা আমার !

প্রোঁচা বল্লে—কৈঁদো না বৌ, ছিঃ—ভাতের থালা সামনে কৈঁদতে নেই দুপুর বেলা । অলক্ষণ ।

মেয়েটি কৈঁদতে কৈঁদতে বল্লে—আর আমার লক্ষণ অলক্ষণ সব হয়ে গিয়েচে মাসী—এখন তোমরা বেলো আমিও তার সঙ্গে চলে গিয়ে হাড় জুড়ুই । আমি কি করে খোকার মুখ না দেখে থাকবো, ও মাসী !

মেয়েটি এবার ডুকরে কৈঁদে উঠলো ডাল ভাত মাখা হাত তুলে হাঁটুর ওপর রেখে ।

বি. র. ৮—৭

—ছিঃ বো, ওকি! খাও, খাও, আরে অমন করে না। তুমি তো অবুখ নও, আবার হবে, এই-স্বী মানুষ, ভাবনা কি? কোল জুড়ে আবার পাবে—

যতীনকে নিয়ে টেনে বার করাই কঠিন সেখান থেকে। পুষ্প অনেক কষ্টে তাকে কোলা-বলরাম-পুরের বাঁড়ুঘা-বাড়ী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল বুড়োশিবতলায়।

বল্ল—খুব মন কেমন করচে মার জন্তে?

—সত্যিই, এত কষ্ট দিয়ে এসে অপরের মনে, আমার কোনো সুখ হবে না এ স্বর্গে। এ যেন পান্সে হয়ে গিয়েচে। জগতে যখন এত কষ্ট—তখন আমি সুখে থেকে কি করবো পুষ্প। পৃথিবীই আমার ভাল, মাথার ঘাম পারের ক্লেমে সেখানে জমি চাষ করি, স্ত্রীপুত্রকে খাওয়াই, মাকে খাওয়াই। দেখলে না মায়ের খাওয়া গেল? আমি সেই মায়াবাদী সন্ন্যাসিকে পেলে একবার জিজ্ঞেস করি, সবাই যদি সমাধি লাভ করে ব্রহ্মে লয় পাবে, তবে জগৎসংসার চলবে কাদের নিয়ে? সব নিয়েই তো সংসার। চাষা যদি লাঙল না চষবে, তাঁতি কাপড় না বুনবে, মজুর যদি তোমার আমার হয়ে না খাটবে—তবে একদিন সংসার চলে কেমন চলুক তো? তুমি তো বলচো সব মিথ্যে, সব ভুল—

—এ কথার উত্তর আমি তোমায় এখন দিতে পারি, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে না আমার মুখ থেকে শুনলে। তাই এর জবাব দিলাম না।

—জবাবে দরকারও নেই। তুমি কেন আমাকে নিয়ে এলে পৃথিবী থেকে?

—কেন নিয়ে এলাম! শুনবে তবে? আমি আনিনি। তোমার অদৃষ্ট তোমাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়েছিল, অদৃষ্টই আবার এনেচে। পৃথিবীতে পুনর্জন্মের সময় তোমার আসেনি—দৈবত্বক্ষিপাকে পুনর্জন্মের টানে জন্মতে বাধ্য হয়েছিলে। ও একটা দুর্ঘটনা—যেমন ভূমিকম্প। ও থেকে তোমার কর্মফল তোমাকে মুক্ত করে আনতো—এনেওচে। আমি কে? আমি সাহায্য করেচি মাত্র। পুনর্জন্মের জন্তে অত ভেবো না—ও যখন হবে, তখন কেউ রুখতে পারবে না।

—আমার ভার লাগে না...পৃথিবীতে এত কষ্ট! এখানে নিঃশ্বাসে কোন্ প্রাণে...ওদিকে আশা, এদিকে আমার মা—

—পৃথিবীর মানুষ তুমি এখন আর নও এই কথাটা ভুলে যাচ্চ। পৃথিবীর মানুষ যখন ছিলে, তখন যে কথা বলচো তা বললে মানাতো। বিধাতার নিয়মই এই, পৃথিবীর জীবন থেকে এখানে আসতে হয়। সকলের জন্তে কষ্ট করবো বললেই তোমায় শুনচে কে? নিয়মের অধীনে তোমাকে চলতে হবে। ভগবান তোমার আমার চেয়ে ভাল বোঝেন। তাঁর আইন মেনে নিতেই হবে। কেন এরকম হোল, এর জবাব তিনিই দিতে পারেন। আমার সেই গুরুদেবের কাছে যাবে? তিনি তোমায় বোঝাতে পারবেন।

—না, আমার গুরু-টুকতে দরকার নেই পুষ্প, তুমি ক্ষ্যামা দাও—চের হয়েছে। আমার বড় ইচ্ছে সেই মায়াবাদী সমাধিবাজ সন্ন্যাসিটার সঙ্গে—

—মহাপুরুষদের সম্পর্কে তোমার মুখের ভাষাগুলো একটু ভদ্র করো যতীনদা—

এমন সময়ে বুড়োশিবতলার ঘাটে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো।

হঠাৎ ভূজনেই আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইলো, পশ্চিমদিকের আকাশ যেন প্রজলন্ত উজ্জ্বল মত কোন আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছে বহুদূর পর্য্যন্ত। আরও একটু পরে ওরা দেখতে পেলো বহুদিন আগেকার দেখা সেই পথিক দেবতা শূন্যপথে চলেছেন। মনে হোল যেন তিনি ওদের দিকেই আসছেন, সেই রকম একটা নীল আলো ওদের সাগঙ্গ-কেওটার ঘাট অবধি এসে পড়লো, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর পথ গেল বদলে। তিনি আরও দূরের কোন্ গ্রহলোকের দিকে যাত্রা করলেন। যতীন প্রথমটা চিনতে পারেনি। বলে, উনি কে পুস্প?

—চিনতে পারলে না যতীনদা? উনি সেই পথিক দেবতা, এককল্প পূর্ষ থেকে যাত্রা করেছেন এই বিশ্বের শেষ দেখবেন বলে কিন্তু এখনও এর একাংশও দেখে উঠতে পারেননি—কত নীহারিকা, কত নক্ষত্রলোক কত গ্রহলোক তিনি ঘুরেছেন, এমন কত লক্ষ লক্ষ পৃথিবী—তবু এর কোন হদিশ তিনি পাননি। মনে নেই, সেই এখানে ক্লান্ত হয়ে এসে পড়েছিলেন? পৃথিবী শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেটা আবার কোন্ গ্রহ! হৃদ্য কোনটা চিনতে পারেননি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

পুস্প একটু প্রচ্ছন্ন তিরস্বারের সুরে বলে, তাইতো বলচি যতীনদা, এই সামান্য সৌরজগতের এই ক্ষুদ্র গ্রহ পৃথিবীর মায়া তুমি কাটাতে পারচো না, অথচ দেখ তুমি যে লোকে এসেচো সেখানে একটু সাধনা করলেই তুমি অমনি কত লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ, তার কোটি কোটি গ্রহের জীবনযাত্রা দেখতে পাবে! কত দেখবার আছে, কত জানবার আছে যতীনদা, সে সব তোমার দেখতে জানতে হচ্ছে করে না?

যতীন তখনই কোন জবাব দিতে পারলে না, কিছুক্ষণ শুক হয়ে বসে রইলো। তারপর সহসা উত্তেজিত সুরে বলে—আমি সব দেখব, বুঝবো পুস্প। আমার চোখ উনি অনেকখানি যেন খুলে দিয়ে গেলেন। চলো করুণাদেবীর কাছে—

—এখুনি?

—এতটুকু দেরি নয়।

আবার সেই উচ্চ আঙ্গিকলোকের বায়ুস্তর, চক্ষের নিমেষে পুষ্পের সাহায্যে যতীন শত শত যোজন, যোজনের পর যোজন পার হয়ে চললো। করুণাদেবীর আশ্রম সেই ক্ষুদ্র গ্রহটিতে ওরা পৌঁছে দেখলে কেউ কোথাও নেই। সেই কুসুমিত উপবন, সেই প্রাচীন বৃক্ষতল যেখানে রাজরাজেশ্বরীর মত রূপসী দেবী সেদিন এলিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, আজ সে-স্থান জনশূন্য।

যতীন হতাশার সুরে বলে—তাইতো! এ যে দেখচি—

—জগৎ-সংসারের কাজে সর্বদা ঘুরছেন, কি জানি কোথায় গিয়েছেন—

—কিন্তু কি সুন্দর দেশ এটা! আমার ইচ্ছে করে এখানেই থাকি। বুড়োশিবতলার ঘাট এমন করে নেওয়া যায় না?

—অনেক বেশি শক্তি দরকার এমন দেশ গড়তে, আমার তা নেই যতীনদা। এদেশ শুধু বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে স্নান হয় নি, মনের ওপর এর প্রভাব বুঝতে পারচো নিশ্চয়ই। আমরা যেন অনেক উঁচু জীব হয়ে গিয়েছি ; শান্তি নেই, ক্রান্তি নেই, দেহ মন কত উঁচু ধরনের হয়ে গিয়েছে।

এমন সময় একটা বিস্ময়কর আবির্ভাবের মত করুণাদেবী হঠাৎ যেন জ্যোতিঃপদ্মের মত ফুটে উঠলেন সেই বনস্থলীর প্রান্তে। স্নেহ ও প্রশমতা দেবীর বিশাল চক্ষুটির ঘননীল তারকার। হেসে বলেন—আমি তোমাদের দেখে এক জায়গা থেকে ফিরে এলাম—

পুষ্প লজ্জিত ও অপ্রতিভের সুরে বলে—আপনার কাজে বাধা দিলাম দেবী ?

করুণাদেবী হেসে বলেন—না। আমিও ইচ্ছে করেছিলাম তোমরা আজ এখানে আসবে—বসো, এসো এই গাছের তলায়।

যতীন ও পুষ্প গাছের তলায় গুঁর পাশে বসে পথিক দেবতার অদ্ভুত আবির্ভাবের ব্যাপার বলে। করুণাদেবী সব শুনে বলেন—ভগবান বা ব্রহ্মের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী কোনো নাস্তিক দেবতা, তবে মহাশক্তির বটে। আমার জানা নেই।

যতীন বলে—এত যিনি দেখে বেড়াচ্ছেন তিনি নাস্তিক ?

—গুঁরা অস্ত্র বিবর্তনের প্রাণী।

—পৃথিবীর নয় ?

—না, অস্ত্র কল্পের। সে শুনবে এখন। চলো, যেখানকার কাজ ফেলে এখানে এসেছি, সেখানে তোমাদের নিয়ে যাই।

দুজনেই চোখ বোজো। যতীনের জ্ঞান যাতে থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হবে, নয় তো সে উচ্চস্তরে গিয়েও কিছু দেখতে পাবে না, বুঝতে পারবে না। এক মুহূর্তে ওরা অশুভব করলে খুব অদ্ভুত এক জায়গায় এসেচে। ওরা এক নিমিষে যেন বিরাট আত্মা হয়ে গিয়েচে, বাধাবন্ধহীন সর্বসংস্কারমুক্ত দেবাত্মা। দেশ ও কাল উপস্থাসের কাহিনী যেন,—এই ছিল কোথায়, এই এল কোথায়। দেশ অতিক্রম করতে হোল না, কালের ব্যবধান অশুভূত হোল কই ?

সেও এক বিচিত্র দেশ। বাতাসে যেন নব প্রক্ষুটিতা মৃণালিনীর স্নগন্ধ। এক বিশাল সুনীল সমুদ্রের ঢেউ তটশিলায় এসে আছড়ে পড়চে ; সমুদ্রের মাঝে মাঝে ম্যাজেন্টা রঙের, ধূসর কৃষ্ণ রঙের ছোটবড় পাহাড় ইতস্তত ছড়িয়ে। সমুদ্রের তীরে একটি আরণ্য বৃক্ষের তলে এক রূপবান জ্যোতির্ময় তরুণ দেবতা বসে একমনে চিন্তা করছেন।

যতীন এমন দৃশ্য কখনো দেখেনি, এমন অপূর্ব রূপবান মহাজ্যোতির্মান দেবমূর্তি। সে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

পুষ্প তাঁকে দেখে কিন্তু অবাক হয়ে গেল অস্ত্র কারণে। একে সে অনেক বছর আগে দেখেছিল, যেদিন সে যতীনকে পঞ্চমস্তরে নিয়ে যেতে যেতে তার সংজ্ঞাহীন দেহ ঘারা বিপদ-প্রস্তু হয়েছিল। সেই তরুণ দেবতা, যিনি সেদিন শৈলশিখরে বসে ছিলেন।

দেবতা করুণাদেবীর দিকে চেয়ে বল্লেন—এরা কে ?

পুষ্প বল্লে—দেব, আপনি আমাকে দেখেচেন এর আগে—সেই একদিন—

করুণাদেবী বল্লেন—এদের কথা তোমাকে বলেছিলাম ! এর নাম পুষ্প, ওর নাম যতীন, তোমার পৃথিবীরই নাম বাপু—

দেবতা প্রসন্ন দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে বল্লেন—ও, বুঝেচি।

পরে যতীনের দিকে চেয়ে বল্লেন—কিন্তু এঁকে নিয়ে এসে ভাল করলে না। এর এখনো অনেক দেরি। পার্থিব তৃষ্ণা এর এখনও যায় নি। এত উঁচু স্বর্গে এঁকে আনলে এর ফল হবে এই, আগামী জন্মে এর স্মৃতি শুকে কষ্ট দেবে—কোন কিছুতে মন বসাতে পারবে না। তুমি তো জানো, তৃতীয়স্তরের কোনো লোককে এখানে আনা সেই ব্যক্তির পক্ষেই কঠিন।

করুণাদেবী ঝগড়া করার সুরে বল্লেন—বেশ করেচি, যাও। তুমি ওর সব স্মৃতি মুছে দিও, নয় তো আমি দেবো। দেবাঁতে নিয়ে আসিনি শুধু, ওর অনেক প্রশ্ন আছে, জানতে ইচ্ছে হয়েচে।

যতীন ভাবছিল তার কি মহাপুণ্য ছিল, আজই এমন দুটি জ্যোতির্ষ্ম দেবতার দর্শনলাভের সৌভাগ্য তার ঘটলো ! কি অদ্ভুত রূপ !

সে বিনীত সুরে বল্লে—যদি দেখার সৌভাগ্যই ঘটলো, তবে দেবতা, আমার এমন করে দিন, যাতে এখানে বার বার আসতে পারি, বা আপনার দেখা পেতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিন।

তরুণ দেবতা করুণাদেবীর দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন—ওই দেখলে তো কি বলচে ? এদের অজ্ঞানতা ঘুচতে অনেক বিলম্ব।

পুষ্প হাত জোড় করে বল্লে—আপনি শুঁকে দয়া করে ক্ষমা করুন। উনি নতুন এ স্তরে এসেচেন, এখানকার কিছুই জানেন না।

যতীন অপ্রতিভ না হয়ে বল্লে—আপনি দয়া করলেই সব হবে। কিছুক্ষণ আগে আমাদের ওদিকে একজন কে এসেছিলেন, তাঁর কথা যা শুনলাম তাতে আমি অবাক হয়ে গিয়েচি। আমার সব জানবার ইচ্ছে হয়েচে, তিনি কত গ্রহনক্ষত্র বেড়িয়ে এসেচেন—আমার এর আগে বলেছিলেন সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন—

দেবতা বল্লেন—কে ?

করুণাদেবী বল্লেন—পৃথিক কেউ হবে। দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়ানোই তাঁর কাজ বলে মন হোল। নাস্তিক দেবতা।

তরুণ দেবতা একটুখানি চুপ করে থেকে বল্লেন—নাস্তিক কি ? মনে হয় না। ওদের উপাসনাই ওই। বিশ্বে ব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক আবিষ্কার আছে, এদের শক্তি যথেষ্ট, তেজ অসীম। তাদের মধ্যে কেউ হবে। আচ্ছা, তোমরা আমার সঙ্গে চলো আর একটা জায়গা দেখিয়ে আনি—

যতীন বলে—দেবতা, আপনার কথা আমি ওই মেরেটির মুখে আগে শুনেচি। তবে আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

—না, কি করে দেখবে। পুষ্প আর তুমি এক স্তরের লোক নও—

পুষ্প বলে—উনি এক বিপদে পড়েছিলেন—চুষকের চেউএ পড়ে পৃথিবীতে গিয়ে জন্ম নিয়েছিলেন—সবে এসেছেন সেখান থেকে।

দেবতা ধীরভাবে বলেন—তা সম্পূর্ণ সম্ভব। খুব সাবধানে চলাফেরা করো। ওই যে পথিক দেবতার কথা বলছিলে, ওঁরা এক কল্পের জীব নন। পূর্ব কল্পে ওঁদের দেবত্বপ্রাপ্তি হয়েছে—মুক্ত আত্মা হয়ে বহু উর্দ্ধে উঠে বহু তেজ সঞ্চয় করেছেন, কিন্তু ওঁরাও পুনর্জন্মের আকর্ষণকে ভয় করে চলে। তবে এই লোকটির এখনও অনেক জন্ম বাকি—এঁকে পৃথিবীতে জন্মাতে হবে অনেকবার।

যতীন বার বার ওই এক কথা শুনে একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সে বিরক্তি না চাপতে পেরে বলে উঠলো—দেব, তার জন্তে আমি দুঃখিত নই। পৃথিবীতে জন্ম নিলে কষ্টটা কি?

—আমি জানি। যে জানে সে ও বিশ্বের সব কিছু এবং বিশ্বদেব একবস্ত্র এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—তার পক্ষে পৃথিবী বা স্বর্গ সমান হয়ে গিয়েছে। যে জানে পৃথিবীর সব কিছুই তিনি, তার কাছে পৃথিবী ও স্বর্গ একই সুরে বাঁধা মোহন সঙ্গীতে! তোমাদের জ্ঞানী লোকেরা তাই তোমাদের শ্রীকৃষ্ণকে বংশীধারী কল্পনা করেছেন। কিন্তু এ চোখে পৃথিবীর সবাই দেখে কি? সাধারণ মানুষ কর্ম অমুসারে প্রথম তিন স্তরে গতাগতি করে, ম'রে ভুলোক থেকে ভুলোকে আসে, সেখান থেকে উন্নতি করে স্বর্গলোকে আসে—আবার সেখান থেকে জন্মায় পৃথিবীতে, আবার মরে, আবার জন্মায়, আবার মরে। এঁকে বলে মানব-আবর্ত। চাকার মত ঘুরচে এই আবর্ত—চলো, একটা বাপার তোমায় দেখাই, পৃথিবীতেই চলো, সেখানে তোমরা সহজ ও স্বচ্ছন্দ অবস্থায় থাকবে। চলো তোমাদের দেশেই নিয়ে যাই—

মহাশূন্তের পথহীন পথে করুণাদেবী ওদের নিয়ে আগে আগে চলে। দূরে একটা কি বিশাল গ্রহ নিরন্তর অন্ধকার সমুদ্রে পাক পেয়ে খেয়ে ঘুরচে। হু-হু করে নেমে এল—একটু পরে পৃথিবী এক ভূধারাবৃত পর্কতশিখর ডিঙিয়ে ওরা এক নদীর ওপরকার শূন্তে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

দেবতা পিছনে পিছনেই আসছিলেন। বলেন—এটা চিনতে পারচো কী নদী?

যতীন বলে—না দেব, ঘোর অন্ধকার পৃথিবীতে—কিছু দেখতে পাচ্চিনে—এখন বোধ হয় রাতদুপুর।

করুণাদেবী হেসে বলেন—এত বড় নদী বাংলাদেশে ক'টা আছে। আন্ডাজ করে বোলো।

—আজ্ঞে, হয় গঙ্গা, নয় পদ্মা।

—ওই রকমই, এটা গঙ্গা।

দেবতা হেসে বলেন—তুমিও ঠিক ভাল বলতে পারলে না, গঙ্গা তো বটে। মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা—

যতীন বিশ্বয়ের সুরে বলে—আপনি বাংলাদেশের খবর সব জানেন দেখছি।

ককর্ণাদেবী যুহু সন্নেহাস্তে ওকে নেপথ্যে বলেন—ও রকম বোলো না। উনি কে তা তোমারা জানো না। পরে বলবো।

একটা ছোট্ট খাল। একটা আমবাগান। মুর্শিদাবাদ জেলা, সুত্তরাং বনবাগান বেশি নেই, মস্ত বড় মাঠ একদিকে, একদিকে ছোট্ট একটি গ্রাম। যতীন বিশ্বয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেই গ্রামের ঘরের আনাচে-কানাচে অনেকগুলি নিরন্তরের ধূসর ও মেটে সিঁড়রের রঙের আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে—কেউ এ বাড়ী, কেউ ও বাড়ী। তারা যদি মানুষ হতো তবে আনাচে-কানাচে এদের এমনতর গতিবিধি দেখে সন্দেহ হোত এরা নিশ্চয়ই চোর বা ডাকাত।

যতীন অবাক হয়ে বলে—তাই তো, এরা কি করছে এখানে?

পুষ্প হাসিমুখে বলে—আমি বুঝতে পেরেছি অনেকটা, যদি তাই হয়, যা ভেবেছি—

যতীন বলে—কি পুষ্প?

তরুণ দেবতা বলেন—পুষ্প বুঝেছে। ওরা পৃথিবীতে জন্ম নেবার জন্তে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতি রাত্রেই এমনি লোকের বাড়ীর আশে-পাশে ঘোরে। কিন্তু ভিড় বেশি—সবাই সুবিধে পায় না। তৃষ্ণাই পুনর্জন্ম গ্রহণ করায়। ভূবলোকে ওদের ভাল লাগতে না, সেখানে পৃথিবীর স্থূল বাসনা কামনার পরিতৃপ্তি হয় না—সুত্তরাং ওরা চাইতে আবার দেহ ধরতে। কিন্তু তার প্রার্থী অনেক। ওদেরই মত। সুত্তরাং জন্ম নিতে চাইলেও জন্ম নেওয়া হয় না। উচ্চতর আত্মারা বংশ দেখে, পিতামাতা দেখে জন্ম নেওয়ার সময়ে। এদের সে সব নেই, যে কোন বংশ, জাত, কুল হোলেই হোল। দেহ ধারণ নিয়ে কথা।

যতীন বলে—দেব, এরা কতদিন ধরে এমন ঘোরে?

—পৃথিবীর হিসেবে কেউ কেউ দশ বছর পর্যন্ত ঘোরে। এই এক যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা—এই অবস্থাকে প্রেতত্ত্ব বোলো তোমরা। কারো স্বাধীন কাজে আমরা কোনো বাধা দিই না—জীব যখন নিজের ভ্রম বুঝবে তখন সে নিবৃত্ত হবে। যতদিন তৃষ্ণা, ততদিন তাকে বাধা দিয়ে কল হবে না। সে ভূবলোকে ঘোর অসুখী অবস্থায় থাকবে—তার চেয়ে যাও বাপু, পৃথিবীতেই গিয়ে সুখী হও। চলো, এখানে কষ্ট হচ্ছে—আর নয়—

ওরা যেখানে এসে বসলো, সেটা একটা পর্বতশিখর, বড় চমৎকার পাইন এবং দেওদার গাছের নির্জন অরণ্যানী। গাছের ডালে ডালে অগণিত পরগাছায় রঙ-বেরঙের ফুল। পায়ের নীচে পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে আছে, গভীর রাত্রি। আকাশের মাঝখানে চওড়া জল-জলে ছায়াপথ, অসংখ্য ঝকঝকে তারকারাজি। ব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের সঙ্কেত!

তরুণ দেবতা বলেন—এই হোল হিমালয়। বাংলাদেশের ওপরেই—ওই ছাঁখে দূরে একটা নদী নেমেছে পাহাড় থেকে—

যতীন বলে—তা হলে বোধ হয় তিস্তা—

—তুমি দেখলে তো মানুষের অবস্থা ?

—আশ্চর্য লাগলো, এমন হয় তা জানতাম না, দেব। আপনি যাকে মানব-আবর্ত বলেছেন, ওর উচ্চতর অবস্থা কি।

—উচ্চতর সাধনা মানুষকে দেবযান-পথে উচ্চতর লোকে নিয়ে যায়। স্বঃ জনঃ, মহঃ, তপঃ ও সত্যলোক বলেছেন ভারতবর্ষের জ্ঞানী-লোকেরা। এককল্প কাল সেখানে থাকে উচ্চতর জীবাত্মা।

—কল্প কি ?

—প্রত্যেকবার সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি। এই কালব্যাপ্তির নাম কল্প। কল্পান্তে উচ্চতর জীবাত্মারও পতন হয়। তবে সত্যলোকেরও দূরপারে ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত যে ব্রহ্মলোক, সেখানে যারা যান ভগবানের সঙ্গে তাঁরা এক হয়ে যান। মানব-আবর্তে তাঁরা আর ফিরে আসেন না।

—এরই নাম মুক্তি ?

—এঁকেই ভারতবর্ষের ঋষিরা মুক্তি বলেছেন। চলো তোমাকে একটি ভারতবর্ষের প্রাচীন কবির কাছে নিয়ে যাবো। উপনিষদ বলে দার্শনিক কবিতা ভারতবর্ষের, তিনিও তার একজন রচয়িতা। ভ্রাম্যমান কবি, সব সময় পাহাড় সমুদ্রতীরে বনানীর নির্জনতায় কাল কাটান। পৃথিবীর মধ্যে এই হিমালয় এবং আরও অনেক উচ্চতর পর্বতের বনে বৃক্ষ-লতায় প্রায়ই মাঝে মাঝে রূপের ধানে মগ্ন থাকেন। আর মিশর দেশের এক উচ্চ আত্মার সঙ্গে পরিচয় করাবো।

—তা হোলে তো, দেব, পৃথিবীর আসক্তি তাঁর এখনও যায় নি ? অর্থাৎ আমি উপনিষদের সেই কবির কথা বলছি—

—তাঁর আসক্তি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ধ্যান। কোনো পার্থিব তৃষ্ণা নয়। তাই জন-লোকের অধিবাসী, নিজের আনন্দের জন্তে নেমে আসেন পৃথিবীতে। তাঁর আগমনে পৃথিবীর অনেক উপকার। বহু লেখক ও কবিকে অদৃশ্যভাবে প্রেরণা দান করেন, সেই-জন্মেই তিনি পৃথিবীতে আসতে ভালবাসেন। পৃথিবীর হিসেবে বলতে গেলে বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে এ কাজ তিনি করেছেন—তাঁর কাজই ওই। আমার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট বন্ধুত্ব। আমার নিজের কাছে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন আমার।

এবার পুষ্প বিনীতভাবে বলে—দেব, একদিন আমাদের কুটিরে পদার্পণ করবেন দয়া করে ? আপনার বন্ধু সেই তাঁকেও নিয়ে ? পরে দেবীকে দেখিয়ে বলে—ইনিও যাবেন আমার বলেছেন দয়া করে।

তরুণ দেবতা বলেন—যাবো।

পুষ্প তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করে বলে—আমাদের ওপর আপনার এ করুণার জঙ্ঘমবাদ।

যতীন বল্লে—প্রভু, আমার সঙ্গে এক মায়াবাদী সন্ন্যাসীর দেখা হয়েছিল, তিনি তাঁর নিজের শক্তি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করে আমার নির্বিকল্প সমাধিলাভ করিয়েছিলেন, সে এক অপূর্ব অল্পভূতি। সে কথা আমি এখনও ভুলিনি—

—তিনি কোনো যোগী সাধক হবেন। ব্রহ্মে লীন হওয়ার আশ্বাদ ইচ্ছামত ভোগ করেন—মুক্ত পুরুষ। তাঁরা ইচ্ছামত কায়ব্যূহ রচনা করে যে কোনো দেহে অল্পপ্রবেশ করতে পারেন। সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁদের সংকল্প মাত্রেই উপস্থিত হয়—

—প্রভু, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো দেশে এই ব্যাপারের চর্চা ছিল?

—নিশ্চয়ই! যে কোনো দেশে যে কোনো সং, ঈশ্বরে ভক্তিমান লোক মানব-আবর্তকে জয় করতে পারেন। বিধের যিনি কর্তা, তিনি কোনো বিশেষ দেশ বা বিশেষ জাতিকে কৃপা করেন না।

—আচ্ছা আমাদের দেশে যারা বলেন, ভগবানের নাম জপ করলে মুক্তি, যেমন ধরুন বৈষ্ণব সম্প্রদায়, তাঁদের মত কি সত্য?

—ভক্তি দ্বারা তাঁরা ভগবানে আত্মস্থ হয়ে দেবযান প্রাপ্ত হন। জীব মাত্রেই ব্রহ্মের অংশ জানবে। উপাধি ও নামরূপ ত্যাগ করে পরব্রহ্মে লীন হওয়ার নামই মুক্তি। বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন মত। কিন্তু জ্ঞানী লোক ধ্যানদৃষ্টি দ্বারা সেই একই সত্যকে উপলব্ধি করছেন বহু প্রাচীন যুগ থেকে। শুধু এ কল্প নয়, পূর্ব পূর্ব কল্পেও তাই হয়েছিল। পূর্ব পূর্ব কল্পের মুক্ত পুরুষেরা এ কল্পে পৃথিবীতে দেহ ধরে তাঁদের পূর্ব জীবনের সাধনলব্ধ জ্ঞান প্রচার করতে নামেন। তাঁরাই তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, চৈতন্য—বাক্মিক, কৃষ্ণ বৈপায়ন ইত্যাদি—

এই পর্য্যন্ত বলেই তিনি চূপ করে গেলেন। হঠাৎ পূর্বদিগন্তে অরুণ সূর্য্যোদয় দূরদূরান্তরের তুষারাবৃত শৈলশিখর অহুরজিত করে অপূর্ব মহিমায় স্বপ্রকাশিত হোল এক মুহূর্ত্তে। পলকে পলকে শিখর থেকে শিখরান্তরে বর্ণসমুদ্রের বিভিন্ন রঙের ঢেউ গেল ছড়িয়ে। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে মহিমময় সৌন্দর্য্যের দিকে।

করুণাদেবী বলে উঠলেন সাগ্রহে—চলো মানস-সরোবরে—চলো, চলো—

তখন ঠিক পটপরিবর্তনের মত একটা ব্যাপার ঘটে গেল। এই ছিল অরুণরাগে রঞ্জিত শৈলশিখর ও অরণ্যানী, তখন যতীন ও পুষ্প বিশ্বয়ের সঙ্গে দেখলে তাদের সামনে কোনো বিশাল জলাশয়ের নীল জলরাশি বিস্তৃত।

অপরকূলে তুষারাবৃত শৈলচূড়া, সবে প্রভাত হয়েচে কিন্তু সেই তুষারময় মেঘবৎ প্রদেশে কোনো বিহঙ্গকাকলী নেই কোনোদিকে। সমগ্র পার্বত্যভূমির গভীর সৌন্দর্য্য যতীন ও পুষ্পকে মুগ্ধ করলে।

করুণাদেবী বল্লেন—ওই দূরে রাবণভ্রদ, সামনে এটা মানস-সরোবর।

তরুণদেবতা বল্লেন—সামনের ওই পাখাড়ের চূড়া ওরেলা মাঙ্কাতা আর ওই দূরে কৈলাস—পুষ্পের মনে পড়ে গেল কৈলাস পর্ব্বতে অনেক শিদ্ধ মহাপুরুষ লোকচক্ষুর অগোচরে বাস

করেন—ওঁদের কাউকে দেখবার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই আছে তার। করুণাদেবীর কাছে সেকথা তুলতেই তিনি ওরুণদেবতাকে পুষ্পের বাসনা জানলেন।

তিনি বলেন—একজন ভীষণভক্ত সাধু ওখানে আছেন, আমি দু-একবার তাকে সাহায্য করেছিলাম কোনো কাজে। তবে তিনি আমাকে দেখেননি—চলো নিয়ে যাই।

কৈলাসপর্বত ও সমুদ্রবর্তী ওরেলা মাঝাতা চূড়ার মধ্যে বরকের বিশাল ক্ষেত্র—যতীন কখনো গ্রেসিয়ার বা তুষারপ্রবাহ দেখেনি, ওর মনে কথাটা উঠলো, যা সামনে দেখচে, সেটাই বোধ হয় গ্রেসিয়ার। ওরুণদেবতা ওর মনের ভাব বুঝে বলেন—তুমি যা ভাবচো, তা এ নয়। চলো এখান থেকে তোমার শতপঞ্চ বরকস্রোত দেখিয়ে আনবো—

ওরা কৈলাস পর্বতে গিয়ে দেখলে কৈলাস একটি সম্পূর্ণ আলাদা পর্বত, তার তুষারমণ্ডিত পিনাকসদৃশ শিখরের নিম্নভাগে অনেকগুলি গুহা সাধু যোগীদের আবাস। একটি গুহায় একজন শীর্ণকায় সাধুকে দেখিয়ে দেবতা বলেন—এঁর কথা বলছিলাম। উনি এখন স্থলদেহের স্থলচক্ষে আমাদের দেখতে পাবেন না—নিষিক্ত সমাধিস্থ অবস্থায় ইনি ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যান, তখন আমাদেরও অনেক ওপরে চলে যান উনি। তবে স্থল দেহে ওঁরা সাধারণ মানুষের সমান।

যতীন বলে—আচ্ছা, এঁরা একা আছেন কেন ?

—নির্জনতা আত্মার উন্নতির একটি প্রধান উপায়। নিম্নজগতের কোনো প্রভাব এই উত্তম জনহীন পর্বতচূড়ায় এঁদের দেহমন স্পর্শ করে না। নির্জনতায় এঁরা শক্তি অর্জন করেন—ব্রহ্মজ্যোতিঃ এঁদের মনে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে এ অবস্থায়।

—আমি এঁর সঙ্গে দু একটা কথা বলতে পারি ?

—কি করে ? তুমি স্থল দেহ ত্যাগ করেচ, উনি এখন দেহে অবস্থান করছেন। তা সম্ভব নয়।

—আচ্ছা, ওই যে একজন তির্যকী লোক মানস-সরোবরের ধারে বেড়াচ্ছিল তখন, ওরা কি অবস্থায় আছে ? ওদের মুক্তি বা উন্নতি—

দেবতা হেসে বলেন—ওদের থাক্ আলাদা। ওরা নিম্নস্তরের চৈতন্য নিয়ে জন্মেচে—সঙ্কুচিত চেতন। ওরা যরবে, অমনি অল্পদিন পরেই আবার দেহ নিয়ে পৃথিবীতে জন্মাবে, কারণ ভুবলোকে ওদের চৈতন্য মোটেই থাকে না! যদিও থাকে, খুব কম। দেহ না নিলে উপায় হয় না—সুতরাং দীর্ঘ সময় ধরে ওদের প্রায় স্থলদেহেই বর্তমান থাকতে হয়—পৃথিবীর কামনা বাসনার উর্কে ওদের উঠতে অনেক দেরি। সভ্য সমাজেও এমন অনেক আছে—খুনী, দম্ভা, অলস, চোর, পরপীড়ক ইত্যাদি।

করুণাদেবী হেসে দেবতার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে বলেন—এ তুমি খুব ভালই জানো কারণ তোমার হাতের কাজ এটা, কে কতদিন ভুবলোকে বাস করবে কি নতুন জন্ম নেবে। উঃ, দু একটা ব্যাপার এমন নিষ্ঠুর আর করুণ হয়ে ওঠে তখন আমি অমুরোধ করতে বাধ্য হই—

তরুণদেবতা হাসলেন মাত্র—সে হাসির মধ্যে অসীম দয়া, অনন্ত জ্ঞান ও গভীর শক্তির আভাস।

পুষ্প চুপি চুপি দেবীকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, উনি কে ? এই অদ্ভুত দেবতা ?

—উনি ?

পরে হেসে দেবতার দিকে চেয়ে বললেন—এইবার ওদের বলি ?

বলেই চুপ করে গেলেন।

পুষ্প বিশ্বাসের সঙ্গে বলল—আমাদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশচেন ! এত বড় উনি !
অথচ—

দেবতা এবার হেসে এগিয়ে এসে বললেন—মানুষ কি কীট ? তোমরাও তিনি। তোমাদের ঋষিরাই বলেছেন—কিঞ্চৎ ন তু ঙ্গা ভূতাবৎ যাচে, যোহসৌ আদিত্যমণ্ডলস্থো ব্যাহুতাবয়বঃ পুরুষঃ, সোহং ভবামি—আমি ভূতভাবে তোমার সাক্ষাৎকার যাক্রা করচিনে—সবিতৃমণ্ডলে যে ওঙ্কারময় পুরুষ, আমিই সেই। তুমি আমি ভিন্ন কোথায় ? ছোট ভাবো কেন, তাই তো ছোট হয়ে থাকো। বড় হও, বীৰ্যবান হও। সচেতন হয়ে যদি তোমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও দাঁড়াও বিদ্রোহের পথে—সেও ভাল। তার দ্বারা শক্তি অর্জন করবে। যে দুর্বল, তার দ্বারা কি কাজ হবে ? যে শক্তিমান, অথচ বিদ্রোহী—তাকে ঠিক পথে নিয়ে আসতে আমরা জানি।

যতীন কৌতূহলের সঙ্গে বলল—এই যে যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে রক্তারক্তি, ...এও কি আপনার ইচ্ছার অনুযায়ী ?

—তুমি বুঝতে পারলে না। প্রত্যেক ঘটনা মানুষকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। যুদ্ধে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ—এর দ্বারা জাতি শক্তিমান হয়। কি হয় যুদ্ধে ? মানুষ মারা যায়। মানুষের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। এই তো ? কিন্তু মৃত্যুর অসত্যতা এতদিনে তুমি নিশ্চয় বুকেছ। আরামের অত্যন্ত সুযোগ মানুষকে অলস, পশুবৎ করে তোলে। আমার পৃথিবী কতকগুলি আরামপ্রিয়, রোমন্থনকারী, নিজের অবস্থার মহাপরিভূষ্ট গোকুর দলে ভ'রে তুলতে আমি চাইনে। শক্তিমান হয়ে উঠুক সব। কে কা'কে মারচে ? সব মিথ্যে। হৃদনের আরাম কিসের ? অনন্ত বিশ্ব তোমাদের পায়ের তলায়। সংকল্পদেব তৎশ্রুতেঃ, যা যখন ভাববে, মুক্ত পুরুষে তাই তখন পায়। পৃথিবীর স্থল বাসনা কামনাকে জয় করে—আরামের ইচ্ছা মন থেকে তাড়াও। নয়তো ঘুমিয়ে পড়বে।

করুণদেবী বললেন—এদের বৃহস্পতি গ্রহের দুই উপগ্রহে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দাও না ?

—দেখাবো ! সে দুটো বীরগাঙ্গী জগৎ, যারা পৃথিবীতে সুবিধেমন উন্নতি করতে পারচে না, আমরা তাদের ওই সব মহুরগতি জগতে পাঠিয়ে দিই জন্ম নিতে। সেখানে গেলে আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখবে।

করুণাদেবী বললেন—ওদের এখন নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিই—

আবার মানস-সরোবর ও হিমালয় ওদের পায়ের তলায় দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

আবার অসীম বোম—অন্ধকারে ডুবে পৃথিবী দিগন্তহীন আকাশে অদৃশ্য হোল। আকাশের অজুত দৃশ্য, দিনমানে সব দিক নক্ষত্রযুক্ত।

তারপরে নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় প্রাবিত আকাশপথে এক বিশাল মহাগ্রহ ওদের দিকে যেন দ্রুত ছুটে আসচে। করুণাদেবী বলেন—বৃহস্পতি!

কিন্তু বৃহস্পতি খুব বড় মশালের আলোর মত ওদের দক্ষিণে দূরে পড়ে রইল! ওরা অল্প একটি ক্ষুদ্র পৃথিবীর খুব নিকটে এসে তার বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়লো।

যতীন বলে—কিসে যেন পড়েছিলুম, পৃথিবী ছাড়া সোনার সিস্টেমের অল্প কোনো কিছুতে মানুষ নেই!

গ্রহদেব বলেন—সে সব কথা এখন থাক। এই পৃথিবীটা দেখে নাও আগে—

পৃথিবীর মত অবিকল সে স্থান, খুব বেশি ফুল, ছোট বড় নদী। বসন্তের হাঁড়রা বইচে, বিহঙ্গের সুস্বর সর্বত্র, নির্মল জলাশয়। গ্রহটির একদিকে রাত্রির অন্ধকার, অল্পদিকে দিবসের আলো। যে অংশে ওরা গেল সেখানে মানুষের কর্মব্যস্ততা নেই, নিশ্চিন্ত মনে সকলে নিজের নিজের বাড়িতে বসে আছে। গৃহস্থাপত্য অতি সুন্দর, সব রকম শিল্পকলার অদ্বুত উন্নতি হয়েছে সেখানে, দেখেই মনে হোল, সর্বত্র সঙ্গীত, বাজ, নৃত্য। অত্যন্ত সুন্দরী মেয়েরা বনে উপবনে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে পরম নিশ্চিন্ত মনে, যেন তাদের হাতে অতি সুদীর্ঘ অবকাশ, যেন সারা দিনমান শুধু কমলের বনে অলস পাদচারণ জীবনের সব মুহূর্তগুলি ভরে দেবে অমৃত। শান্ত ও অপরূপ সৌন্দর্যের রূপায়ন সে পৃথিবীর সুস্বামল শম্পাস্থত প্রান্তরে, ফুলকোটা বনে ঝোপে, গন্ধে ভরা কুঞ্জতলে। বৃহস্পতির আলো পড়ে যে অংশে রাত্রির অন্ধকার, সে অংশের শোভাও চমৎকার—তবে সমগ্র পৃথিবীটি একটি নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব শান্তির গভীরতায়, বাস্তবতাহীন জীবনমুহূর্তগুলির পুঞ্জীভূত ভারে যেন ঘুমিয়ে আছে, এলিয়ে আছে, কিসের অলীক স্বপ্নে দিনরাত্রি বিভোর।

করুণাদেবী বলেন—এই দেখ যে পৃথিবীর কথা তোমায় বলেছিলাম।

—ম্নো—মানে দীর্ঘগামী পৃথিবী?

করুণাদেবী হেসে ফেলতেই যতীন অপ্রতিভ হয়ে বলে—না, ইংরিজিটা আপনি হয় তো জানেন কি না—মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ও ভাষা কি আপনারা—মানে স্লেচ্ছ ভাষা—

গ্রহদেব বলেন—তুমি এখনও বুঝলে না। আমাদের কোনো ভাষা নেই, যখন যে পৃথিবীতে, যে মানুষের সঙ্গে কথা কই—তাদের ভাষাই আমাদের ভাষা। পৃথিবীতে প্রচলিত যে কোন ভাষাই হোক—তা আমাদের আপন। ইটালী দেশের কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় তাদের ভাষাতেই বলবো—

—আপনাদের মধ্যে কথাবার্তা তা হোলে কি ভাষায়—কেন, বাংলাতেই তো আপনাদের মধ্যে বলছিলেন?

করুণাদেবী বলেন—মুখ দিয়ে কথা বলার দরকার হয় না কোনো স্বর্গেই—চতুর্থস্তরের

ওপরে কোথাও। মনের মধ্যে পরস্পরের কথা ছুটে ওঠে—আরও ওপরে স্বর্গে রত্নী আলোর বিজ্ঞানশিখার মত আলোর ভাষায় আদানপ্রদানে কথাবার্তা চলে। আমাদের ভাষা তোমাদের মত “কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো” তা হয় না। মরমেই আগে পশে—কান শুনতেই পায় না—শোনবার দরকার হয় না। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হচ্ছে বলেই আমরা মুখের ভাষা ব্যবহার করি।

পুষ্প বল্লে—এই পৃথিবী কিন্তু আমার বেশ লাগচে। একটু বেড়ানো গেলে মন্দ কি ?

বৈষ্ণব বল্লে—বেশ তো, ভাল করেই দেখতে পারো।

এক হ্রদে কতগুলি সুসজ্জিতা নরনারী নৌকাতে প্রমোদবিহার করছিল। দেবতা সেখানে গিয়ে বল্লে—ক’বছর এরা এমনিধারা জল-বিহার করচে জানো ? তোমাদের পৃথিবীর মাপে তিনটি বছর। তাড়াতাড়ি নেই কিছু এদের।

যতীন সবিস্ময়ে বল্লে—তিনটি বছর !

—ঐ যে বল্লাম ; ধীরে স্বস্থে এখানে সব হয়। নৌকাতে জলবিহার চলচে তো চলচেই !
ওদের গিয়ে বল যদি, বিস্মিত হবে।

যতীনের মনে পড়ে গেল বাল্যে কলেজের ক্লাসে পড়া টেনিসনের কবিতার সেই মৃণাল-ভোজীর দেশ বা Land or Lotus-eaters ! ..সেখানেও সব লোক—

পরে কার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে ভেবে সে লজ্জার চূপ করে গেল।

দেবতা বল্লে—চলো আরও দেখবে।

এক পা’হাড়ের শ্রাম সাহুতে বনপুষ্পবিকশিত নির্জন অঞ্চলে সে দেশের কবিকুলের মজলিস বসেচে। সেখানে সুদীর্ঘসময়-ব্যাপী গোধূলিতে তারা আরামে কাব্য আলোচনা করচে, পরস্পর পরস্পরকে আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে নৈসর্গিক শোভা, বনপুষ্পের লাবণ্য সযত্নে নানা কবিতা। নারীপ্রেম নিয়ে কত সঙ্গীত রচনা করে বাস্তবজ্ঞের সাহায্যে অতি সুকুমার মাধুর্যের সঙ্গে ললিত স্বরে গাইচে—ধেন জীবন অনন্ত, সময় অনন্ত। সে সঙ্গীতের ঘুমপাড়ানি মাধুর্য্য সত্যিই চোখে ঘুম নিয়ে আসে, শুনে যতীনের সত্যিই মনে হচ্ছিল দিগন্তের পাড়ুর শোভা শৈলসাহুতটে যে শান্তি ও শ্রী বিস্তার করচে তাতে সব ভুলিয়ে দেয়, জীবনের যুদ্ধ অবাস্তব কাহিনী—জীবন শুধু এমনি নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব গোধূলি দিয়ে ভরা—আর কোথাও ছুটোছুটি করে কি হবে, এখানেই ঘুমিয়ে পড়া যাক্ দিবি।

যতীন বল্লে—আমাদের পৃথিবীতেও এরকম নেই কি দেব ?

—আছে, সে অল্প রকম। এরা এদেশের বসন্তকাল ব্যোপে এরকম উৎসব চালাচ্ছে—
এদের বসন্তের স্থায়িত্ব কত জানো ? ন’বছর পৃথিবীর হিসেবে।

যতীন হাঁ করে অবাক হয়ে চেয়ে রইল দেবতার মুখের দিকে।

করুণাদেবী ওর বিস্ময় দেখে কৌতুক অহুভব করলেন। বল্লে—নইলে তোমার ভাষায় স্নো ওয়াল্ড্ হবে কি করে ?...

ও আরও অবাক হয়ে বল্লে—বা রে, আপনি যে ইংরাজি—

—সব ভাষাতেই কথা বলতে পারি আমরা, বললাম যে। ভাষা কিছুই নয় আমাদের কাছে। তারপর শোনো, এদের বছর কতদিনে জানো? পৃথিবীর ষাট বছরে এদের দেশের এক বছর। ঐ দেহ-বৃহস্পতি গ্রহ ঘুরচে কত আশ্বে আশ্বে। সূর্য থেকে যে গ্রহ যত দূরে, তার আবর্তন তত সো। আবার এই উপগ্রহের একটা নিজস্ব আবর্তন আছে নিজের কক্ষে—সব মিলিয়ে দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি, দীর্ঘ পথ, দীর্ঘ বছর এখানে। মাল্লুগু ধীর গতিতে চলে, বহু সময় নিয়ে কাজ করে, বহু সময় নিয়ে আমোদ করে, বদলায় অনেক সময় নিয়ে। পৃথিবীর মত তাড়াহুড়ো নেই, ব্যস্ততা নেই।

—এদের আয়ু?

—তিনশো বছর প্রায়, তোমার পৃথিবীর হিসেবে। ধীরগামী আত্মা, পৃথিবীর পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সে যারা উন্নতি করতে পারে না, কিন্তু বৃদ্ধত পারবে না—এখানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়ে দেওয়া হয়। এখানে তারা যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা আছে।

—কি রকম ব্যবস্থা বড় জানতে ইচ্ছে হচ্ছে—

দেবতা হেসে বলেন—করুণ ব্যবস্থা কিছু নেই, পৃথিবীতে যেমন আছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যাধি, মহামারী, বিপ্লব, ভূত্বিক। এখানকার মাল্লুগেরা একটু অলস, একটু ধীর-বুদ্ধি—এদের ওপর দয়া করতে হয় অনেকখানি। সবই তাঁর ব্যবস্থা (এখানে গ্রহদেবের মুখশ্রী শ্রদ্ধায়, সম্মানে, ভক্তিতে কোমল হয়ে ওঠে), তিনি তাঁর অসীম করুণায় এ ব্যবস্থা করেচেন—আমরা তাঁর নিয়োজিত ভূত মাত্র। এ কি দেখচো। এর চেয়েও ধীরগামী জগৎ আছে, তবে এ সৌর-মণ্ডলে নয়। তিনিই এই সব অলস জড়বুদ্ধি জীবের জগতে উচ্চস্তরের দেবদূত পাঠিয়ে দেন, তাঁরা দেহ ধারণ করে আসেন এদের শিক্ষা দিতে। তাঁরাই এ সকল পৃথিবীর শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, খ্রীষ্টচৈতন্য, শঙ্কর, ব্যাস দ্বৈপায়ন—সবাইকে তাঁর লীলাসহচর না করে নিলে তাঁর স্মৃতি নেই। তাঁর অপার অনন্ত করুণার কথা তোমরা কি জানো? কেবল হুঃখ হয় মাল্লুগে তাঁকে আগাগোড়া ভুল বুঝছে। কে তাঁকে জানে বা জানবার চেষ্টা করে? মাল্লুগ যদি এক পা এগিয়ে যায়, তিনি তিন পা এগিয়ে আসেন মাল্লুগের দিকে। অথচ সবাই নিজেকে নিয়ে উন্নত, পৃথিবীর স্মৃতি নিয়ে দিশাহারা—তিনি উদাসীন, কেউ তাঁকে চায় না দেখে অপেক্ষা করে করে দোর থেকে চলে যান। কেউ গ্রাহ্যও করে না। জগৎজোড়া বনফুলের মালা তাঁর গলায়—অথচ—

পুষ্পের চোখে জল এসে গেল গ্রহদেবের অপূর্ণ কর্তৃত্বের। সে হাত জোড় করে বলে—প্রভু, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

গ্রহদেব তখনও আত্মস্থ বিভোর অবস্থায় বলেই চলেচেন আগের কথার জের টেনে—

—দেখ, তোমরা পৃথিবীর ছেলেমেয়ে। আমি তোমাদের ভালবাসি, কারণ তোমাদের জন্মজন্মান্তর নিজের হাতে গড়ে তুলেছি। তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান অসীম শূন্যে খোলা রয়েছে, আশ্চর্যের বিষয় সে দিকে কেউ চায় না। সবাই অন্ধ। নরক থেকে বাঁচতে চাই, কিন্তু পারিনে। অন্ধের মত ছুটে যায় সেদিকে। ঠুকে দেখ—উনি সত্যলোকেরও উর্দ্ধতন স্তরের

দেবী, কিন্তু নিজের সুখ চান না। পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের দুঃখে প্রাণ কাঁদে বলে কোনো উর্দ্ধ লোকেই থাকতে পারেন না। উনি সৌরমণ্ডলের সমস্ত জগতের মা। তোমরা কি আমাদের দেখা পেতে? আমাদের দেখার মত চোখ পেয়েচ শুধু ঠাঁর রূপায়। নইলে ঠাঁর নিজের স্তরে উনি জনঃ, মহঃ, তপঃলোকের জীবের অদৃশ্য। এখানে কোনো লোকের অধিবাসী তাদের উর্দ্ধ লোকের অধিবাসীকে দেখতে পায় না—দেখা সম্ভব নয়। ওই মেয়েটিকে ভালবাসেন বলে আজ তোমাদের এই সব সৌভাগ্য। উনি আমারও উর্দ্ধ লোকের দেবী, দয়া করে আমায়—

করুণাদেবী সলজ্জসুরে বল্লেন—পুষ্প, শোনো তবে—উনি কে জানো? উনি গ্রহদের বৈশ্ববর্ণ। তোমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা। যুগযুগান্তর থেকে তাঁর নির্দেশমত উনি তোমাদের পৃথিবী পরিচালনা করছেন। পূর্ব কল্পের দেবতা উনি। তারও পূর্ব কল্পে উনি দেবধান পথে জন্মমৃত্যুর আবর্ত অতিক্রম করেন—বহুদূর পথের যাত্রী উনি। ঠাঁর স্বরূপে ঠাঁকে সত্যলোকের জীবেরাও দেখতে পায় না—চোখ ঝলসে যায় ঠাঁর তেজে। দয়া করে তোমাদের দৃষ্টির উপযুক্ত কায়া ধারণ করে দেখা দিলেন তাই দেখতে পাচ্চ।

সম্মুখে, বিশ্বয়ে, ভয়ে ও ভক্তিতে ক্ষুদ্র পৃথিবীর ছেলে-মেয়ে পুষ্প ও যতীন একেবারে নির্বাক হয়ে রইল। পুষ্প কি প্রশ্ন করতে চেয়েছিল তা ভুলেই গিয়েছিল, এই সময় মনে আসতে সে আবার হাতজোড় করে বল্লেন—প্রভু, আমাদের জন্মান্তরে কত সৌভাগ্য ছিল যে আপনাদের সাক্ষাৎ...একটা প্রশ্ন আমার আছে—

বৈশ্ববর্ণ বল্লেন—আমাকে ধন্যবাদ দিও না পুষ্প। রুতজ্ঞতা জানাও সেই মহামহেশ্বর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিদেবতা যিনি, তাঁকে। আমরা তাঁর ভূতাদের নির্দেশে চলি—তাঁর দাসদাস। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁর ইচ্ছিতে চলে—অথচ কে জানে তাঁকে? তোমাদের পৃথিবীর জ্ঞানী লোকেরা জানতেন—তাই বলে গিয়েছেন—অশ্রু ব্রহ্মাণ্ড সমস্তঃ স্থিতান্তেতাদৃশ্যন্তনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জলন্তি—এই ব্রহ্মাণ্ডের আশেপাশে এই রকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আবরণের সহিত প্রজলন্ত অবস্থায় অবস্থিত। সে সব ব্রহ্মাণ্ড আমিও দেখিনি। তুমি যে পথিকদেবতার সাক্ষাৎ পেয়েছিলে, তাঁর মত বিয়াট দুর্ধর্ষ আত্মারা তাঁর রূপায় বহু সৌরমণ্ডল, বহু নীহারিকা, নক্ষত্রজগৎ অতিক্রম করে এই অনন্ত বিশ্বে ঘুরে বেড়াবার অধিকার ও শক্তি পেয়েছেন। বিগত কল্পে আর-একজন এমন দেবদূতকে আমি জানতাম—তিনি পৃথিবীর এক আবর্তকাল অর্থাৎ প্রায় বাইশ হাজার বছর ধরে বিদ্রোহের অপেক্ষাও দ্রুত-গতিতে পরিভ্রমণ করেও শুধু আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডটার কুলকিনারা পান নি। তা ছাড়াও তো অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জলন্তি—কোথায় তার ঠিকানা, কোথায় তার কুলকিনারা, কোথায় তাদের সীমা! এখন ভাবো, এই সমুদ্র বিশ্ব ধীরে ইচ্ছিতে চলেচে—পৃথিবীর ছেলেদের খেলবার ক্রীড়নকের মত বন্ বন্ করে ঘুরচে—তাঁকে কে জানতো যদি তিনি নিজের দয়ায় রূপা করে—

পুষ্প অনেকক্ষণ থেকে যে প্রশ্ন করতে চাইছিল, এবার তার সুযোগ পেয়ে মরীয়ার সুরে বলে—প্রভু, আমিও ঐ প্রশ্ন করতে চেয়েছিলুম—আপনি অস্ত্রধারী, বুঝতে পেরেই তার উত্তর দিলেন। আমিও জানতে চাইছিলুম ভগবানকে আপনি কি দেখেছেন? দয়া করে আমার এই কৌতূহল—

করুণাদেবী এবার উত্তর দিলেন, কারণ গ্রহদেব তখন আপন ভাবে বিভোর। বিশ্বের ভগবানের কথা মনে ওঠাতে অন্ধ প্রশ্নের দিকে তাঁর মন ছিল না, যদি মন নামক অতি ক্ষুদ্র মাল্লুধী ইন্দ্রিয় তাঁর মত বিরাট দেবতাকে আরোপ করা চলে। বলেন—না পুষ্প, উনি দেখেন নি। আমিও দেখি নি। অথচ তাঁকে অনুভব করেছি। তিনি কোথায় নেই? বিশ্বের প্রতি বাষ্পকণায়, জ্যোতিঃকণায়, পৃথিবীসমূহের প্রতি তৃণে প্রতি ধূলিকণায় তিনি। তিনি আছেন তাই আমরা আছি, তোমরা আছ, বিশ্ব আছে। তিনি সকলেরই। তুমি চাও, তোমার—আমি চাই, আমার।

গ্রহদেব বলেন—পুষ্প, বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বুঝতে যেওনা। পারা যায় না। সে ইন্দ্রিয় তোমাদের নেই—তবে শুধু তাঁকে ভালবাসা দ্বারা মন ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করে এমন ভূমি লাভ করা যায় যে-ভূমি থেকে তাঁকে অনুভব করা যায়। নয় তো যার সে ক্ষমতা নেই—সেও যদি আকুল হয়ে ডাকে—তার মন ও বুদ্ধির গম্য হয়ে নিজেকে খুব ছোট করে সে ভক্তকে তিনি দেখা দেন। পৃথিবীতে কত লোক ইষ্টরূপে তাঁকে ভজনা করে! ছোট্টর কাছে ছোট হয়ে দেখা দেন তিনি—কত কৃপা তাঁর! কিন্তু যে রূপ তাঁর নিজের—সে রূপে তাঁকে কে দেখতে পায়—

—প্রভু, কেউ কি পায় না?

—ব্রহ্মলোকেরও বহু উর্ধ্বে তাঁর নিজের লোক। দেখি নি, তবে জ্ঞান দ্বারা অনুভব করতে পারি। সেখানে হাজার হাজার কল্পের পূর্বেকার মৃত আত্মারা আছেন—কখনও দেখিনি তাঁদের। তাঁরা মহাশক্তিধর, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় করবার ক্ষমতা রাখেন। তাঁরাই তাঁকে স্বরূপে হয়তো দেখেন। কিন্তু মানুষের রূপে দেখতে চাও, তুমিও পাবে। ভক্তি করে চাও। অত বড়ও কেউ নেই, আবার অত ছোটও কেউ নেই।

যতীন বলে—প্রভু, এই পৃথিবীর মানুষে ভগবানকে জানে?

—সব পৃথিবীর অবস্থাই সমান। সত্য জানতে চায় ক'জন? এখানে তো দেখচো, ইন্দ্রিয়জ সূত্র নিয়ে সবাই মত্ত। সেই বিরাট মহাশক্তির ধারণা করা এদের পক্ষে সহজ নয়। অবশ্য এরা পৃথিবীর জীবের চেয়ে অধিকতর জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। বহুকাল, যুগ-যুগান্ত কেটে যাবে এদের সমস্ত জড়তা, মনের মালিগা দূর করে সে ধারণা উদ্ধুদ্ধ করতে। কিন্তু বিশ্বের ভগবানের অসীম ধৈর্য। কাউকে তিনি অবহেলা করেন না। তবে অনেক দেরি হয়ে যাবে। যারা নিরলস আত্মা, আধ্যাত্মিক জ্যোতি যাদের মধ্যে জ্বলচে স্বরশ্মি মহিমায়, তারা এক জন্মেই ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখে। যেমন বলেছিলেন তোমাদের গ্রহের এক প্রাচীন কবি—বেদাহমেতৎ পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমঃ পরমং—আমি অন্ধকারের ওপারের সেই আদিত্যবর্ণ মহান

পুরুষকে জেনেচি—ওগো শোনো সবাই শোনো—শৃঙ্খল বিশেষ অমৃতত্ত্ব পুত্রাঃ। কত আনন্দ! আনন্দের ভাগ সবাইকে না দিলে যেন চলচে না। কিন্তু ভাবো, ক'জন সেজ্ঞাতো ব্যগ্র? আদিভাব্য পুরুষকে না জানলেও তাদের জন্মের পর জন্ম, যুগের পর যুগ, এমন কি কল্পের পর কল্প পরম আরামে অন্ধের মত কেটে যাচ্ছে চির-অন্ধকারে। তার ওপারে কি আছে কে সন্ধান রাখে?

যতীনের মনে একটা প্রশ্ন জাগলো। প্রশ্নটা সে করলে—তাদের মত অসীম শক্তিদর দেবতা রূপা করলে তো একদিনে সব উদ্ধার হয়! সত্যের প্রচার করে দিলেই তো হয়।

দেবতার মুখে অমুক্তপার হাসি ফুটে উঠলো। বলেন—তা কি হয়? যে পৃথিবী যে সত্যের জন্তে প্রস্তুত নয়, যে মানুষকে যে কথা বলে সে বুঝবে না—সেখানে সে সত্য প্রচার করা হয় না—সে মানুষকে সে কথা জোর করে শোনানো হয় না। স্বাভীনক্ষত্রের জল কিছুকে পড়লে মুক্তা হয়—কিন্তু ধূলোয় পড়লে?...ভগবান মহাজ্ঞানী। যা হয় না, তা তিনি করেন না।

পুষ্প বলে—তবে মানুষের মুক্তি কেমন করে হবে?

—মানুষ যখন স্বেচ্ছায় এগিয়ে যাবে। তাঁর প্রতি উন্মুখ যে মন, সে মনের সকল ভ্রান্তি তিনি ঘুচিয়ে দিয়ে সত্যের প্রদীপ জালিয়ে দেন।

—দেব, সহজ কথার বলুন আমরা কি করবো? আমাদের কি কর্তব্য?

—অমবে বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি—তাকে জেনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হবে।

—কি ভাবে প্রভু? মৃত্যুকে অতিক্রম করা মানে কি?

—সাধারণ মানুষের মরচে, আবার জন্মাচ্ছে, আবার মরচে। এ'কে বলে মানব-আবর্ত। এ'কে জয় করাই মৃত্যুকে অতিক্রম করা। তাঁকে না জানলে কিছুতেই এ আবর্ত এড়ানো যায় না। নান্তুঃ পন্থা বিজ্ঞতেহয়নায়—আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

—পথ বলে দিন দেবতা—আমরা শরণাগত।

গ্রহদেব গম্ভীর মুখে বলেন—তাকে ডাকো, তাঁর কাছে আলো ভিক্ষা চাও। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর সর্বদা। পরকে ভালোবাসো। যেখানে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, ক্ষমা—সেখানে তিনি। তিনিই তাঁকে ব্যবহার শক্তি দেবেন। তাঁর জন্তে যে সর্বত্যাগী, তাকে হাত ধরে তিনিই নিয়ে যান। পরের জন্তে যে সর্বত্যাগী, তাকে হাত ধরে তিনিই নিয়ে যান।

—এই মানুষের ধর্ম?

—এর চেয়ে বড় ধর্ম নেই পৃথিবীর মানুষের। যারা নিরলস হয়ে তাঁকে ডাকে, ভালবাসে—পরের সেবা করে, এক অমানব পুরুষ তাদের হাত ধরে দেবযানপথে জন্মমৃত্যুর দুস্তর অকুল মহাসমুদ্র পার করে নিয়ে যান। ভগবান নিজেই সেই অমানব পুরুষ, অপার করুণায় যিনি নিজেই এগিয়ে এসে হাত ধরেন অসহায়ের, শরণাগতের। পৃথিবীর সৃষ্টির আদিকালের বাণী এ। কারণ যা সত্য, তা চিরযুগেই সত্য—এই একই বার্তা যুগে যুগে পৃথিবীতে প্রচার করা হয়েছে, মৃতের পর মৃত এসেচে গিয়েচে, ‘অন্ধ জাগো!’ না—কিবা

রাত্রি কিবা দিন! চোখ আছে, কেউ দেখে না; কান আছে কেউ শোনে না!

ওরা সে পৃথিবীর একটি সুরম্য হৃদ-মত জলাশয়ের ধারে বসেচে। যতীন চেয়ে চেয়ে দেখছিল, ওদের দক্ষিণে পৃথিবীর দেবদারুজাতীয় বৃক্ষের মত এক প্রকার ঘন সবুজ বৃক্ষের সারি, কিন্তু তাতে খাবা-দোপাটির মত রঙীন ফুল এত ফুটেছে যে, বড় বড় শাখাপ্রশাখা নির্খল ক্ষটিকের মত জলরাশির কূলে কূলে হয়ে পড়েচে। বেলা উত্তীর্ণ হয়েচে, নীলরক্ত দিগন্তরেখার দিকে চেয়ে হঠাৎ সে দেখলে বিশালকার এক দশমী কি একাদশীর চন্দ্র উদয় হচ্চে। অত বড় চন্দ্র। আকাশের এক দিক জুড়ে আলোয় আলো করে তুলেচে সারা দিক-চক্রবাল।

সে অবাক হয়ে বলে—ও কি রকম চাঁদের মত ওটা—অত বড়—

করুণাদেবী হেসে বলেন—বৃহস্পতি। ওর জ্যোৎস্না পড়বে এখন। পৃথিবীর জ্যোৎস্নার চেয়ে অনেক বেশি জ্যোৎস্না আর অদ্ভুত শোভা। আর একটা ব্যাপার, তোমাদের পৃথিবীর মত অমাবস্যা এখানে নেই, উপগ্রহের ক্ষুদ্র দেহ অতবড় বৃহস্পতি গ্রহকে ঢাকতে পারে না, সুতরাং সপ্তমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত বলা হয়—কিন্তু হুবৎসর ধরে শুক্লা রাত্রি চলে।

সে মুগ্ধ হয়ে গেল এই সুদূরতর পৃথিবীর অদ্ভুত জ্যোৎস্নাময় রজনীর শোভায়। হৃদের ওদিকে জলজ ঘাসের আড়ালে ওরুদলের ভ্রষ্ট কুসুমরাশি পদদলিত করে একদল পরমা রূপসী নারী জলে নামলো স্নান করতে। কে জানতো আবার এমন সব স্থান আছে, সেখানেও মানুষ আছে! ভগবানের যে কথা গ্রহদেব কিছু আগে বলছিলেন, তাতে তার মন ভরে আছে। যে আদিভাবর্ণ পুরুষের মনস থেকে এই সব পৃথিবী, এই জ্যোৎস্না, পাহাড় পর্বত, বেগু-বীণার স্বাক্ষরের মত সুস্বরা ওই সুন্দরীদের উৎপত্তি, তাতেই লয় কল্লাস্তে, সৃষ্টি আর প্রলয় ধীর নিশ্বাস আর প্রশ্বাস—তিনি কোথায়? কে তাঁকে জানে? কি ভাবে তাঁকে জানা যায়? কে দেখিয়ে দেবে তাঁকে?

হঠাৎ চমক ভেঙে সে দেখলে তারা তিনজনে মাত্র আছে। গ্রহদেব বৈশ্ববর্ণ কখন অন্তর্হিত হয়েছেন। করুণাদেবী বলেন—উনি এ সব পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না।

পুষ্প বলে—আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, ওঁর দেখা পেয়েছি—অবিশ্বি আপনার দয়ার।

ফেরবার পথে আকাশে উঠে পুষ্পকে দেবী দেখালেন, পৃথিবীটার চারিদিকে আকাশে কুয়াসার মত, মেঘের মত পিঙ্গল প্রভায় আবেষ্টিত করে রেখেছে কি সব। বলেন—পৃথিবীর তাবৎ অধিবাসীদের বাসনা কামনা মেঘের মত জমা হয়েচে ও বায়ু-মণ্ডলে। ওদের কাছে অদৃশ্য, যেমন আমরা ওদের কাছে অদৃশ্য। তোমাদের পৃথিবীতেও আছে এই রকম—এর চেয়েও বেশি। এই সব ঠেলে আমাদের যাতায়াত বড় কষ্টকর—তোমাদের পৃথিবীর শহর-গুলোতে তো আরও বেশি। টাকার নেশা, সুরার নেশা, রূপের নেশা—ওর আকাশ ধূসর বাষ্পে ছেয়ে রেখেচে—তাতে বিষ আছে, আমাদের পক্ষে সে ঠেলে যাওয়া কত কষ্ট! কি করি, পৃথিবীর মত স্থূল দেহের আবরণ তৈরি করে যেতে হয়। কিন্তু গেলে কি হবে,

আমাদের পর্যাপ্ত বুদ্ধি আছেই করে ফেলে, ভালভাবে কিছু দেখতে পাইনে, নিজের স্বরূপ আবৃত করে গিয়েও কিছু করতে পারিনে। যাও তোমরা তাহলে...

ওদের পায়ের তলায় বুড়োশিবতলায় ঘাটে দেখা গেল দিবা ছপুরবেলা। দূর পৃথিবীর জ্যোৎস্না ছায়াবাজির মত গিয়েছে মিলিয়ে, তার অপরূপ রূপসী জনকলিরতা নারীদের নিয়ে।

যতীন বলে—নাঃ, এতদিনে বৃষ্টি জগৎটা মায়া!

পুষ্প কৌতূহের সুরে বলে—অত বড় দীর্ঘনিশ্বাসটা কেলে যে? ওটা কি দার্শনিক দীর্ঘনিশ্বাস না সেখানকার ওই সুল্লরীদের অদর্শনে—

—যাও, ওসব ভাল লাগচে না। মন বড় চঞ্চল—আমি এখুনি যাবো। আমার মা কাদচেন আমার জন্তে।

—কোন মা?

—আরে, কোন মা আবার? পৃথিবীর এই সেদিনের—

পুষ্প খিল খিল করে হেসে বলে—জগৎটা মায়া বলছিলে না যতীনদা?

যতীন বিরক্তির সুরে বলে—সব তাতেই তোমার ঠাট্টা। আমার ব্যথা আমিই জানি।

—বেশ ভালই। যাও, গিয়ে দেখে শুনে এসো, মায়ের বাছা—আহা!

—তুমিও চলো। পথে নানা বিপদ, চুষ্কুর টেউ—টেউ কখন কি রকম হবে, ওসব আমি বুঝতে পারিনে। শেষকালে আবার কোথায় গিয়ে ঠেলে উঠবো জন্ম নিয়ে, বিশ্বাস কিছু নেই। তার চেয়ে চলো সঙ্গে।

কোলা-বলরামপুর গ্রামে বাঁ বাঁ করচে শরতের দ্বিপ্রহর। নিবিড় বাঁশবনে ঘুঘু ডাকচে উদাস-মধ্যাহ্নবেলায়, বনে বনে তিংপল্লার হলুদ ফুল ফুটেছে। যতীন অনেকদিন পরে বাংলার শরতের এ সুপরিচিত দৃশ্যগুলি দেখলে। বাঁশঝাড়ে সোনার সড়কির মত নতুন বাঁশের চারা ঠেলে উঠেছে, বনসিমতলায় বেগুনি ফুল ফুটে ঝোপের মাথা আলো করচে—বর্ষার শেষে জল মরে যাচ্ছে ডোবায়, পুকুরে নদীতে—তীরের টাটকা কাদায় সাদা বক গেঁড়ি গুলি খুঁজে বেড়াচ্ছে, জলের ধারেই কাশফুলের ঝাড় থেকে হাওয়ার কাশফুলের সাদা তুলোয় মত পাপড়ি উড়চে।

যতীন বলে—কি চমৎকার, পুষ্প! বাংলার সব পাড়াগাঁয়েই এমন। মন খারাপ হয়ে গেল। এর সঙ্গে জীবনের কত স্মৃতি যে জড়ানো! ছেলেবেলায় এমনি শরতে পূজোর ছুটিতে ঝুল-বোর্ডিং থেকে বাড়ী আসতুম...আখো আখো এই গেরস্তর বাড়ীটিতে কি শিউলি ফুলটা তলায় পড়ে রয়েছে! আহা!

পুষ্প বলে—ছপুরের রোদে এখনও শুকোয় নি—ঘন ছায়া কিনা!

যতীন স্বপ্নালস চোখে বলে—কতকাল পরে যেন নিজের মাটির ঘরটিতে কিয়ে এলুম পুষ্প।

এমনি স্নিগ্ধ, এমনি আপন। চলো—

ঘরের মধ্যে বিছানা পাতা—তাতে যতীনের সেই তরুণী মা আঁধারমালা লেপকাঁথা গায়ে শুয়ে ম্যালেরিয়ার ভুগছে। শুধু এখানে নয়, পাশের বাড়ীতেও তাই—জানালার কাছে ছোট তক্তাপোশে আর একটি বৌ শুয়ে জরে এপাশ-ওপাশ করছে, তার পাশে ছুটি ছোট ছোট ছেলে—জরে ধুকছে তারাও। রান্নাঘরে একটি বৃদ্ধা কলাই-এর ডালে সঘরা দিয়েছেন, তারই সুগন্ধ জরাক্রান্ত বাড়ীর বাতাসে। পাশের বাড়ীর বৌটি চিঁচিঁ করে বলছে—একটু জল দিয়ে ঘাও পিসিমা।

বৃদ্ধা বলছে—একা মানুষ কতদিকে যাবো, ক'টা হাত পা? কাল গিয়েচে একাদশী, আর এই খাটুনি। একটু সবুজ করো। গোকু ছুটো সেই কোন্‌ সকালে বেঁধে দিয়ে এসেচি নদীর ধারের বাচ্‌ড়ায়, একটু জল দেখিয়ে আসবার সময় পাইনি এত বেলা হোল।

যতীন এসে ওর নতুন মায়ের বিছানার পাশে দাঁড়ালো। একটু আগে ওর মা ওর কথা মনে করে কৈদেচে জরের ঘোরে। এই ত্রোগত বর্ধায় ও মায়ের কোল ছেড়ে গিয়েচে, সে স্মৃতি ওর মায়ের মনে এখনও অতি স্পষ্ট। চোখের জল গড়িয়ে পড়েচে বালিশের গায়ে। মাতৃহৃদয়ের নিঃশব্দ বাথার অভিযান্ত্রিকি। যতীন বুঝলে, মায়ের এই চোখের জল, বুকের চাপা কান্নাই তাকে আজ সপ্তস্বর্গের পার থেকে টেনে এনেচে এখানে। মাতৃশক্তির আকর্ষণ অদম্য, কেউ তাকে তুচ্ছ করতে পারে না, হোলই বা মাটির ঘরের হৃদনের মা। সব মাই তো হৃদনের।

পুষ্প বললে—যা ভাবচো তা নয় যতীনদা। মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেও না পৃথিবীকে, পৃথিবীর স্নেহ-ভালবাসাকে। তোমার সাধ্য কি এই মাতৃশক্তিকে অবহেলা কর? নিজের নিজের জায়গায় কারো শক্তি কম নয়।

যতীন কৃত্রিম রাগের সুরে বললে—ওঃ এখন যদি সেই সমাধিরাজ সন্নিহিতকে পেতাম—বুঝিয়ে দিতাম তাকে—

—মহাপুরুষদের নামে অমন বোলো না, ছিঃ! তিনি যে ভূমিতে উঠে জগৎকে মায়া দেখেছেন, তোমার সে জ্ঞান কোথায়? যে অবস্থা যার, তাই তার কাছে সত্যি আর সহজ। তোমার কাছে এই সত্যি। বদ্ধ জীব তুমি।

—তাহোলেই পুষ্প, জগৎটা কি কতকটা ভেক্টির মত লাগচে না? বদ্ধ জীব বলে গালা-গালি তো দিচ্চ—

—আবার তোমার বোঝবার ভুল। যাক্‌, ও সব বড় বড় কথা। তিনি যখন বোঝাবেন তখন বুঝো। এখন তোমার মায়ের সেবা করো—আমি যাই পাশের বাড়ীর বৌটির কাছে—জরের ঘোরে বসি করছে ওই শোনো—মাহা!

—তার ওপর বাড়ীতে তো দেখচি এক খাণ্ডার পিস্মাশুড়ী ছাড়া মুখে জল দেবার কেউ নেই—

যতীন বসে মায়ের মাথায় হাত বুঝিয়ে দিতে দিতে ঘরের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে

লাগলো। অতি দরিদ্রের ঘরকন্না, ময়লা কাঁথা, ছেঁড়া মাদুর আর মাটির হাড়িকুড়ির গেরস্থালি। খানিক আগে পাশের ঘরের মেজেতে কে পান্ডাভাত খেয়ে এঁটো থালা-বাসন ফেলে রেখেচে—একটা বেড়ালছানা থালার আশেপাশে ঘুরচে। হয়তো তার মা জর আসবার আগে পান্ডাভাত ক'টা খেয়ে থাকবেন, গরীবের ঘরে জরের উপযুক্ত পথ্য জোটে নি। কেন তাকে পুষ্প নিয়ে গেল এখান থেকে? এই ঘরে মায়ের কোলটি জুড়ে সে বেশ থাকতো। তারপর একদিন স্নেহেদুঃখে বড় হয়ে উঠতো, ভাল চাকুরী করে এই দরিদ্রের ঘরগী মায়ের সেবা করতো। ভাঙা বাড়ী সারাতো, থাকে ভালো ভালো শাড়ী, কানের দুল, হাতের বালা চুড়ি কিনে দিতো, ম্যালেরিয়ার সময় এখান থেকে নিয়ে যেতো দেওঘর মধুপুরে। ওইখানে সজ্জনেতলায় বড় রান্নাঘর তৈরি করে দিত, সানাই বাজনার মধ্যে একদিন বিয়ে করে বোঁ এনে মায়ের বুকে স্নেহের ঢেউ তুলতো, নানা দিক দিয়ে মায়ের শত সাধ পূর্ণ করতো। আজ এই যে অসহায় অশিক্ষিতা পল্লীবধু জরের ঘোরে তাকেই স্মরণ করে কিছুক্ষণ আগেও কৈদেচে—কি অপূর্ণ! স্নেহের অমৃতই ওর বুকে জমা রয়েছে তার জন্তে। এর জন্তে তার মন পিসাসিত—কি হোল তার স্বর্গে গিয়ে? স্বর্গ তো পালাচ্ছিল না?

এই সময় ডাকপিওন বাইরের উঠানে এসে দাঁড়িয়ে বসে—মনিঅর্ডার আছে।

বাড়ীতে আর কেউ নেই, যতীনের মা ধড়মড় করে উঠে বসে—ও শৈল, শৈল—কোথায় গেলি? মাগো, আমায় সবাই মিলে খেলে। কেউ যদি বাড়ী থাকবে—ও শৈল—

রোগিণীর আহ্বানে কোথা থেকে আট দশ বৎসরের একটি বালক ছুটে ছুটে এসে বসে—কি কাকীমা—কি হয়েছে?

—আমার মাথা মুণ্ড হয়েচে। দুপুর বেলা বেয়োর কোথায় সব, বাড়ীতে কেউ নেই—মনিঅর্ডার এসেচে, নে পিওনের কাছ থেকে; আমার এমন জর এয়েচে যে মাথা তুলতে পারচিনে—শৈল কোথায়?

—দিদি তাস খেলচে পাঁচুদের বাড়ী—

বালক মনিঅর্ডারের ফর্মখানা হাতে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকলো। ওর কাকীমা বসে—ক'টাকা?

বালক ঘাড় নেড়ে বসে—সে জানে না। বাইরে থেকে পিওন চেষ্টায়ে বসে—সাত টাকা মাঠাকরন—সইটা করে দেন—

পিওন ফর্ম সই করিয়ে টাকা দিয়ে চলে গেল। বালক টাকা নিয়ে এসে রোগিণীর হাতে দিতে রোগিণী তিন চার বার গুনে গুনে বালিশের পাশে রেখে দিলে। যে ভাবে বোঁটি আদরে যত্নে সতর্কতার সঙ্গে টাকা কয়টি বার বার গুনলে তাতেই যতীনের মনে হোল এই দরিদ্র সংসারে গৃহলক্ষ্মীর কাছে ওই সাতটি টাকা সাতটি মোহর। সে যদি বড় হয়ে মায়ের হাতে থলিভর্তি টাকা এনে দিতে পারতো! আজ সত্যিই তার মনে হোল, পুষ্প তাকে যতই ঠাক্ক, উচ্চ স্বর্গের উপযুক্ত নয় সে। মাটির পৃথিবী তাকে স্নেহময়ী মায়ের মত জাঁকড়ে ধরে রাখতে চায় শত বন্ধনে, তার মনে অল্পভূতি জাগায় এই সংসারের ছোটখাটো সুখদুঃখ,

আশাহত অসহায় নরনারীর ব্যথা। তার এই মাকে একলা ফেলে আশালতাকে নিষ্ঠুর ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে সে কোন্ স্বর্ণে গিয়ে স্বথ পাবে?

যতীনের অদৃশ্য উপস্থিতি ও স্পর্শহীন স্পর্শ ওর মাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করে তুললে। পুষ্প এসে বল্লে—তোমার মাকে ছবি দেখাবো যতীনদা? যেন এক অদৃশ্য দেবতা গুঁর ছেলের মত এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে—মিষ্টি কথা বলচে—দেখাবো?

—পাশের বাড়ীর বোটি কেমন?

—ঘুম পাড়িয়ে এলুম। মাথা ধরেছিল, সারিয়ে দিয়ে এলুম।

—খাওয়ার পিস্শাশুড়ী কি করচে? বুড়িটা?

পুষ্প হেসে বল্লে—পিস্শাশুড়ীর অত দোষ দিও না। বোটির চরিত্র ভাল না।

যতীনের মনে পড়লো আশালতার কথা—সে একটু তিক্তস্বরে বল্লে—মেয়েমানুষ কিনা, তাই অপর মেয়েমানুষের চরিত্রের দিক্‌টাতে আগে নজর পড়ে। কই আমাদের তো পড়ে না? দেখেই বুঝে ফেলে?

পুষ্প বল্লে—তা নয়, ওর মনে সব কথা লেখা রয়েছে আমি পড়ে এলুম। ও চিন্তা করচে ওর একজন প্রণয়ীকে, নাম তার হরিপদ, এই ছপুরে নদীর ঘাটে গিয়ে তার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করার কথা ছিল, জর এসেচে ঠেসে ছপুরের আগেই।

—যেতে পারেননি বলে ভাবচেন বুঝি? আহা!

—হঠাৎ অত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে উঠলে যে ওর ওপর? অত দরদই বা এল কোথা থেকে? জানো, যতীনদা—আমার একটা ব্যাপার হয়েছে আজকাল, লোকের কাছে কিছুক্ষণ বসলে বা থাকলে আমি তার মনের চিন্তা সব বুঝতে পারি। ও বোটির পাশে গিয়ে বসে দেখি ও শুধু কে হরিপদ, তার কথাই ভাবে। যাক্‌ গে, তোমার মা কেমন?

—এখন একটু ভালো। মায়ের মনিঅর্ডার এসেচে সাত টাকা কোথা থেকে। দেখতে যদি মায়ের আনন্দ! পুষ্প, কেন আমাকে নিয়ে গেলে? এ দরিদ্র সংসারের উপকার করতে পারতাম বেঁচে থাকলে। আমি হয়তো চাকরী করে—

—আমি নিয়ে যাই সাধ্য কি আমার? যিনি দীনদুনিয়ার মালিক তাঁর ইচ্ছে না থাকলে—

—তুমি কি দীনদুনিয়ার মালিকের সঙ্গে পরামর্শ করে এ কাজ করেছিলে পুষ্প?

এই সময় যতীনের মা বিছানা থেকে উঠে বাইরের রোয়াকে রোদ্দুরে গিয়ে বসলেন। ম্যালেরিয়া-রোগীর ভাল লাগে রোদ্দুরে বসতে। দুটি প্রতিবেশিনী এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলো যতীনের মায়ের সঙ্গে। একজন বল্লে—জরটা কখন এল আজ বৌ?

—দুটো ভাত খেয়ে উঠেচি, খালা তুলিনি—অমনি সে কি ভূতানন্দি জর। কিন্তু এখন যেন ভালো মনে হচ্ছে। হঠাৎ জরটা আজ যেন কমে গেল।

—হ্যারে, আজ নাকি টাকা এসেচে তোরা? ক'টাকা এল?

—হ্যাঁ দিদি, সাত টাকা।

—বাঁচা গেল! ক'দিন তো একরকম না খেয়ে ছিলি। বটঠাকুর টাকা পাঠাতে অত দেরি করেন কেন? সামনে পূজো—অত দেরি করেই যখন পাঠালেন তখন আরও কিছু—

—কোথায় পাবে দিদি যে পাঠাবে। এই তো সেদিন বাড়ী থেকে গেল। পনেরো টাকা তো মোটে মাইনে—মনিব যে উপাঁজুরে লোক, দু-এক টাকা আগাম চাইলে তা দেবে না। ওরও তো শরীর ভাল না, সবই জানো। সেবার সেই বড় অসুখের পরে আর শরীর ভাল সারলো না। ওই মানুষকে একা পাঠিয়ে যে কত অশান্তিতে ঘরে থাকি—তার ওপর আমার খোঁকা যাওয়ার পর উনি একেবারে—

যতীনের মা নিঃশেষ কঁাদতে লাগলেন। প্রতিবেশিনীরা সান্ত্বনার কথা বলতে লাগলো। একজন বললে—খাও বৌ, রোদ্দুরে বোসো না, বমি হবে। ঘরে শোওগে। কি করবে বলো, সবই অদেষ্ট।

যতীনের মা চোখের জলে ভেজা সুরে বললেন—তোমরা আলীকাদ করো দিদি, উনি ভালো থাকুন। ওই সাত টাকাই আমার সাত মোহর। পূজোর সময় আসতে পারবেন না বলে লিখেচেন কুপনে—সেই কি কম কষ্ট আমার। পোড়ারমুখো মনিব মহালে পাঠাবে খাজনা আদায় করতে—ছুটি পাবেন না—

পুষ্প হঠাৎ বলে উঠলো—আমি বলছি তিনি বাড়ী আসবেন, আসবেন!

যতীন অবাক হয়ে পুষ্পের দিকে চেয়ে রইল। পুষ্পের মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতি ফুটে উঠেছে, ওর কণ্ঠস্বর যেন দৈববাণীর মত শক্তিমানু ও অমোঘ।

কথা শেষ করে যখন পুষ্প ওর দিকে চাইলে তখন পুষ্পের চোখে জল।

যতীন বললে—কি হোল তোমার, পুষ্প?

পুষ্প তখনও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। বললে—সতীলক্ষ্মী উনি—জয় হোক তাঁর। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করো মাকে।

তারপর হুজনে আরও অনেকক্ষণ সেখানে রইল। যতীনের মায়ের জর ছেড়ে যায় নি, তিনি আবার শয্যার গিरे সুরে পড়লেন, কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে তিনি জর কমবার সঙ্গে সঙ্গে নিজজীবভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন।

যতীন বললে—ভালো কথা, মাকে এবার সেই ছবিটি দেখাও না? যেন এক দেববালক তাঁর মাথার শিয়রে বসে মাথার হাত বুলিয়ে দিচ্ছে—এই অবস্থার স্বপ্ন বেশ স্পষ্ট হবে।

পুষ্প বললে—না। কি জানো যতীন দা, ভেবে দেখেছি তারপর। ওসব ছবি যে দেখে, সে সংসার করতে পারে না। মন চঞ্চল হয়ে যায়। পৃথিবীর মন একরকম, ভূবলোকের মন আলাদা। এর সঙ্গে ওকে জড়াতে নেই। ওসব দর্শন হয় কাদের, যারা আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করবে। সংসারী লোকদের অমন ছবি দেখাতে নেই। আমি দেখাতে পারি, তোমার মা জেগে উঠে কঁাদবেন, উদাস হয়ে থাকবেন দিনকতক, সংসারের কিছু ভাল লাগবে না। প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনে মন দিতে পারবেন না। কি দরকার সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে।

যতীন আগ্রহের সুরে বল্লে—নয়তো যাকে একবার ঘুমের মধ্যে ভুবলোকে নিয়ে যাই না কেন ? বেড়িয়ে দেখে আসুন ।

—উনি এখনও তার উপযুক্ত হন নি । কিছু বুঝতে পারবেন না, হয়তো ঠাঁর হৃদয় শরীর অজ্ঞান হয়ে পড়বে সেখানে । সব এক আজগুবি স্বপ্ন বলে ভাববেন । বুঝা পরিশ্রম । চলো যাই, বেলা গেল ।

নিকটেই এক ঝোপে তিপপল্লার হলুদ ফুলে রতীন প্রজাপতির কাঁক উড়তে দেখে ওরা সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো । পুষ্প বল্লে—কি সুলভ, না ? শুঁয়োপোকা থেকে কেমন চমৎকার রতীন জীব তৈরি হয়েছে তাখো । শুঁয়োপোকা মরে যায়, গুটি কেটে প্রজাপতি উড়ে বেরোর ! মাটিতে কত আস্তে চলে শুঁয়োপোকা—আর কেমন তাখো প্রজাপতি নীল আকাশের তলায় ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে । শুঁয়োপোকা কলনা করতে পারে মরবার পরে সে প্রজাপতি হবে ?

যতীন হেসে বল্লে—মাছুষ কলনা করতে পারে মৃত্যুর পর সে বিশ্বের নীল আকাশের তলায় বিদ্যুৎগতিতে উড়ে বেড়াতে পারবে ? শুঁয়োপোকায় মন অন্ধ, মাছুষও তেমনি অন্ধ ।

প্রদোষালোকে স্নানায়মান ধরণী গতির বেগে ওদের পায়ে নীচে কোথায় অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল । সেই ধরণীর এক প্রান্তে যতীনের দরিদ্রা জননী গভীর ঘুমে অচেতন রইলেন, জানতেও পারলেন না তাঁর ভাড়া ঘরে এ অজুত আত্মিক আবির্ভাবের রহস্য ।

সেদিন পুষ্পই প্রথম তাঁকে দেখলে । সেদিন ওরা বৃডোশিবতলার ঘাটে ফিরে আসছিল পৃথিবী থেকে—ফেরবার পথে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের ওপর বসেচে—হঠাৎ আকাশের বিদ্যুৎ-লেখার মত উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করে পুষ্প বল্লে—তাখো তাখো—কোন্ দেবতা আসচেন ! যতীনও দেখতে পেল । একটা বিশাল উঁকা ধেন আগুনের অক্ষরে শূন্তের গায়ে তার বার্তা ঘোষণা করচে ।...

চক্ষের পলকে সেই পথিক দেবতা কায় ধারণ করে ওদের সামনে আবির্ভূত হোলেন । পুষ্প ও যতীন উভয়েই চিনলে—যে দেবতা একবার মহাশূন্তে পথ হারিয়ে ওদের কুটির-প্রান্তরে বিভ্রান্ত অবস্থায় এসে পড়েছিলেন, সেই ভ্রাম্যমাণ আবিষ্কারক দেবতা ।

দেবতা বল্লে—তোমাদের কথা স্মরণ রেখেচি । আবার দেখা করবো বলেছিলাম, মনে আছে কত্কা ?

পুষ্প ও যতীন দেবতার পাদবন্দনা করলে । পুষ্প বল্লে—দেব, আপনি ভ্রমণের গল্প করুন ।

যতীন বল্লে—একটা কথা, দেব । আমাদের পৃথিবীর পণ্ডিতরা অজুমান করতেন আমাদের এই সৌর-জগতের বাইরে অন্য কোনো নক্ষত্রে কোনো গ্রহ নেই । একথা কি সত্য ?

দেবতা হেসে বল্লে—ভুল কথা । বিশ্বের এই অঞ্চলেই বিভিন্ন নক্ষত্রে লক্ষ লক্ষ গ্রহ বর্তমান । বহু শ্রেণীর জীব তাতে বাস করচে । তোমাদের পৃথিবী যতটুকু এর চেয়ে অনেক

বৃহত্তর ও সূক্ষ্মতর এই বিশ্বের এই অঞ্চলে বহু নক্ষত্রে বর্তমান।

যতীন বলে—দেব, বিশ্বের এই অঞ্চল বলে আপনি কতটুকু জিনিসের কথা বলছেন ?

—বিদ্রোহের বেগে যদি যাও, তবে এক কোটি বৎসর লাগবে তোমাদের এই নক্ষত্রমণ্ডল পার হতে। এ রকম লক্ষ লক্ষ নাক্ষত্রিক বিশ্ব ছড়ানো রয়েছে চারিদিকে। আমি বিশ্বের এ অঞ্চল বলতে তোমাদের ছায়াপথের নিকটবর্তী অঞ্চলের কথা বলছি।

পুষ্প বলে—আমাদের একবার নিয়ে যাবেন বলেছিলেন ওই সব দূর দেশে ?

—চক্ষু মুদ্রিত কর। গতির প্রচণ্ড তেজ তোমরা সহ করতে অভ্যস্ত নও—জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। দুজনেই চক্ষু মুদ্রিত করো—প্রস্তুত হও—মধ্যপথের অন্ধ কোনো নক্ষত্র বা গ্রহলোক তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না।

গতির কোনো অল্পভূতিই ওদের হোল না, চক্ষের পলক ফেলতে দত্ত বিলম্ব হয়, ততটুকুও বোধ হয়নি—পথিক দেবতা বলেন—চোখ চেয়ে দেখতে পারো—

পুষ্প ও যতীন সম্মুখের দৃশ্য দেখে চমকে উঠলো। তারা এক কোথায় এসেচে—এক বিরাট অগ্নিমণ্ডল তাদের সামনে—সে অগ্নিমণ্ডলের মধ্যে বহুলক্ষ বিশালকায় কটাহে যেন লক্ষ কোটি মণ ধাতু বিগলিত হচ্ছে একসঙ্গে—লক্ষ লক্ষ মাইল উর্দ্ধে উঠেচে রক্তবর্ণ স্বরশ্রাব বাষ্পশিখা—রক্ত আগুনের শিখার মত। বাল্যকালে জলন্তুত্তর ছরি দেখেছিল যতীন পৃথিবীর পাঠশালার কোন পুস্তকে—এখন ওর চোখের সামনে ধারণার অতীত বিশালকায় অগ্নি ও প্রজলন্ত বাষ্পের খাড়া সোজা উঁচু স্তম্ভ চক্ষের নিমিষে উঠে যাচ্ছে যেন দশ হাজার মাইল, যেদিকে চাওয়া যায় দাঁড় দাঁড় করচে শুধু আগুন—অথচ পৃথিবীর আগুনের মত নয় ঠিক—জলন্ত বাষ্পাংশি হয়তো। অগ্নিমণ্ডলের চারিদিকে স্তম্ভ ও রক্ত আগুনের ছটা—গ্রহণ যোগে দৃশ্যমান সূর্যের চারিপাশে দৃষ্ট সৌরকিরীটের (corona) মত। কোন রক্ত ভৈরবের প্রচণ্ড আবির্ভাব এ! এখানে না আছে নারী, না আছে শিশু, না আছে বনকুসুমের শোভা, না আছে জীবের জীবনস্বরূপ বারি। কিন্তু এই রক্তের বামমুখ প্রত্যক্ষভাবে দেখবার সুর্যোগ ঘটে না কারো—এ ভয়ঙ্কর মূর্তিকে দেখতে পেয়ে অন্তরাগ্না যেমন থর থর কঁপে উঠলো ওদের তেমনি ওদের মনে হোল, এই অদ্ভুত ভয়ঙ্করের আবির্ভাবের ও অস্তিত্বের সামনে তাদের সকল ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণতা এখানকার বাষ্পমণ্ডলের কটাহে বিগলিত বহু লৌহ, তাম্র, নিকেল, এলুমিনিয়ম, কোবাল্ট, প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্যের মতই দ্রবীভূত হয়ে নয় শুধু, বাষ্পীভূত হয়ে যায়—যেমন যাচ্ছে ঐ সব ধাতু নিমেষে নিমেষে তাদের দৃষ্টির সম্মুখে।

দেবতা বলেন—এ একটা নক্ষত্র। কিন্তু কামচারী বা বিদ্রোহচারী না হোলে তোমরা এর বিরাট কীছুই বুঝতে পারবে না। তোমাদের জড়জগতের অবস্থানকালের কোনো মাপকাঠি ব্যবহার করে এ নক্ষত্রের সীমা পাবে না। চেষ্টা করো—চলো—

পুষ্প ও যতীন যে বেগে যেতে ইচ্ছা করলে, তাকে পৃথিবীতে রেলগাড়ীর বেগ বলা যেতে পারে। দেবতা গতির বেগ কমিয়ে ওদের সঙ্গে চলেছেন। ওরা সববেগে যেন উড়ে চলেচে একটা অগ্নির মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে ও একটা জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিশিখার মধ্যে দিয়ে—

ওদের চারিপাশে ঘিরে অগ্নি-দেবতার রক্ত-চক্ষু। বহুক্ষণ ওরা গেল, পৃথিবীর হিসেবে দশ বারো ঘণ্টা। ওদেরও রাস্তা নেই, যাত্রাপথেরও শেষ নেই—মহা অগ্নিসমুদ্রেরও কূলকিনারা নেই।

দেবতা বলেন—তোমরা যদি জড় বস্তুর উপাদানে তৈরি হতে এই জ্বলন্ত নক্ষত্রের বহুদূর থেকে তোমাদের দেহ জ্বলে পুড়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতো—আকর্ষণের বলে সে বাষ্পটুকু এই বৃহত্তর বাষ্পমণ্ডলে প্রজ্বলন্ত অবস্থায় প্রবেশ করে মিশিয়ে যেতো...

পুষ্প বলে—আর সহ করতে পারবো না—আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলুন দেব দয়া করে।

দেবতা প্রশ্ন হেসে বলেন—বিশাল বিশ্বের রূপ সবাই সহ করতে পারে না, দেখতে চায়ও না। শক্তিমতী হও। ভগবান তাকেই এসব দেখান, যে তাঁর বিশ্বের বিরাটত্ব দেখে ভয় খাবে না। আমি সুদীর্ঘ জন্ম-জন্মান্তর ধরে এ সাধনা করেছিলাম—তারপর জড় জগৎ থেকে এসে বহুকাল ধরে শুধু বিশ্বভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি। এই আমার সাধনা—এতে আমি সিদ্ধিলাভ করেছি। কিন্তু আমিই দিশাহারা হয়ে যাই সময় সময়। তোমরা কী দেখেচ, এক কণিকাও নয়।

পুষ্প বলে—আর কী দেখাবেন বলুন দেব, এ আগুনের দৃশ্য আমার আর সহ হচ্ছে না—

—তোমাকে এর চেয়েও বৃহত্তর নক্ষত্রের অগ্নিমণ্ডলে নিয়ে যাবো চলো। শক্তিমতী হও। এবার চোখ চেয়ে চলো। তোমাকে চোখ তখন মুদ্রিত করতে বলেছিলাম কেন জানো? তোমাদের জড়জগতের অতি নিম্নস্তর অতিক্রম করতে হবে আসবার পথে। সে অতি কুশী স্তর। তোমরা দেখলে ভয় পেতে—তাই দেখাই নি।

যতীন আগ্রহের স্বরে বলে—নরক? সে দেখতে বড় ইচ্ছে, দেব! দয়া করে—

দেবতা গম্ভীর স্বরে বলেন—প্রত্যেক জড় জগতের অমনি নিম্নস্তর আত্মিক স্তর আছে। জড় জগতের অপূর্ণ আত্মা ওখানে আসে। পৃথিবীর নরক তবুও ভালো, কারণ গ্রহ হিসাবে পৃথিবীর জীবদের আধ্যাত্মিক প্রগতি অনেক বেশি। তোমাদের দেখে তা মনে হচ্ছে। এমন গ্রহ তোমাদের দেখাতে পারি যেখানকার জীবের চৈতন্য নিম্নস্তরের। তোমাদের পৃথিবীতে তেমন শ্রেণীর জীব নেই।

ওরা অনন্ত ব্যোমের যে অংশ দিয়ে যাচ্ছিল, যতীন তার চারিদিকে চেয়ে কোনো পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডল দেখতে পেলো না—সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ, ধ্রুবনক্ষত্র, এমন কি বৃশ্চিক পর্যাস্ত না! অসীম বিশ্বের কোন্ সুন্দর অংশে তারা এসে পড়েছে যেখান থেকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বা বৃশ্চিক কিংবা ক্যাসিওপিয়া দেখা যায় না। প্রশ্নটা সে পথপ্রদর্শক দেবতাকে করলে।

দেবতা হেসে বলেন—আমি তোমাদের এসব নক্ষত্র চিনি না। তোমাদের জড়জগৎ থেকে চিরকাল দেখে আসচো বলে ওগুলো পৃথিবীর জীবের কাছে সুপরিচিত। বিশ্বের পথিক আমি, আমার কাছে ও-রকম লক্ষকোটি ধ্রুব আর সপ্তর্ষী অগণ্য জ্যোতির্লোকের ভিড়ে মিশিয়ে গিয়েচে।

পুষ্প অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিল আকাশের ওপরদিকে বকের পালকের মত বহু-দূরব্যাপী রঙীন মেঘরাশি এক জায়গায় স্থির ছবির মত দৃশ্যমান।

পুষ্প কৌতূহলী হয়ে বলে—ওই মেঘের মত কী ওগুলো দেব ?

—আমি জানি কিন্তু কখনো দেখিনি। ওগুলো বহু উচ্চ স্তরের জীবলোক।

—জড়দেহধারী জীব ?

—না। তোমরা যাকে বলবে আত্মিক লোক—

—অনেক উঁচু স্তরের আত্মা ?

—খুব উঁচু।

যতীন ওদের কথা শুনছিল—সামগ্রহে বলে, একটা প্রশ্ন করবো যদি কিছু মনে না করেন স্তার—আই মিন্—মানে, দেব।

পুষ্প ভ্রকুটি করে বলে—তোমার এখনও পৃথিবীর সংস্কার গেল না যতীনদা ?

দেবতা ওদের মনোবৃত্তি অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারেন না ; রাগ, অশ্রদ্ধা, হিংসা প্রভৃতি মনোভাবের বহু উর্দ্ধে তাঁরা। তিনি অনেক পরিমাণে সরল বালকের মত। পুষ্প লক্ষ্য করচে—করুণাদেবীও অনেক সময় বারো বৎসরের পার্থিব বালিকার মত কথা বলেন, ব্যবহার করেন। উচ্চতর দেবচরিত্রের এদিকটা আজকাল বেশি করে ওদের দুজনেরই চোখে পড়চে।

যতীন আরও বিনয়ের সঙ্গে বলে—একটা প্রশ্ন ছিল—আপনি ওখানে যান নি কেন ?

দেবতা বলেন—এর উত্তর খুব সোজা। ও সব লোক আমার নিকট অদৃশ্য।

পুষ্প ও যতীন দুজনেই বিস্ময়ে স্তব্ধ। পুষ্প বলে—আপনার কাছেও অদৃশ্য ? দেব, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

এইবার সামনে বহুদূর থেকে ওরা দেখতে পেলে সারা আকাশ জুড়ে একটা বিশাল অগ্নিক্ষেত্র ওদের দিকে যেন ছুটে আসচে। ঘোর শুভ্রবর্ণ মহাপ্রজলন্ত বাষ্পপরিবেশ, মাঝে মাঝে তা থেকে সহস্র-সহস্র যোজনব্যাপী বাষ্পাগ্নি বহু উর্দ্ধে উঠে মহারুদ্ধের মত সর্বধ্বংসকারী প্রলয়ের হুঙ্কার ছাড়চে। সে দৃশ্য দেখে পুষ্পের চেতনা লোপ পাবার মত হোল।

যতীন সেই কালাগ্নির ভৈরব দৃশ্যের দিকে পেছন ফিরে বলে—ভীষণ ব্যাপার, আমাদের পক্ষে এ দৃশ্য না দেখাই ভালো। ভয় করে প্রভু।

দেবতা হেসে বলেন—শুধু বিশ্বদেবের মোহনমূর্ত্তিই দেখবে, তাঁর করাল, রক্ত রূপ দেখলে ভয় পাবে কেন ? ধ্বংসদেবের বিষণ-ধ্বনি শোনাবো তোমাদের। আত্মার দুর্বলতা দূর কর।

—কিন্তু আপনার শিষ্টা যে অচেতন হয়ে পড়েচে ! ও মেয়েমানুষ, ওকে ও রূপ আর নাই বা দেখালেন প্রভু ?

সেই বিরাট কালাগ্নিবেষ্টিত মহাদেশ তখন ওদের অদূরে। যতীনের দেখে মনে হোল একটা প্রজলন্ত বিশ্বপৃথিবী তার সামনে। অল্প পরেই দেবতার অদ্ভুত শক্তিবলে ওরা দুজনেই

সেই বিরাট অগ্নিগুলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। ওদের চারিদিকে শুধু শুভ্র জলন্ত হিলিয়াম ও ক্যালসিয়াম বাষ্পরাশি মহাবেগে ঘূর্ণমান, কোথাও রাঙা শিখা নেই—শুধুই শ্বেতশুভ্র—আবার বহুদূর অগ্নিময় দিগন্তে লক্ষলক্ষ রাঙা হাইড্রোজেনশিখা অজগরের মত ফুঁসে গর্জছে তেড়ে উঠেচে ফ্লোর পলকে লক্ষ লক্ষ মাইল। ধ্বংসদেবের বিবাণ-ধ্বনির মত ভৈরব হস্তার সে কালাগ্নিগুলের চারিদিক থেকে একসঙ্গে অনবরত শোনা যাচ্ছে। একটা গোটা ব্রহ্মাণ্ড যেন দাউ দাউ করে জ্বলচে! অতি ভীষণ, রৌদ্ররূপ প্রকৃতির।

ভয়ে, বিস্ময়ে যতীন আড়ষ্ট হয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে। রৌরব নরকের বর্ণনা সে কিসে যেন পড়েছিল তার পৃথিবীর বায়াজীবনে। এই কি সেই রৌরব নরক? কোন্ দেবতার তাওবনুতোর পদচিহ্ন এর প্রতি অগ্নিশিখাটির গায়ে আঁকা, উদ্ধত ও ভয়াবহ মৃত্যুদহন এর কালাগ্নিপরিবেশের প্রতি অণু প্রতি পরমাণুর গর্মস্থলে?

দেবতা বলেন—ভয় পেয়ো না। এই থেকেই সৃষ্টি। দাঁড়িয়ে দেখ।

শুধু অন্ধবেগে ধাবমান অণুপরমাণুপুঞ্জের সংঘর্ষে উৎপন্ন এই বিশাল অগ্নিময় মহাদেশ যেন চারিদিক থেকে ওদের ঘিরেচে—এর শেষ কোথায়? অতি নীলাভ শুভ্র অগ্নিগর্ভ বাষ্পপুঞ্জ, উর্জ্জ্ব, নিম্নে, দক্ষিণে, বামে—ভীমবেগে সঞ্চরণশীল, আলোড়নে ও আক্ষেপে উন্মাদ সে বহিমান ব্রহ্মাণ্ড ধরার মানুষ সহ করতে পারে না। যতীন অস্থব্ব করলে সেও উন্মাদ হয়ে যাবে এ দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখলে। মনে পড়লো গ্রহদেবের সেদিনকার কথা, সেই অদ্ভুত সত্য কথা—যন্ত্র ব্রহ্মাণ্ড সমস্তত: স্থিতান্তেতাদৃশাত্তনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জলন্তি—পৃথিবীর প্রাচীন দিনের জ্ঞানীরা যে বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন তপস্রা দ্বারা সত্যকে অস্থব্ব করে।

ইহাং পথিক দেবতা যেন ভাবাবেগে সমাধিস্থ হয়ে নিষ্পন্দ হয়ে গেলেন ক্ষণকালের ক্ষণে। স্বন্দর চক্ষুটি মুদ্রিত করে সেই অগ্নিশিখার মধ্যে তিনি স্থির প্রশান্ত বদনে দাঁড়িয়ে আপন মনে অক্ষুট স্বরে বলতে লাগলেন—হে অনল, হে সর্কেধর, হে পরাবরস্বরূপ, কারণে তুমি বর্তমান, কার্যেও তুমি বর্তমান, তুমিই ধন্ত—ধ্বংসের মধ্যে তোমার সৃষ্টি সার্থক হোক। জয় হোক তোমার!

ওদের দিকে ফিরে বলেন—চলো। কত! এখনও অচেতন? এই নক্ষত্রের অগ্নিগুল ছাড়িয়ে গেলেই জ্ঞান ফিরে পারে।

যতীন সশঙ্ক বিস্ময়ে চেয়ে ছিল দেবতার সেই ধ্যানপ্রশান্ত গভীর রূপের দিকে। অদ্ভুত এ মূর্তি। সাক্ষাৎ সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী জ্যোতির্ময় নারায়ণ যেন তার সম্মুখে। সে মুখ অনায়াস করুণা ও গভীর মৈত্রীর চিহ্ন ব্রহ্মাণ্ডের জরামরণচক্রে বদ্ধ জীবকুলকে যেন অভয় দান করচে। কে বলেছিল ঐকে নাস্তিক?

দেবতা বলেন—জানো, প্রত্যেক গ্রহ বা নক্ষত্র, প্রত্যেক জড় বা বাষ্পপিণ্ড যা আকাশে ছড়ানো আছে—তোমাদের স্বর্ঘ্য নামক সেই ক্ষুদ্র নক্ষত্রও এর মধ্যে—প্রত্যেকটি এক এক চূষক। এরা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করচে। সমস্ত ব্যোম ব্যোপে এই বিরাট চৌষক ক্ষেত্রে—

কোনো জড়দেহধারী জীবের সাধ্য নেই এই বিশাল চৌম্বকক্ষেত্রের আকর্ষণশক্তিকে জয় করে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়।

যতীন বলে—দেব, আমাদের সূর্য্যও বড় চুষক ? পৃথিবীও ?

—তোমাদের পৃথিবীও। সূর্য্য তো বটেই। প্রত্যেক নক্ষত্রও।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওরা বহুদূর চলে এল নক্ষত্রটা থেকে—ওদের মাথার ওপরে বহুদূরে সেটি একটি বিশাল বহিঃগোলকের মত জ্বলে তখনও।

হঠাৎ যতীনের মনে পড়লো সেই পূর্ব্বের কথাটি।

সে বলে—দেব, আপনি তখন বলেছিলেন ওই সব মেঘের মত দেখা যাচ্ছে যা, ওগুলো আপনার কাছেও অদৃশ্য জীবলোক ?

দেবতা বলেন—জীবলোক বলিনি—স্থূলদেহধারী জীব নেই ওতে। আত্মিকলোক বলেছি।

পুষ্পের এবার জ্ঞান হয়েছে। সে বিশ্বয়ের সঙ্গে ওদের দিকে চেয়ে চোখ খুলে বলে—এ কোথায় চলেছি ?

যতীন হেসে বলে—তার চেয়ে কোথা থেকে আসছি বলে প্রশ্নটা স্মৃষ্ট হোতো। আমরা আসছি বহুদূরের নক্ষত্রলোক দেখে।

—আমি কোথায় ছিলাম ?

—অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

পুষ্পের এবার জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে এল। সে বলে—মনে পড়েছে এবার। দূর থেকে যা দেখেছি, তাই যথেষ্ট। উনি দেবতা—তা বলে আমরা সামান্য মানুষ—ও সহ্য করতে পারা কি—

যতীন প্রতিবাদ করে বলে—আমরা এখনও সামান্য মানুষ ? এতকাল স্থূলদেহ ছেড়ে এসে এখনও সামান্য মানুষ ?

পথিক দেবতা হেসে বলেন—তোমার পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর আর এ প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গেই দিচ্ছি শোনো। ওই যে সব মেঘের মত দেখা যাচ্ছে বহুদূরে, ওগুলো বহু উচ্চত্বরের আত্মিক লোক। ওতে যাঁরা বাস করেন তাঁরা এবং তাঁদের বাসভূমি দুই-ই আমার কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। অথচ আমি কতকাল ধরে শুধু ভ্রমণ করেই বেড়াচ্ছি—কত যুগ যুগ এসেছি আত্মিক লোকে—আর তোমরা দুদিন এসেই—

যতীন বিশ্বয়ে কেমন হয়ে গেল। এই মহান্ দেবতা—ইনিও ছোট ? তাহোলে তারা কোথায় আছে ? কীটস্ত্র কীট—তাই বুঝি অত অহংকার ? কিন্তু কি বিশাল, অনন্ত সময় এ ব্রহ্মাণ্ড—কত অসংখ্য জীবলোক, আত্মিক লোক, অনাদি, অনন্ত সময় বোপে কি অনন্ত বিবর্তন ! তাদের সবারই ওপর সেই বিশ্বনিয়ন্তা। সত্যিই ভগবানের নাগাল কে পাবে ? তিনি কোথায় আর তারা কোথায় !

যতীন বলে—আপনি শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ান কেন, দেব ?

—কেন বলো তো ?

—আজ আপনাকে যে চোখে দেখলাম—অনুগ্রহ করে কিছু মনে করবেন না স্মার—
মানে—মানে—

পুষ্পের ভ্রুটি ওকে নির্ঝাঁক করে দিলে।

দেবতা নিজেই বোধ হয় ওর মন বুঝে জবাব দিলেন।

—এই ভ্রমণই আমার উপাসনা। কত সৌন্দর্য্য দেখেছি, কত ভরানক রূপ দেখেছি তাঁর—
যেমন তোমরা আজ দেখলে। এও কিছু নয়—এর চেয়ে অতি ভীষণ রূপ আছে সৃষ্টির।
সে সব সহ্য করতে পারবে না তোমরা। আমি এর মধ্যেই তাঁকে দেখি।

ষষ্ঠীনের চেয়ে পুষ্পের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বেশি, সে বললে—প্রভু, আপনি তাঁকে
দেখেছেন ?

ওরা একটা অপরিচিত গ্রহের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, আকাশপথ থেকে তার বিচিত্র ধরনের
গাছপালা, পাহাড়-পর্বত সব দেখা যাচ্ছিল। গ্রহে তখন রাত্রি গভীর। লোকালয় বড় কম
তাতে, কেবলই ভীষণ আরণ্যানীসমাজের শৈলমালা ও উপত্যকা। ওর একটা সাথী উপগ্রহ
থেকে নীল জ্যোৎস্না পড়ে সে সব এমন একটা সৌন্দর্য্যে ভূষিত করেছে—পৃথিবীতে কেন,
এ পর্য্যন্ত স্বর্গলোকেও সে রকমটা দেখেনি ওরা। অপাখিব তো বটেই, অদৈবও বটে।
বনে বনে নীল জ্যোৎস্না—মুগ্ধ হয়ে গেল ওরা সে গ্রহের গভীর রাত্রির নীলজ্যোৎস্নাস্নাত গভীর
উদ্ভুত শৈলারণ্যের রূপে।

দেবতা বললেন—কি দেখচো ? এ একটা জীবজগৎ। খুব উঁচু স্তরের জীব এতে বাস
করে। চলো, এর বনের মধ্যে বসি। তোমাদের পরিচিত স্থল জগৎ থেকে বহু জন্মের পর
যখন লোকের মন তাঁর দিকে যায়, তখন তারা এখানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। শুধু তোমাদের
পৃথিবী থেকে নয়—ওই ধরনের আরও অনেক নিম্নস্তরের স্থল জগৎ থেকে। আত্মার সেই
বিশেষ অবস্থা না হোলে এই সব গ্রহে আসা চলে না। এখানে কর্মবন্ধন কম। ভগবানে
যারা আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের মন বুঝে অন্তর্যামী বিশ্ব-দেবতা এখানে—এবং আরও এর
মত বহু গ্রহ আছে, সেই সব লোকে—জন্মগ্রহণ নির্দেশ করেন। দেখচো না এখানে জীবের
বসতি কম। ভিড় নেই। জীবনের যুদ্ধ সরল ও সহজ। সব রকম ভ্রম, কুসংস্কার, অজ্ঞানতার
বাধন যারা কাটিয়েছে, তারাই এখানে আসে শেষ জন্মের জন্তে। আর স্থল শরীর গ্রহণ করতে
হয় না তাদের এখানকার মৃত্যুর পর।

—তাহোলে পৃথিবীর লোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ ক'রে শুধু যে পৃথিবীতেই ফিরে আসবে তা
নয় ?

—পৃথিবীর সঙ্গে আমার পরিচয় কম—তবুও আমি জানি, কোনো জীবাত্মা পুনর্জন্মের
সময় সে যে-স্থলজগৎ থেকে এসেছিল, সেখানেই জন্মাবে—তার কি মানে আছে! অবস্থা
অনুসারে জীবের গতাগতি নির্দিষ্ট হয়। যেখানে পাঠালে যে উন্নতি করতে পারবে, তাকে
সেখানেই পাঠানো হয়। অনন্ত উন্নতিতে জীবাত্মার অধিকার তিনিই দিয়েছেন, যিনি এই

বিশ্ব রচনা করেচেন। কে বুঝবে তাঁর করুণা ও মৈত্রী! খুব উচ্চ অবস্থার আত্মা না হোলে বোঝা যায় না।

ছায়াশীতলা শিলাতট ঘন বনশ্রেণীতে ঘেরা। ওরা এসে সেখানে বসেচে। যতীন আর পুষ্প চেয়ে চেয়ে দেখলে এসব গাছপালা তাদের চেনা নেই, পৃথিবীতে এত বড়, এত অদ্ভুত চমৎকার তরুশ্রেণীর সমাবেশ কোথায়? উগ্র লোভ এখানকার বন নষ্ট করেনি, ব্যবসাতে টাকা উপার্জনের জন্তে। বনকুসুমের সুগন্ধ, ঝর্ণার কলধ্বনি, পক্ষী-কুঁজন, অব্যাহত শান্তি ও পবিত্রতা—সব মিলিয়ে জায়গাটা যেন তপোবনের মত মনে হচ্ছে। উনি যা বলচেন সে হিসেবে দেখলে সমগ্র গ্রহটাই তাহোলে একটা সুবিশাল তপোবন। পুষ্প সময় বুঝে আগের প্রশ্নটি এখানে আবার করলে। বল্লে—আপনি তাঁকে দেখেচেন প্রভু?

পথিক দেবতার মুখ সহসা সম্মুখে ও ভক্তিতে কোমল হয়ে এল। তিনি বালকের মত সরল স্বরে বল্লেন—না।

—আপনিও দেখেন নি তাঁকে!

পুষ্পের স্বরে বিস্ময় ফুটে উঠেচে।

—আমি তাঁর রূপ দেখেছি তাঁর বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে। তাঁকে চোখে দেখা যায় আমি জানি। কিন্তু আমি তপশ্চা করিনি তাঁকে সে ভাবে পেতে। আমি ভবঘুরে, তাঁকে দেখে বেড়াতে চাই তাঁরই সৃষ্ট লোক-লোকান্তরে। লামামাণ আত্মা হয়েছে আমার আনন্দ। তাই অনেকে আমাকে নাস্তিক বলে।

যতীনের হঠাৎ মনে গড়োলা করুণাদেবীর কথা। তিনিও তাই বলেছিলেন।

পুষ্প বল্লে—প্রভু, এই গ্রহে স্ত্রীলোক আছে?

—কেন থাকবে না? নারী বিশ্বে শক্তির অংশ। এসো—দেখবে। গ্রহে এ অংশটাতে রাত্রি। অল্প অংশ দিনমান—এদের ঘর সংসার দেখাবো—খুব শান্ত জীবন-যাত্রা এদের। বহু প্রবৃত্তি ও বাসনার সঙ্গে, বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে জরী হয়ে অভিজ্ঞ হয়ে এ জন্মে পূর্বজন্মের জ্ঞান ও সংঘমের প্রভাবে এরা সমাহিত ও আত্মস্থ হয়েছে।

—এদের সমাজ কেমন? ইচ্ছে করে প্রভু—জানি—

—এই গ্রহের কথা আমি ঠিক জানি না—তবে বিশ্বের এই অঞ্চলে এ রকম বহু আছে। সব উচ্চস্তরের জীবজগৎ। জীবে জীবে যুদ্ধ রক্তপাত নেই এই সব গ্রহে। অত্যন্ত পরার্থপর এখানকার মানুষ। পরের জন্তে প্রাণ দেবে। অনেক জাতি নেই, ভেদবুদ্ধি অত্যন্ত কম। সহজে ঋণ্ডা মেলে স্থল-দেহ ধারণের উপযুক্ত। আয়ু দীর্ঘ নয় কিন্তু, অল্প সময়ের মধ্যে বেশি কাজ করতে হয়—কাজেই আলস্যের স্থান নেই। অসার বস্তুতে লোভ নেই—যেমন অত্যন্ত হস্ত সঞ্চয়, বড় আবাসবাগী, উজ্জ্বল পরিচ্ছদ—যান, যশ—অহঙ্কার, অভিমান।

যতীন বল্লে—কিন্তু নারী রয়েছে যে প্রভু, ওরা থাকলেই—

পুষ্প ভ্রুকুটি করে বল্লে—কি রকম যতীনদা?

দেবতা হেসে পিতার ছায় সন্নেহে পুষ্পের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে বল্লেন—কল্পার মনে আঘাত

দিও না—ও ঠিক বলেচে। ওরা থাকলেই হয় না গোলমাল। বাসনা থেকে পাণ, গোলমাল। এখানকার জীব বাসনা ক্ষয় করে এসেচে বহু জন্ম ধরে। এদের নিম্নস্তরের বাসনা জাগে না তীব্রভাবে। উচ্চজ্ঞানের, শিল্পের, সংগীতের সাধনা বা ভগবৎসাধনা নিয়ে এরা থাকে। ভগবানের জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ-দর্শন এদের অনেকের হয়েছে। স্বতরাং যে সব জিনিস জীবনে স্বপ্নের মত অস্থায়ী তাদের অসরাস্র এরা বুঝেচে। অত্যন্ত সাধু, নিস্পৃহ, সরল উচ্চস্তরের জীবন এখানকার—মানে, এই সব গ্রহের।

যতীন বলে—বাঃ, চমৎকার জীবন তো এখানকার—ইচ্ছে হয় জন্ম নিই—

দেবতা ওর দিকে চেয়ে বলেন—তোমাকে এখানে একদিন তো জন্ম নিতেই হবে। কারণ এই স্বর্গলোক, যেখানে তোমরা আছ, এও মায়ায় অধীন। হয়তো বহুকাল এখানে থাকবে, শুর থেকে সুরাসুরে যাবে—কিন্তু স্বর্গও হৃদিনের। ব্রহ্মচক্রে জন্ম-মৃত্যু আবর্তিত হচ্ছে, মানুষ আবার জন্মাবে, আবার মরবে, আবার জন্মাবে—যতদিন বাসনার শেষ না হয়, অসত্য থেকে সত্যে, মৃত্যু থেকে অমৃত, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে না যায়। ভগবানকে জানলে, জীব নিজেকে জানতে পারবে—তখন ছুটি। স্থূল দেহে শেষ জন্ম-সাধারণত এই সব গ্রহে হয়—এখানে আত্মদর্শনের ও সাধনার সুযোগ ও সময় অনেক বেশি। দয়া করে বিশ্বের অধিদেবতা জ্ঞানী ও মুমুক্শু জীবদের পুনর্জন্ম গ্রহণ করান।

—দেব, আপনি ঘুরে ঘুরে বেড়ান কেন? আপনি এত উচ্চ—

—ঐ রজনীর তারালোকের ব্যাপ্তির মধ্যে, বনপুষ্পের সুবাস ও এই নব অদ্ভুত গ্রহের বনানীর নির্জনতা ও বনবিহঙ্গের কুজনের মধ্যে, বিশ্বের রহস্যের মধ্যে আমি তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকবার প্রার্থনা জানিয়েছিলাম মনে মনে। তিনি অসীম করুণায় সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেচেন। নইলে সাধ্য কি এই অগণ্য লোকালোকে ভ্রমণ করি? এ শক্তি তো সকলের হয় না। আমি দেখছি এভাবে তাঁর লীলা-সৌন্দর্য্য দেখে বেড়ানোর বাসনা কারো নেই, এ নেশা আর কারো দেখিনি, কেবল বহুকাল আগে আর একটি আত্মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—ছুটি নক্ষত্রের বিরটি সংবর্ধের দৃশ্য দেখেছিলাম দুজনে—তা থেকে তৃতীয় একটি নতুন প্রজন্ম তারকার সৃষ্টি হোল। ওঃ সে সব দৃশ্য তোমাদের শক্তি নেই ফ্হ করো। আমাদের তিনি ভ্রমণের শক্তি দিয়েচেন, স্বপ্নের মত বিরটি পাখা দিয়েচেন লোকে লোকান্তরে উড়তে—এই আমার তাঁকে উপাসনা। জয় হোক তাঁর।

পুষ্প হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, দেখাদেখি যতীনও। এই মনোরম জগতের নৈশ সৌন্দর্য্যের মধ্যে উচ্চস্তরের এই পথিক দেবতার বাণী স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধির বাণী বলে মনে হোল হঠাৎ ওদের মনে। সুস্পষ্ট সত্য বাণী—চন্দ্রমা অন্তমিত হোলে, বাত্ম শান্ত হোলে, পৃথিবীর স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যের আশ্রমে যেমন একদিন বাণী উচ্চারিত হয়েছিল।

পুষ্প মাথা নীচু করে বলে—আশীর্বাদ করুন দেব—

ওর অশ্রুপ্রাবিত চোখ দুটির দৃষ্টি নতুন গ্রহের যুক্তিকার দিকে আবদ্ধ রইল।

দেবতা বলেন—আশীর্বাদ করচি কষ্টা, তুমি আমার অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের দেব-

আত্মার সাফাং পাবে। আমি ভবঘুরে মাত্র। সত্যিকার জানীর দর্শন পাবে। তবে তোমার ভাগ্যে এখনও অনেক সংগ্রাম আছে। কিন্তু তুমি বিশ্বদেবের করুণা লাভ করবে। আমি যাদের পাদস্পর্শ করবার যোগ্য নই, এমন আত্মার দর্শন পেয়ে খুশি হবে।

এমন সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল সেখানকার বনে-বনানীতে। আকাশের নক্ষত্ররাজি ম্লান হয়ে এল—সাথী তারার নীল জ্যোৎস্না মিলিয়ে অস্পষ্ট হয়ে এল। পক্ষী-কুজন জেগে উঠলো বনভূমির বৃকে।

পুষ্প ভাবছিল, কোনো এক সুদূর জন্মান্তরে এই গ্রহলোকে যদি সে জন্ম নেয়, সাথী তারার নীল জ্যোৎস্নায় এরই শৈলারণ্যে, উপত্যকায়, গিরিসান্নদেশে, শান্ত উপত্যকায় সে হাত-ধরাধরি করে বেড়াবে যতীনদার সঙ্গে—হুজনে মিলে ভগবানের উপাসনা করবে সারা জীবন এই তপোবনসম গ্রহলোকের পবিত্র আশ্রয়ে, কোনো গিরিনিঝরিণীর কূলে কুটির বেধে। জগতের বিশাল পথে ঘুরতে ঘুরতে কবে এখানে এসে হস্ততো পড়তে হবে, তা কেউ জানে কি? মহাপুরুষের আশীর্বাদ বৃথা যাবে না।

দেবতা বলেন—চলো, এখনি লোকে জেগে উঠবে। এরা আমাদের হস্ততো দেখতে পাবে—এদের ক্ষমতা বেশি। তোমাদের তো নিশ্চয় দেখতে পাবে। সরে পড়ি তার আগে।

ওদের বৃডোশিবতলার ঘাটে পৌঁছে দিয়ে পথিক দেবতা পুষ্পের চোখের জলের মধ্যে অদৃশ্য হোলেন। তার অল্পনয় ও অল্পরোধের উত্তরে বলে গেলেন, সময়ে আবার দর্শন দেবেন।

১৭

বৃডোশিবতলার ঘাটে আজ দীপাঙ্গিতা অমাবস্তা। উপারে হালিসহরের শ্রামাসুন্দরীর ঘাটে মন্দিরে মন্দিরে ছাদে ছাদে প্রদীপ দিয়েচে মেঘেরা। এদের প্রাচীন ঘাটের রানায় পুষ্প নিজের হাতে ছোট ছোট মাটির প্রদীপ জ্বলেচে। গঙ্গাবক্ষ অন্ধকার, দু-একটা নৌকোর ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে—ছপ্ ছপ্ দাঁড়ের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে।

পুষ্পে বলে—এশো যতীনদা, আমরা আমাদের ছেলেবেলার কথা ভাবি বসে বসে। মনে পড়ে কেওটা-সাগরের দিন? আমি পিদিগ দিচ্ছি, তুমি এক পরসার কুচো গজা কিনে আনলে—

—কুচো গজা না জিবে গজা—

—না, কুচো গজা। বেশ মনে আছে, ময়রা বুড়ীর দোকান থেকে। নিতাইএর ঠাকুরমা, মনে আছে?

—খুব। বটতলার দোকান ছিল। আহা, সে তো কতদিন মরে এসেচে এখানে—তাকে কখনো দেখিনি।

—তারপর সেদিন দুজনেই মার খেলুম বাড়ী ফিরে। অত রাত পর্যন্ত তুমি আর আমি ঘাটে বসে ছিলাম পিঁদিম দেওয়ার পরে। মনে পড়ে যতীনদা?

—খুব। আমি মার খাইনি। মাসীমা তোকে মারলেন। আমিই বরং উত্তরের কোঠায়—যতীন হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে বসলো। বল্লে—পুষ্প আমি এখন কলকাতায় যাবো—

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—কেন?

—তোমার বৌদিদির কিছু হয়েছে। একটা আর্ন্তনাদ শুনলাম তার গলার। দেখে আসি—পুষ্প, সত্যি বলছি, ও আমার শাস্তি দিলে না। তুই যতই চেষ্টা করিস, আমার ভাগ্য ওর সঙ্গে বাঁধা। চল্লুম আমি—

—বা-রে, আমিও বুঝি বসে থাকবো? দাঁড়াও—

মনে মনে পুষ্প বড় হতাশ হোল। তারও জীবন যেন কেমন। কিছুতেই কি কিছু সুরাহা হয় না? সব সময় দেওয়ার ওপর দিয়ে কোন বিকটমূর্তি কঙ্কাল উঁকি মারে, অমঙ্গল ভরা দৃষ্টিতে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এত কষ্ট করে আজ সে দীপাবিতা অমাবস্কার সন্ধ্যাটিকে প্রাণপণে সাজালে—সব বুধা!

নামবার পথে পুষ্প বল্লে—কলকাতায় আসতে পারিনে, কষ্ট হয়। উঃ দেখেচ কেমন কালো কালো কুয়াশার মতো জিনিস! মাহুঘের অর্থলোভ, বিলাসিতা—নানারকম খারাপ চিন্তা—সকলের ওপর, লোভ—এই সব এক ধরনের কালো কুয়াশা সৃষ্টি করেছে। ওর মধ্যে দিয়ে আসতে দম বন্ধ হয়ে যায় যেন—সব বড় শহরেই এরকম দেখেচি—এখানে মাহুঘ সব ভুলে শুধু ভোগ নিয়ে আছে।

সেই বাসাবাড়ী—যতীন এর আগেও দুবার লুকিয়ে এসে দেখে গিয়েছিল আশাকে। পুষ্প তা জেনেও কিছু বলেনি। যতীনদা ভাবে পুষ্প পোড়ারমুখীকে লুকিয়ে কোনো কিছু করা যায়! যতীনদার বয়স হয়েছে বটে কিন্তু এখনও ছেলেমাহুঘি ঘোচেনি।

আশার অবস্থা ভাল নয়। নেতানারায়ণ ওকে কেলে আজ মাস চার পাঁচ হোল চলে গিয়েছে দেশে। নিজের গ্রামে গিয়ে সে মন্দির দোকান খুলেচে—কিন্তু আশার ফেরবার মুখ নেই। বাড়ীওয়ালীর দরায় এবং হাতের 'হু' একগাছি সোনার চুড়ি বিক্রির টাকায় এতদিন যা হয় চললো। কিন্তু তার মধ্যে বাড়ীওয়ালী নানারকম উপাঙ্গনের ইঙ্গিত করেছে। এক মারোয়াড়ী লোহাওয়ালী তাকে দেখেচে দোতলার ছাদ থেকে—আশা যখন ওদের বাসার তেতলার ছাদে কাপড় তুলতে গিয়েছিল। বেলঘরে না সোদপুরে তার বাগানবাড়ী, মস্ত বাগান—ইত্যাদি।

তাকে সহৃদয়তা দিয়েচে—এই তো বয়েসখানা চলে যাচ্ছে গো—আর ছোটো বছর। তারপর কেউ ফিরে চাইবে? না বাপু। বলে, যেয়েমাহুঘের রূপ আর জোয়ারের জল। হ্যাঁ, দেমাক থাকতো যদি সোয়ামী পুতুর থাকতো। নিজের চেহারাটা আয়নায় দেখেচ একবার?

আশা একা ঘরে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে আছে—তার মনে যে নিরাশার অন্ধকার ছেয়েচে, কোনোদিন তা ফুটে আলো বেরুবার সম্ভাবনা আছে কি? হাতের পয়সা ফুরিয়েচে, আর বড়জোর দশটা দিন। তারপর?

গভীর রাত্রি কলকাতার। আশা এখনও ঘুমোয়নি—হৃদিতার ঘুম নেই চোখে।

যতীন আকুল হয়ে ওর শিয়রে বসে ডাকলে—আশা আশা লম্বাটি—আমি এসেছি আশা—

পুষ্পও বসলো পাশে। পুষ্প যে ভবিষ্যৎ দেখেচে, যতীন তা দেখবার শক্তি রাখে না। পুষ্প খুব দুঃখিত হোল। কর্কের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আশা-বৌদির সঙ্গে যতীনের গাঁটছড়া ব্রহ্ম-আটুনিতে আঁটা। দুঃখ হয়, কিন্তু সে জানে, কিছু করবার নেই তার। সে এখানে গাড়ীর প্রথম চক্রের যত অনাবশ্যক। সে না থাকলেও কর্কের রথ দিবা চলবে।

যতীন বলে—পুষ্প, আমায় সাহায্য করো—

—ভাবচি।

—কি ভাবচো?—

—ভাবচি তোমার অদৃষ্ট যতীনদা—

—এখন কি হৈয়ালি উচ্চারণ করবার সময় পুষ্প?

হায়! সে যা বলতে চাইচে, যতীনদাকে যদি কেউ তা বুঝিয়ে দিতে পারতো! যতীনদা চিরকাল তাকে ভুল বুঝে আসচে, এখনও বুঝবে তা সে জানে। কিন্তু কি করবে সে, এ তারও অদৃষ্টলিপি।

পুষ্প দুঃখিত সুরে বলে—তা বলিনি। তুমি বলে বুঝবে না আমার কথা। আশা বৌদির এ অবস্থা দেখে—আমি মেয়েমানুষ—আমার কষ্ট হচ্ছে না তুমি বলতে চাও? কিন্তু কিছু সাহায্য করতে পারবো না তুমি আমি! আশা বৌদিদির কর্মফল—এক ভগবান যদি বাধন কাটেন তবেই কাটে। তোমার আমার ঘরা হবে না।

—এই রকম অবস্থায় কেলে রেখে যাই কি করে তোরা বৌদিদিকে—বল পুষ্প—তারা পারি? যতীনের কাভর উক্তিভে পুষ্পের চক্ষুদুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো—আশালতার দ্রব-বহুর জন্তে নয়, অশ্রু কারণে। সে বলে—পৃথিবীতে থাকতে, উপকার করতে পারতে। এ অবস্থায় আমি তো কোনো উপায় দেখচিনে। আচ্ছা—দেখি—একটু ভাবতে দাও—

পুষ্প একটু পরে বলে—এখানে থাকবে না। চলো যতীনদা। এখান থেকে যেতেই হবে। নইলে তোমার আসন্ন বিপদ।

যতীন বলে—তুমি বড় ভয় দেখাও, পুষ্প। চলো করুণাদেবীর কাছে যাই, তাঁকে সব বলি।

—বলবে কি, তিনি অন্তরের কথা জানতে পারেন। গুঁরা হোলেন উচ্চ স্বর্গের প্রহরদেবী। স্মরণ করলেই বুঝতে পারেন—কিন্তু সময় না হোলে আসেন না। বুঝা দেখা দেন না। তা ছাড়া কলকাতার এই বিশ্রী পাড়ায় তাঁকে আমি এনে এর সঙ্গে জড়াতে চাইনে।

সারারাত যতীন ও পুষ্প আশার শিরে বসে রইল। পাশের একটা বাড়ীর খোলা জানালা দেখিয়ে বল্লে—আখো যতীনদা, ওখানে ওরা কি করচে! দেখে এসো না?

—কি?

—তুমি গিয়ে দেখে এসো, অমন জায়গার যাবো না। দম বন্ধ হয়ে আসে।

যতীনের কৌতূহল হোল, সে গিয়ে দেখলে, কয়েকটি ভদ্রলোক, সাঁজের পোশাকে বেশ অবস্থাপন্ন বলেই মনে হয়—একটি ঘরে বসে ভাসের জুয়ো খেলচে। পাশের টেবিলে একটি বোতল, কয়েকটি গ্লাস—এক টিন সিগারেট, ছ'চারটি শক্ত চায়ের কাপ ডিস্—একটা বড় প্লেটে খানকতক অর্দ্ধভুক্ত পরোটা ও অল্প একটা পাত্রে কিছু ডালমুট। সিগারেটের ছাই ও ডালমুট ঘরের মেজের দামী কার্পেটের ওপর ছড়ানো—যদিও সিগারেটের ছাই কেলবার পাত্র টেবিলের ওপর রয়েছে কিন্তু আখপোড়া সিগারেট আর সিগারেটের ছাইতে পাত্রটা বোঝাই। ওরা ছোট ছোট তাকিয়া পাশে রেখে একমনে খেলেই চলেচে। বিছানার পাশে রানীকৃত দশটাকার নোট একটার পর আর একটা হিসেবে সাজানো, ওপরে একটা পেপারওয়েট চাপানো। ওরা মাঝে মাঝে বোতল থেকে ঢেলে মদ খাচ্ছে, সিগারেট ধরাচ্ছে, মাঝে মাঝে একখানা কাগজে পেন্সিল দিয়ে হারফিং-সুচক হিসেব রাখচে। এদের মধ্যে একজনের বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েছে, দেখলেই বোঝ যায়, মাথার চুলে কালো রং খুঁজে বের করা কঠিন। ফুলফোর্ম মাথার ওপর ইলেকট্রিক পাখা ঘুরচে, দেওয়ালের ঘড়িতে রাত দেড়টা বাজে।

একজন ডেকে বল্লে—ও প্রমীলা,—টুঙ্গ—খাবার দিয়ে যাও।

ছ'তিনবার ডাকের পর একটা সুন্দরী রমণী ঘুম-তুলতুলু চোখে একটা বড় প্লেটে কতকগুলো কাটলেট নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে বল্লে—নাও সব—রাত কম হয়নি, আমার ঘুম পেয়েছে—কাল আবার হাসপাতালের ডিউটি সকাল থেকে শুরু—

একজন বল্লে—সোডা ফুরিয়েচে—টুঙ্গ। লক্ষ্মীটি, একটা সোডা আমাদের যদি দিয়ে যাও—

আর একজন বল্লে—অমনি ওই সঙ্গে গোটাকতক পান—

সুন্দরী মেয়েটি রূপে ঘর আলো করেছে, ওর পরনে দামী সিল্কের শাড়ী, কাজ করা ব্লাউজ, অনাবৃত কর্ণদেশ ও বক্ষঃস্থলে জড়োয়ার কাজ করা নেকলেস চিক্ চিক্ করচে। সে যেতে যেতে তাকিল্যের সঙ্গে কৌতুক-মিশ্রিত স্বরে বল্লে—পারবো না এত রাত্রে পান সাঁজতে বসতে—

পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের সেই লোকটি কপট মিনতির স্বরে বল্লে—আমার ছ'হাত বন্ধ, মুখের সিগারেটটা ধরিয়ে যদি দিয়ে যেতে টুঙ্গ—

যতীন সেখানে আর দাঁড়ালো না। পুষ্পকে এসে বল্লে—তাস খেলচে। তাসের জুয়ো—টাকা জিত্বে।

পুষ্প বল্লে—একবার দেখে এসেচি জানালা দিয়ে। ওরা অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক—দেখে মনে হয় টাকার ভাবনা নেই—অথচ টাকার এমন বেশা?

—তুমি এগব বুঝবে না পুষ্প। টাকার নেশা নয়, জুয়ের নেশা—

—ঐ হোল। ওই মেয়েটি কে?

—মেয়েটি টুই। ভাল নাম যেন প্রমীলা—

পুষ্প হেসে বলে—তা তো বুঝলাম, ওদের কে? কি সম্বন্ধ ও বাড়ীর সংসারে?

যতীন কিছু বলে না, সরলা পুষ্প কত কথা জানে না সংসারে। ওর নিষ্পাপ মনে—
দরকার কি?

পুষ্প আপন মনেই যেন বলে—কিন্তু ওই বুদ্ধ ভদ্রলোকটি ওর মধ্যে কেন? ওঁকে দেখে
কষ্ট হয়। এখনও ভোগের নেশা এত! পরকালের চিন্তা করবার সময় হয়নি আজও?

—তোমার মত সবাই হবে? বাদ দাও না, বাজে কথা বলো কেন?

পুষ্প দুঃখিত কর্তে বলে—আমার বারার মত দেখতে। সত্যিই কষ্ট হোল। ভগবানের
দিকে মন দেবার ওর সময় যে পার হয়ে গেল!

—তোমার তাতে কি? বড্ড বাজে কথা তোমার পুষ্প—

—আশাবোদি ঘুমিয়ে পড়চে।

—কি হবে ওর পুষ্প? সত্যি কথা বল। তুই আমার চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পাস।

—দেখতে পাই কে বলেচে?

—আমি সব জানি—

পুষ্প গভীর স্বরে বলে—কেউ কিছু নয়। মানুষের মিথ্যে অভিমান। তিনি যা করবেন,
তাই হবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি এসো হুজনে।

—এখানে?

—এখানেই। তাঁর নামে সব পবিত্র হয়ে যাবে। তিনি এখানেই কি নেই? কে
বলেচেন নেই? তিনি তাঁর অসীম রূপা ও করুণায় এই হতভাগিনী আশাবোদির মঙ্গল
করুন।

করুণাদেবীর বিনা সাহায্যেও আজকাল পুষ্প মহল্লোঁকের সর্বত্র ঘাওয়াত করতে পারে,
এমন কি আরও উর্দ্ধতর লোক পর্য্যন্ত। যতীনকে অত উচ্চস্তরে কোনো শক্তিমান আত্মার
বিনা সাহায্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে পুষ্প অনিচ্ছাসত্ত্বেও একাই মাঝে মাঝে যায়। সে
বলে এতে অনেক কিছু সে দেখে, শোনে ও শেখে। অনেক ভাল ভাল আত্মার সংস্পর্শে এসে
মানসিক ও আত্মিক শক্তির প্রসার হয়।

সেদিন যতীন ছাড়লে না, বলে—আমি যদি উচ্চস্তরে অজ্ঞান হয়ে পড়ি—তুমি সেখানে
আমাকে কেলে যেও। যতদূর জ্ঞান থাকে ততদূর নিয়ে যাও না। আমিও বেড়িয়ে দেখতে,
জানতে ভালবাসি না কি ভাবচো? রেলভাড়ার টিকিট তো লাগচে না।

—আপো যতু-দা, এখনও পৃথিবীর ওই উপমা ও চিন্তার ধরনটা ছেড়ে দাও। তোমায়
এই জন্মেই বারণ করি বার বার পৃথিবীতে যেতে। ওখানে নানা আসক্তি, ইচ্ছা, ভোগপ্রবৃত্তি

সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে পৃথিবীর আকাশে বাতাসে। স্থল দেহ ভিন্ন ওই সব ইচ্ছা পূরণ করা যায় না। স্থল জগতের স্থল প্রবৃত্তি স্থল দেহে কি করে চরিতার্থ করবে? কাজেই ওই সব আসক্তি যেমন তোমার মনে আসন গেড়ে বসবে, তখনই তোমাকে স্থল দেহ ধারণ করতে বাধ্য করবে। স্তবরাং আবার পুনর্জন্ম।

—তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই তোমার মত।

—সে আমি জানি। সেজ্ঞেই তো তোমার জ্ঞে ভয় হয়—চলো তোমাকে মহলৌকে নিয়ে যাই—

ওরা ব্যোমপথে অনেক উর্দ্ধে উঠে এমন এক স্থানে এল, যেখানে উচ্চলোকের জ্যোতির্ষ্য অধিবাসীদের যাতায়াতের পথ। তার পরেই এক অদ্ভুত সুন্দর দেশ; অতি চমৎকার বন-পর্বতের মেলা, বনকুম্বের অজস্রতা। অথচ এখানে কোনো অধিবাসী নেই, অনেকদূর গিয়ে একটা নীল হ্রদ, চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। পুষ্প বগ্নে—চলো যত্ন-দা, ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে একটি গ্রাম আছে, অনেক জ্ঞানী মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে বাস করেন—তোমায় দেখিয়ে আনি।

বনবীথির অন্তরালে শুভ্র স্ফটিকসদৃশ কোনো উপাদানে তৈরী একটি বাড়ী, দেখতে অনেকটা গ্রীক মন্দিরের মত। হ্রদের নীলজলের এক প্রান্তে কুম্বমিত লতাবেষ্টিত এই সুন্দর গৃহটি যতীন-এর এত ভাল লাগলো! এমন সুন্দর পরিবেশ আর্টিস্টের কল্পনায় ছাড়া যতীন অন্তত পৃথিবীতে কোথাও দেখেনি। আপন মনেই সে বলে উঠলো—কি সুন্দর!

একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ ঘরের মধ্যে বসে। কিন্তু ঘরের আসবাবপত্র সবই অপরিচিত ধরনের। পৃথিবীতে ব্যবহৃত কোনো আসবাব সে ঘরে যতীন দেখলে না। লোকটিকে দেখেই মনে হোল অনেক উচ্চ অবস্থার আত্মা ইনি। ওদের অভ্যর্থনা করে বসিয়ে তিনি বলেন—তোমরা কোথা থেকে আসচো?

যতীন বলে—ভূবল্লোকের সপ্তম স্তর থেকে।

তিনি বিস্মিত হয়ে বলেন—না, তা কেমন করে হবে? তা হোলে তো আমাদের এই জনপদ, এই ঘরবাড়ী বা আমাকে কিছুই দেখতে পেতে না? নিশ্চয় তোমরা উচ্চতর স্তরের অধিবাসী।

যতীন বলে—এটা কোন্ লোক?

—মহলোকের প্রথম স্তর। ভূবল্লোকের অধিবাসীদের পক্ষে এখানকার বাড়ীঘর, মাছুষ, বন, পর্বত সব অদৃশ্য। আমার অবস্থার আত্মা না হোলে আমার এ গৃহে আমাকে পাবেই না। মহলোক কোনো একটা স্থানও বটে, বিশেষ একটা অবস্থাও বটে। স্থান ও অবস্থার একত্র যোগ না ঘটলে এ লোকে চৈতন্য জাগরিতাই হবে না যে। তা নয়, তোমাদের মধ্যে একজন কেউ উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েচ, নইলে এখানে আসতে পারতে না।

—সে এই মেয়েটি। আমি নই—

পুরুষটি হেসে বলেন—আমিও তা অল্পমান করেছি।

পুষ্প সলজ্জ প্রতিবাদের সুরে বললে—আমি কি-ই বা—ওঁর জন্তেই—

যতীন বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলে—আপনি পৃথিবী চেনেন তো স্তার ?

—আমি আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অধিবাসী ছিলাম। সেই আমার শেষ জন্ম। সেবার ছিলাম গ্রীসে, তার পূর্বে দুই জন্ম ভারতবর্ষে ও একজন্ম সুপ্রাচীন মিশরে কাটাই।

—তার পূর্বে ?

—তার পূর্বে পৃথিবীতে ছিলাম না। অন্ত গ্রহে সৌর-জগতে বহু জন্ম নিয়েছি। কত অদ্ভুত গ্রহ আছে, অদ্ভুত জীবকুল আছে! বিচিত্র লীলা ভগবানের।

হঠাৎ পুষ্প বললে—আপনি ভগবানকে দেখেছেন, দেব ?

—না।

—আপনি বিশ্বাস করেন তিনি দেখা দেন ?

—না।

—আশ্চর্য্য! ভগবানে বিশ্বাস করেন না ?

—তাঁর কোন রূপে আমার বিশ্বাস নেই, এই কথা বলছি। ভগবানকে তোমরা যে চোখে দেখো, আমরা সম্পূর্ণ অন্য চোখে দেখি। তিনি অচিন্তনীয় মহাশক্তি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিরাজমান। দেহধারী হয়ে দেখাও দেন, আমার এই গ্রামের একটি মেয়ে প্রায়ই তাঁর দেখা পায়।

পুষ্প আশ্চর্য্য হয়ে বললে—তবুও আপনি বিশ্বাস করেন না ?

—যে যেভাবে কল্পনা করে, তাকে সেইভাবেই তিনি দেখা দেন। এতে আমি বুঝি, এই তোমরাই আমার ভগবান হতে পার। নিতামুষ্টি কি আছে তাঁর ? সবই তাঁর মৃষ্টি—এই গাছপালা, এই বনভূমি, এই তুমি মেয়েটি—ঐ অনন্ত আকাশ, ব্রহ্মাণ্ডকুল—

কথা বলতে বলতে ভক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতার জ্যোতিতে তাঁর মুখের শ্রী হোল অপূর্ব্ব ; তীক্ষ্ণ নীল আলোক বড় বড় চোখ দিয়ে কখনো ঠিক করে বেরুতে লাগলো—কখনো শাস্ত হয়ে আসতে লাগলো। ভগবানের কথায় তাঁর কর্ণধর ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে এল।

পুষ্প তার ভুল বুঝে বললে—আমায় ক্ষমা করুন দেব, আমি বুঝতে পারিনি আপনাকে। আপনি তাঁকে ভক্তি করেন।

যতীন বললে—পৃথিবীতে বহুদিন যান নি ?

—পৃথিবীর বসন্তকালে পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে ফুল ফোটে, সেই সময় পৃথিবীর মহা-অরণ্যে পর্ব্বত-সামুহে নদীতীরে বেড়িয়ে দেখে আসি। কখনো কোনো অসহায় নারীর দুঃখ দেখি কোনো জনপদে, তার দুঃখ মোচন করার চেষ্টা করি। নীলনদীর জ্যোৎস্নারাত্রে নিরুজ্জ্বলতটে বসে ভগবানের ধ্যান করি। শুধু পৃথিবী নয়, বহু গ্রহে এমনি আমাদের যাতায়াত।

—আপনি যা করছেন, শুধু আপনাদের মত উচ্চলোকের অধিবাসীরাই তা করতে পারেন। আচ্ছা, পৃথিবীর মানুষের কর্তব্য কি ?

—প্রেম—এক গুর মধ্যেই সব।

—আপনি একথা পৃথিবীতে প্রচার করেন না কেন ?

—কতবার প্রচার করা হয়েছে। আমার চেয়ে উচ্চতর ও শক্তিশালী দেবতার মাঝে
দুঃখে পৃথিবীর শত কষ্টের মধ্যেও দেহ ধরে একথা বলতে গিয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান অবতার
গ্রহণ করে নেমে গিয়েছেন বলতে। প্রেম—একটি কথা। কেউ শোনেনি।

—তাহোলে কি আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন ?

—অদ্বুত চরিত্র ভগবানের। বার বার সুযোগ দেন। বিরক্ত হন না। অপূর্ব তাঁর
দৈর্ঘ্য, অপূর্ব তাঁর ক্ষমা। অতঃ কেউ হোলে আর সুযোগ দিত না—কিন্তু নাছোড়বান্দা তিনি।
আবার লোক পাঠান অদ্বুত ধৈর্যের সঙ্গে। তোমাদের পৃথিবীতে ভগবানের তুল্য অবহেলিত
প্রাণী আর কে ? কেউ তাঁর কথা ভাবে না।

এই পর্যন্ত বলেই অপূর্ব ঈশ্বরীয় প্রেমে মহাপুরুষের চোখ ছুটি নক্ষত্রের মত জল জল
করতে লাগলো। পুষ্প অন্ধার ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে বলল—আপনি ঠিক বলেছেন দেব,
পৃথিবীতে কেউ ভাবে না ভগবানের কথা। যে ভাবে সেও টাকা চায়, যশ চায়, সাংসারিক
সুখ চায়। প্রেমভক্তি হুল্লভ হয়ে পড়েছে।

মহাপুরুষ বলেন—প্রেমভক্তি ছেড়ে দাও। ও অনেক উঁচু কথা। অতি সাধারণ ভাবেও
ক'জন ভগবানের চিন্তা করছে। আমি পৃথিবীতে যাই, জনপদে বা তোমাদের বড় বড় নগরে
যাই না। দুনিবার লোভ, অর্থাসক্তি, ঐশ্বর্য-কামনা, নারী, সুরা, কাম, হিংসা-দ্বेष বাতাসে
ছড়ানো ঘন ধোঁয়ার মত। ভাই ভাইএর বুকে ছুরি বসায়। সত্য বিদায় নিয়েছে। পৃথিবীর
এখনকার দর্শন হচ্ছে খাওয়া-পারার দর্শন। কিসে ভাল খাবো, ভাল পরবো। আমি আপন
মনে মনঃভূমিতে বেড়াই জ্যোৎস্নারাজে, হিমালয় কি অতঃ কোন পর্বতচূড়ায় বসে থাকি, নীল-
নদ বড় ভালবাসি তার তীরে একা বসে থাকি। অথচ এক কথা—প্রেম, এই যদি ওরা শিখতো
—জীব প্রেম, ভগবানে প্রেম।

তিনি এই পর্যন্ত বলে চুপ করতে পুষ্প বলল—বলুন দেব, অমৃতের মত বাণী আপনার।

—আমার ? আমার কিসের কল্পা ? এ বাণী স্বয়ং ভগবানের। তিনি অনেক
উঁচু, তাই মাঝে মাঝে দেহ ধরে পৃথিবীতে গিয়ে একথা বলে এসেছিলেন। কেন না মাঝে মাঝে
দেহ ধরে না গেলে মাঝে মাঝে মাধ্যমিক যে অসীমকে গ্রহণ করে ? একবার নয়, বার বার
গিয়েছিলেন। ক্রান্তিহীন তাঁর আশীর্বাদ। কিন্তু কে শুনতে ? ধনজনের মোহে, লোভের
মোহে, বিলাসের মোহে—স্বল ভোগের মোহে সবাই উন্মত্ত। একবারও যদি নির্জনে উচ্চতর
সত্যের ধ্যান করতো মাঝে মাঝে !

যতীন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। আজ এখানে আসা তার সার্থক হয়েছে বটে। সে বলল—তবে
কি তাদের উদ্ধার নেই, দেব ?

—একটা কথা মনে রেখো। জোর করে মাঝে মাঝে ওপর কোনো সত্য, কোনো বাণী
চাপানো যায় না। মাঝে মাঝে তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের বাণী অন্তরালে ধৈর্যের সঙ্গে

অপেক্ষা করে। বুদ্ধিহীন বা স্থূলবুদ্ধি ভোগাসক্ত মন হঠাৎ ভগবানকে গ্রহণ করতে পারে না! পারলেই যে মুক্তি—যে ভগবানকে ভালবাসে, সে ভগবানের সমান হয়ে যায়। এত সহজে তা হবে কোথা থেকে? কাজেই মহাযুগ মন্থস্তর চলে যায় স্বাভাবিক নিয়মে মাহুস্তর মুক্তি পেতে। স্বারোচিষ মন্থস্তরে যারা মাহুস্তর হয়ে জন্মেছিল পৃথিবীতে সর্বপ্রথম—এইবার তারা মানব-আবর্ত কাটিয়ে দেবধান-পথে মহলৌকিকে যেতে শুরু করছে। ওদের এত-দিন পরে পৃথিবীতে গতাগতি শেষ হোল।

—এর চেয়ে আগেও হয়?

—তুমি বুঝলে না—এ তো হোল স্বাভাবিক নিয়মে, লক্ষ বৎসর পরে। এক জন্মেই মুক্তি হয়—যদি সত্যের জন্তে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে, ভগবৎপ্রেমে বহুশিক্ষা জলে ওঠে মনে। এদের জন্তে ভগবান কত সাহায্যের ব্যবস্থা করেচেন, তা যদি জানতে! যে সত্যকে জানতে চায়, ভগবান তাকে জানবার সব রকম সুযোগ দেন। চলো তোমাদের একটা জিনিস দেখিয়ে আনি—ক’দিন থেকে আমি দেখছি তোমাদের পৃথিবীতে—

যতীন ও পুষ্পকে নিয়ে সেই উচ্চলোকের পুরুষটি চক্ষুর নিমিষে পৃথিবীতে নেমে এলেন। সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রি পৃথিবীতে, ভারতবর্ষে। যে নদীতীরে এসে ঠাঁর দাঁড়ালো, সে নদীটি খরশ্রোতা, তীরে শস্তক্ষেতের মধ্যে একজায়গায় বড় একটা গাছ। পুষ্প ও যতীন নদীটি চিনতে পারলে না। বৃক্ষের তলে একটি তরুণ যুবক ধ্যানমগ্ন। যুবকের রং টকটকে গৌর, মুখের চেহারা লালিত্যপূর্ণ, বেশ বড় বড় চোখ—কিন্তু এই অল্প বয়সেই সে দাড়ি রেখেচে—রেশমের যত নরম, চকচকে দাড়ি। যতীনের মনে হোল যীশুখ্রীষ্টের ছবির মত মুখখানা ওর দেখতে।

পুষ্প জিজ্ঞেস করলে—এ কি নদী দেব?

—এ রাতি নদী। এটি ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশ। ছেলেটির বাড়ী ওই জনপদে, সবাই ঘুমলে গভীর রাত্রে নদীতীরে বৃক্ষতলে ও রোজ একা এসে ভগবানের চিন্তা করে, গান করে আপন মনে। ওই ছাখো ওর মা খাবার দিয়ে যায় এ সময়—আসচে—

একটি মেয়ে—মেয়েটি প্রোঁচা বটে, কিন্তু সুন্দরী—দূরের গ্রাম থেকে একটা পাত্রে খাবার নিয়ে এসে ছেলেটির সামনে রাখলে। জিজ্ঞেস করলে—বাড়ী যা’বি?

ছেলেটি বললে—তুমি যাও মা, আমি এক ঘণ্টা পরে যাবো।

—ঠাণ্ডা লাগামনে বেশি, বাচ্চা।

ওর মা স্নেহে ছেলের দিকে ছুঁতিন বার চেয়ে দেখে-পথে এসেছিল সেই পথে চলে গেল এবং অতি অলক্ষণ পরে এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়লো যতীন ও পুষ্পর। আকাশপথ আলো হয়ে উঠলো ক্ষণকালের জন্তে এবং সেই আলোর রেখা ধরে এক দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষ নেমে এসে ওই ধ্যানরত যুবকের পাশে দাঁড়ালেন। আগন্তুক দেবতার রূপে ও দেহজ্যোতিতে স্থানটি ঘন আলো হয়ে উঠলো, যদিও যুবকটি তার কিছুই বুঝতে পারলে না।

পুষ্প ও যতীন সবিস্ময়ে বললে—উনি কে?

—উনি সত্যলোকের প্রাণী। পৃথিবীরা গুঁরা তো দূরের কথা, আমাদেরই আসতে কষ্ট হয়, অথচ ছাখো শুই সত্যপ্রিয় ভগবন্ত যুবকটিকে প্রেরণা দিতে নিজে এফেচেন। যেখানে ভগবানের নামগান হয় সেখানে ভগবান স্বয়ং আসেন—এ তোমরা অবিশ্বাস ক'রো না।

তারপরে ওরা তিনজনেই দূর থেকে সত্যলোকের সেই মহাপুরুষকে প্রণাম করলে। তিনি ওদের দিকে চেয়ে সদয় হাস্ত করলেন ও দুটি আঙুল ওপর দিকে তোলার ভঙ্গিতে আশীর্বাদ করলেন। পুষ্পর চোখে জল এল। কি সুন্দর রূপ দেবতার।

পরক্ষণেই তিনি অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

পুষ্পদের সঙ্গী পুরুষটি বল্লেন—দেখলে ? নীলনদের তীরে বহু হাজার বৎসর পূর্বে যাপিত আমার একটি গোপন রাত্রির কথা আজও আমার মনে হয়। একা ছিলাম সে রাজ্যে। বসন্তকাল ছিল, পুষ্পিত হয়েছিল নদীতীরের ওষধি ও বনতরুরাজি—ক্ষুদ্র একটি পর্বতের চূড়ার নদীর অপর পারে আমি জ্যোতির্ময় আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি। আমার সারাজীবন পরিবর্তন হয়ে যায়—দশ জন্মের প্রগতি একজন্মে সাধিত হয়। ভগবানের রূপা নইলে হয় কি ? কিন্তু তার জন্ত ক্ষেত্র তৈরী হওয়া দরকার। পরকে ভালবাসো, জীবকে সেবা করো। আসক্তি ত্যাগ করো। ভগবানে মন দাও। মনের কুয়াশা না কাটলে সত্যের আলোকপাত কি হয়।

—আপনারা দয়া করুন পৃথিবীর জীবকে—তাহোলেই হবে।

—আমার ইচ্ছা আছে, আর একবার পৃথিবীতে দেহধারণ করবো। যা পারি প্রচার করে আসি।

—পৃথিবীতে গিয়ে ভুলে যাবেন না ?

—দেহ ধরলেই বিস্মৃতি আসে। তবে তার ব্যবস্থা আছে। অল্প দিব্য পুরুষেরা গিয়ে আমার বাল্য ও যৌবনে নানাভাবে মনে করিয়ে দেবেন। গুঁরা দেখা দিতে পারেন আমার স্বপ্নে কিংবা রাত্রিকালে, নয়তো ঘটনার এমন যোগাযোগ ঘটাবেন যে আমার আত্মা ক্রমশ জেগে উঠে বুঝতে পারবে পৃথিবীতে সে কেন এসেছে; ভোজ খেতে, নারী ও সুরা নিয়ে আমোদ করতে আসেনি। ভগবানের বিশেষ এসবের ব্যবস্থা আছে—যে ভাল কাজ করতে চায়, তাকে সাহায্য দেওয়া হয়। তিনি যে বিরাট মহাশক্তি, সেই শক্তিকে তুষ্ট করতে পারলে জীব পলকে প্রলয় করতে পারে, অসাদ্য সাধন করতে পারে, মহাশক্তির সদয় সাহায্য সে পায়। এরহস্ত কে বোঝে ? পৃথিবীতে সবাই অর্থ নিয়ে ব্যস্ত, সর্বত্র অল্পপ্রবিষ্ট এই করুণাময়ী মহাশক্তির রহস্তভেদ করতে বাস্তব ক'জন ?

পুষ্প বল্লেন—প্রভু, আপনি বলছিলেন আপনার গ্রামে একটি মেয়ে ভগবানের দেখা পায়—সে কি রকম ?

—সে উচ্চ অবস্থার মেয়ে। তার শেষ জন্ম হয় পৃথিবীতে, সাতশো বছর পূর্বে। মানব-আবর্ত কাটিয়েছে। স্বামী-ভাবে ভগবানকে চিন্তা করে। ভগবানের দেখা পায় সেইভাবে। আমি জানি ভগবানের এসব মায়িক রূপ। তাঁর রূপের কি কোনো সীমা আছে ? ভগবানকে যে আন্তরিকভাবে ডাকে, তিনি তাঁর কাছে যাবেনই। যে রূপে চায়, সে রূপেই

যাবেন। এ একটা আয়োজ্য নিয়ম। যেমন চুষকের কাছে লোহা ছুটে যাবেই—তেমনি। ভগবান যাবেনই ভক্তরূপ চুষকের কাছে। তাঁকে টেনে নেবে আকর্ষণ ক'রে। ভগবান লোহা, ভক্ত চুষক। এ ওকে টানচে ও একে টানচে। পৃথিবীর লোককে এ সকল কথা বিশ্বাস করানো কঠিন। বিশ্বাস করলে তো মানুষ আর মানুষ থাকে না, ভগবান হয়ে যায়।

ওরা সব মহর্লোকের সেই গ্রামটিতে ফিরে এল। তারপর তিনি ওদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন আবাস-বাটা দেখালেন জনপদের। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে নানা রঙের ফুল, কোনো স্থানে কোনো অপার্থিব পশুর মূর্তি, ক্ষটিকে তৈরি। কোথাও বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী, কোথাও সরোবর। দূরে দূরে এইসব বনবীথি ও উত্তানের মধ্যে মধ্যে অতি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও অট্টালিকা। শুভ ক্ষটিকপ্রস্তুত ছাড়া অত্র কোনো উপাদান এই প্রাসাদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়নি। গাছে গাছে কুসুমিত লতা মাংবার আকারে জড়িয়ে, আরতির পঞ্চপ্রদীপের শিখার মত কোনো কোনো রক্তবর্ণ পুষ্প উর্দ্ধমুখী হয়ে ছুটে আছে। জনপদের কিছুদূরে নিভৃত অরণ্য শিলাবান্ধনো পথের দুপাশে, অথচ সে সব অরণ্যে জুঁই, গোলাপ, কাঞ্চন ফুলের মত দেখতে আলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীর আকারের স্নগন্ধি বনকুসুম অজস্র ছুটে আছে। পাহাড়ের কোলে গুহা ও প্রস্তুতনির্মিত মন্দির—যেন বহুকালের বলে মনে হয়।

ওদের সঙ্গী বল্লেন—ওই সব গুহাতে মহর্লোকের প্রাচীন সাধুরা ভগবানের চিন্তাতে নিমগ্ন থাকতেন। এখন বহুদূর পথে, অনেক উর্দ্ধলোকে তারা চলে গিয়েছেন, পৃথিবীর হিসেবে হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। এখন ওগুলি তীর্থস্থান হিসেবে বিদ্যমান আছে, তবে ওই বনস্থলী, নিভৃত গিরিগুহা ও মন্দিরগুলিতে বসলেই আত্মা স্বভাবত অন্তর্মুখী ও আবৃতচক্ষু হয়ে নিজের হৃদয়কন্দরের অন্ধকার গহনে ডুব দিয়ে নিজের স্বরূপ বুঝতে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

যতীন বল্লে—আচ্ছা, আপনাদেরও কি ধ্যানধারণা সাধনার প্রয়োজন হয়?

—আমরা তো অনেক নিম্নলোকের জীব! সত্যলোকের উর্দ্ধস্তরের দিব্য মহাজ্যোতির্ময় ব্রহ্মস্বরূপ জীবেরাও ধ্যান ও সাধনা দ্বারা আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করেন। ভগবানের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগ সাধিত করেন। আমরা ধ্যান-ধারণা দ্বারা জন, তপঃ ও সত্যলোকের অধিবাসীদের সঙ্গে আদানপ্রদান চালাই। তাঁদের অদৃশ্য সাহায্য প্রার্থনা করি।

—তারা কি আপনাদের কাছেও অদৃশ্য?

—সম্পূর্ণ। বিনা ধ্যান-ধারণায় তাঁদের মত উচ্চ জীবদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সম্ভব নয়। আমাদের চোখে তারা সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

—তাঁদেরও উর্দ্ধে লোক আছে?

—আছে, অনেক আছে। সত্যলোকেরই উর্দ্ধতন স্তরের জীবেরা ঐ লোকের নিম্ন স্তরের জীবদের নিকট অদৃশ্য। তার উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক তার উর্দ্ধে সর্বলোকাতীত পরব্রহ্মলোক বা গোলক। তারও উর্দ্ধে নিগুণ ব্রহ্মলোক—কিন্তু সেখানকার খবর কেউ দিতে পারে না—কেউ জানে না। এসব লোকের তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য—সাধারণ জীবেরা এর খবর রাখে না বা তাঁদের কোনো আবশ্যকও নেই এসবে। তবে আমারও এইসব লোক সম্বন্ধে কোনো

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই—কারো থাকে না। উর্দ্ধলোকের কোনো কোনো দেবতা দয়া করে দেখা দিয়ে যেমন বলেছেন, তেমনি জানি।

—গ্রাম নগর বেঁধে বাস করেন কেন ?

—আমরা বহুযুগ পূর্বের আত্মা। আমাদের সমসাময়িক আত্মা এ লোকে আর নেই। আমরা পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরে উন্নতিলাভ করছি। নিজেদের মনের সাহায্যে এই জনপদ নির্মাণ করে একত্র বাস করি, ভগবানের উপাসনা ধ্যানধারণা করি—সাধ্যমত পৃথিবীতে বা অন্ত গ্রহে গিয়ে স্থল জগতের জীবদের উপকার করবার চেষ্টা করি। পৃথিবীতে যেমন গ্রাম জনপদ, স্থল জগতের এই সব জনপদ, বনবীথি, উদ্ভানেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র সে সব। তাদের বিকার আছে, এদের বিকার নেই।

পুষ্প বল্লে—ভগবানকে স্বামী রূপে পেয়েচে সেই মেয়েটিকে একবার দেখাবেন না ? তাঁর ভাগ্য অদ্ভুত তো !

দেবতা হেসে বল্লেন—ও সব হোল নারীর সাধনা। প্রেমভক্তির সাধনা—ভগবানের মায়িক রূপে দেখা পায়। তুমিও দেখা পেতে পারো কত্না, যদি তোমার প্রেম জন্মে থাকে তাঁর প্রতি। ভগবান কল্লতরু-স্বরূপ, যথার্থ পিপাসু ও আকুল ব্যক্তিকে নিরাশ করেন না। তবে আমি ওগুলোকে পুতুলখেলা বলে বিবেচনা করি। নারীর ধর্ম, পুরুষের নয়। পুরুষ হবে জ্ঞানী, বীর, ত্যাগী।

পুষ্প বল্লে—কিন্তু মনে রাখবেন দেব, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমভক্তির সাধনা শিখিয়েচেন—

—জ্ঞানেরও, কর্ণেরও। তাঁতে তিনেরই অপূর্ব সমন্বয়।

—শ্রীকৃষ্ণকে আপনি যাই বলুন, তিনি প্রেমের দেবতা। প্রেমময়, ভাবময়, সৌন্দর্যময়—এই তাঁর আসল রূপ।

—তুমি, নারী, তোমার পক্ষে ওই ভাবই স্বাভাবিক বটে। তবে জেনে রেখো জগতের বহু গ্রহে বহু জীবকুল বাস করে। ভগবান প্রত্যেক গ্রহে অসীম বিশ্বের সমস্ত জীবকুলের সম্মুখে তাদের ভাবানুযায়ী মায়িক রূপ নিয়ে দেখা দেন। তিনি অসীম, অনন্তরূপী, তাঁর কোনো শেষ নাই ! কত লক্ষ শ্রীকৃষ্ণ আছেন, কত লক্ষ রামচন্দ্র আছেন তোমাদের পৃথিবীর তাঁর মধ্যে—একথা মনে রেখো।

—তাতে কি। সসীম মানুষ তাঁর কোটি কোটি মায়িক রূপ ধারণা করতে পারবে না। একটিমাত্র সুন্দর রূপের ধ্যানে সিন্ধিলাভ করুক। তাহোলেই তাঁকে পাবে তো ?

—নিশ্চয়। এ তো হোল সহজ পথ। ভক্তির পথ সহজ পথ, নারীর পথ। জ্ঞানের পথ বীরের পথ, পুরুষের পথ—সে কথা তোমাকে তো আগেই বলেছি। ভগবানকে পাবে—ও পথেও, এ পথেও।

পুষ্প বল্লে—সেই সহজ সুন্দর পথের সহজ সুন্দর দেবতা শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার মনের গোপন মন্দিরে বিরাজ করেন, তবে আমার জন্মমরণ দ্বন্দ্ব হবে, দেব। জীবনের এপারে বা

ওপারে আর কিছুই চাইনে।

এই সময়ে একটি সুন্দরী নারী সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ অপূর্ণ দিব্যভাব-পরিপূর্ণ। অঙ্গকান্তি তরল জ্যোৎস্নার মত, বড় বড় চোখ দুটিতে অশীম সারল্যা ও অন্তর্মুখিতা। মহাপুরুষ পুষ্পের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে বলেন—এই সেই কন্যা। এর নাম সুমেধা—ভারতবর্ষেরই কন্যা।

পুষ্প প্রশ্নাম করে বলে—দেবি, ভগবানের সখকে কথা হচ্ছিল—

নারী হেসে বলেন—আমি সব শুনেচি—তাঁর স্বরূপ কি শুনবে? আমি খুব ভাল করে দেখেচি। তিনি বালকস্বভাব, পথের বাকি বসে থাকেন উৎসুক হয়ে, ধরা দেবার জন্তে। কিন্তু তাঁর পেছনে ছুটে গেলে তিনি বালকের মত হেসে ছুটে দূরে পালিয়ে যান—

যতীন অভিভূত ও মুগ্ধভাবে বলে উঠলো—বাঃ মা, বাঃ, কি সুন্দর অল্পভূতির কথা!

পুষ্প ও মুগ্ধদৃষ্টিতে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী লাবণ্যময়ী ভাবময়ী নারীর দিকে চেয়ে রইল। কল্পনিখাসে বলে—তারপর? তারপর?

—তারপর কি জানো? সেই সময় যদি তুমি হতাশ হয়ে ছুট দেওয়া বন্ধ করো—তবে ভগবান নিরাশ হবেন, দাঁড়িয়ে যাবেন, বালকের মত। তিনি চান জীব তাঁর পেছনে পেছনে খানিক ছোটো, হাঁপায়! ভগবান জীবের সঙ্গে বালকের মত খেলা করেই মহাখুশি। না থেমে তবুও ছুটলে ভগবান শেষে অকারণেই আবার ফিরে আসবেন, হাসতে হাসতে ধরা দেবেন। অতএব ভগবানকে নিরাশ কোরো না, তাঁকে একটু জীবকে নিয়ে খেলা করতে দাও—তিনি বড় একা—

দেবীর চোখ স্নেহে ও প্রেমে ছলছল করে উঠলো।

পুষ্প বলে—চমৎকার! আজ অতি সুন্দরভাবে বুঝলাম, সহজভাবে বুঝলাম। আপনার অল্পভূতি সহজ বলেই সহজভাবে বুঝেচেন তাঁকে।

যতীনের মন পুষ্পের একথায় সায় দিলে।

ওদের সঙ্গী কিন্তু অন্তর্দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন উদাসীনের মত—যেন তিনি এসব ভাবালুতার বহু উর্দ্ধে জ্ঞান ও তপস্কার দৃঢ়ভূমির উপর স্বপ্রতিষ্ঠ।

যতীন ও পুষ্প তাঁকেও প্রশ্নাম করে বিদায় প্রার্থনা করলে।

মেয়েটি ওদের হাসিমুখে বলে—আবার এসো তোমরা। আমি এখানে শীগগির উৎসব করবো—বনকুসুম-উৎসব। জনলোকের অনেক নারীপুরুষ আসে, সবাই বনফুলের মালা দেন আমার বিগ্রহের গলায়। আমি তোমাদের নিয়ন্ত্রণ পাঠাবো।

পুষ্প বলে—দেবি, কল্প-পর্বতের সঙ্গীত শুনতে যান না আপনি? আবার তো সেদিন আসচে। আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

—আমি প্রতিবারই যাঁই। আমাদের গ্রামের সকলেই যাঁয়। ভগবানের প্রতি অল্পরাগ জন্মায় ওই সঙ্গীত শুনলে—অত্যন্ত সূক্ষ্ম অল্পভূতির দরজা খুলে যায় বলে অনেক উচ্চস্তরের নরনারী আসেন সেদিন। যেও সেখানে—আমিও যাবো।

গ্রামের প্রান্তে বনবীথির অন্তরালে একটি শুভ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে মেয়েটি ওদের দুজনকেই নিয়ে গেল। সেখানে পা দিয়েই পুষ্প বুঝতে পারলে এ অতি পবিত্র স্থান—দেবতার আবির্ভাব দ্বারা এর অল্প-পরমাণু ধনু ও কৃতার্থ হয়ে গিয়েচে, এখানে এসেই তার মনে হোল এখানে নির্জনে বসে ভগবানের চিন্তা ও ধ্যান করি। রঘুনাথ দাসের আশ্রমের মত এর পুণ্যময় প্রভাব।

মেয়েটি হঠাৎ বলে—সমুদ্র দেখবে ভাই ?

পুষ্প অবাক হয়ে বলে—কোথায় ?

—ওই দিকটা—

পুষ্প সতাই দেখলে সেই বনবীথির ওপারে বিশাল সুনীল মহাসাগর ঢেউএর ওপর ঢেউ তুলে বহুদূরে দিগন্তে মিশে গিয়েচে—কোনো কূল নেই, কিনারা নেই। তার অনন্ত জল-রাশির ওপর নীল মহাব্যোমের প্রতিচ্ছায়—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, সমুদ্রতীরে এক শিলাখণ্ডে বিশালবৃক্ষতলে মেয়েটি ওর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালে। পুষ্পের মনে হোল ওর সমস্ত সত্তা এই অনন্ত মহাসমুদ্রের কুলরেখা ধরে বহুদূর অনন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, জগৎস্বপ্ন যেন লয় হয়ে যাচ্ছে স্বসংবেগ আত্মানুভূতির শান্ত গভীরতায়। মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠলো মুখে আঁচল দিয়ে। কি মধুর হাসি তার সুন্দর মুখের! বলে—কেমন ঠিকিয়েচি ভাই ?

পুষ্প বলে—সমুদ্র কোথা থেকে এল এখানে ? আমিও তাই ভাবচি।

—সমুদ্রতীরে এই গাছতলায় বসলে তাঁর কথা বড় মনে হয়—তাই তৈরি করে রেখেচি।

—সব সময় থাকে ?

—সব সময়। তবে অল্প কেউ আমার মনের ভূমিতে না পৌঁছুলে দেখতে পার না। আমার কাছে সর্বদাই সত্যি—অন্তের কাছে অবাস্তব।

—এ গ্রামের অন্ত লোকের কাছেও ?

—আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পার না। তুমি ভাই ভালবাসবে বলে তোমাকে আমার ভূমিতে নিয়ে এসে দেখালাম। বলো ভালো ?

—আপনাকে আমি কি বলে ধন্যবাদ দেবো জানিনে দেবী। কত ভালো যে লাগচে এই বন, এই পাথরের বেদী, এই নীল সমুদ্র—এখানে ভগবানের আশাযাওয়ার পায়ের চিহ্ন আছে।

—আছেই তো। উনি যে আসেন লুকিয়ে আমার কাছে। জানো না ভাই ?

মেয়েটির গলার সুরে পুষ্পের মমতা জাগলো। শ্রদ্ধাও। এই শিলাস্তুত সমুদ্রবেলায় দেবতার শুভঙ্কর আবির্ভাবের কথা লেখা রয়েছে। পুতুলখেলা হয়তো। হোক পুতুলখেলা। সে নারী, এই তার ভাল লাগে।

সে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করলে—আচ্ছা, একটা কথা বলুন। মেয়েরা কি খাবাপ ? পাথবীতে কেন একথা সাধু-মহাজন বলে এসেচেন ?

—মেয়েরা সাধনপথের বিদ্ব, তাই।

—কেন ?

—বিলাস্ত করে দেয় পুরুষের মন। প্রকৃতির কাজ করবার ভুলে মায়ার সৃষ্টি করে। পুরুষেরা মজে অতি সহজেই। সখি, তোমার এই মুখখানি নিয়ে এই মহলৌকেই একবার পরীক্ষা করে রাখো না ?

—সত্যি আমরা কি এতই হেয় ?

—হেয় বা খারাপ এমনি হয়তো কিছু না, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া। যে ভগবানকে পেতে চায়, যে জ্ঞানের সাধনা করতে চায়, ভক্তির সাধনা করতে চায়—সে নারী থেকে দূরে থাকবে, এই বিধান। অন্ত্র লোকে যত খুশি মিশুক—কে বারণ করচে ? সাধনার পথের পথিক যারা নয় তাদের কি বাধা আছে নারীসঙ্গের ? নারী প্রেমের সাধিকা হয় অতি সহজে, পুরুষে তা পারে না। নারী পাপের পথেও নিয়ে যায়, কল্যাণের পথেও নিয়ে যায়। কারণ, চিত্তনন্দী উভয়তোমুখী, বহতি পাপায়, বহতি কল্যাণায়। খুব সাবধানে না চললে সর্বনাশ আসে ওদের থেকে। সাপ খেলাতে সুবাই জানে না। আনাড়ি সাপুড়ে সাপের হাতে মরে।

—স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ কি চিরকালের ?

—যেখানে প্রেম থাকে। নয়তো কিসের সম্বন্ধ ? যেখানে প্রেম আছে, প্রেমের দেবী মিলিয়ে দেন। স্বামী-স্ত্রী না হোলেই বা কি। প্রেম নিয়ে বিষয়—কিন্তু এ ধরনের প্রেম সাধনালব্ধ বস্তু। দেহের বা রূপের মোহ এ প্রেমের জন্ম দিতে পারে না। রূপজ প্রেম দিয়ে প্রকৃতি তার কাজ করিয়ে নেয় মাত্র।

—আপনি কি করে এসব জানলেন ?

মেয়েটি হেসে হেসে বললে—কত ঘে ঠেকেছি ভাই কত শত জন্ম ধরে। কত নেমে গিয়ে-ছিলাম, কত ভুগেছিলাম—জন্ম-জন্মান্তরের সে সব স্মৃতি ও সংস্কার আমাকে জ্ঞানী করেছে। একজন্মে দুজন্মে সাধু হওয়া যায় না ভাই—মহলৌকেও আসা যায় না—

—আবার আপনি জন্মাবেন ?

—পৃথিবীতে আমার শেষ জন্ম হয় বহুকাল আগে—পৃথিবীর সে হিসেব ভুলে গিয়েছি। আর সেখানে যাবো না। ভগবান আমার দয়া করেচেন।

—যদি আপনার মত মেয়ের দরকার হয় পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার ?

—সে অবস্থায় ভগবানের নির্দেশ পাবো। জীবের সেবা করবার ভার—সৌভাগ্যের কথা সে। তিনি যদি আমায় না ছাড়েন ভাই, নরকে যেতেই বা কি ? উনি হাত ধরে নিয়ে গেলে নরক আর বলি কোথায় ! কিসের স্বর্গ কিসের নরক ? থাকুন তো উনি আমার সঙ্গে !

মেয়েটির চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো দর-দর ধারে।

পুষ্প অবাঁক হোল ওঁর অল্পভূতির তীরতায়। শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে ভরে উঠলো তার মন।

মেয়েটি আবার বললে—ভগবান এই আলোর কমল বিশ্বজগৎ হয়ে ফুটে আছেন। তাঁর করুণার আলো। কাউকে তিনি ভোলেন না, অবহেলা করেন না ভাই—তাঁর মত প্রেমিক

কে? যে ডাকে, যে তাঁর শরণ নেয়, তিনি তারই দোরে ছুটে যান, পাপী-পতিত মানেন না। কিন্তু ভাই, কেউ কি তাঁকে চায়?

সমুদ্রতীরের বিশাল বৃক্ষতলে নীল উষ্ণিমালার দিকে চেয়ে ওরা দুজন দাঁড়িয়ে। মেয়েটি সুন্দর ভঙ্গিতে হাত তুলে দূরে দেখিয়ে বলে—ওই মহাসমুদ্রের মত অন্তহীন তাঁর করুণা! কেউ বুঝতে পারে না, বলে তাঁকে নিষ্ঠুর। তিনি ছুঁতিন জন্মের মঙ্গল করেন একজন্মের কর্তৃক্ষয় করে। পৃথিবীর লোকে সত্ত্ব সত্ত্ব ফল চায়। বোঝে না তিনি কি করতে চাইছেন। ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে অনেক সময় আসে তাঁর করুণা। কাজেই অবুঝের গালাগালি তাঁকে সহ করতে হয়।

পুষ্প বলে—আপনি দেবী, কি আনন্দ হোল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। আমার সঙ্গী মহলোকে বেশিফণ থাকতে পারবেন না, জ্ঞান হারিয়ে কেলবেন। আজ আমি যাই—

—আবার এসো ভাই, আসবে ঠিক? আমার পায়ে হাত দেওয়া কি ভাই? তুমিও তো কম নও। আমি তোমাকে চাই। এসো—আনন্দে থাকো ভাই।

মেয়েটির অব্যর্থ আশীর্বাদ। সত্যিই এক অপূর্ণ আনন্দের প্রসন্ন হিল্লোল বয়ে গেল পুষ্পের মনে। এ জগতে ভয় নেই, অমঙ্গল নেই—মেয়েটি বলেচে, ভগবানের আশীর্বাদ রয়েছে বিশ্বের ওপরে।

কিরে এসে বুড়োশিবতলার ঘাটে বসে সেদিন সন্ধ্যায় পুষ্প যতীনকে ওই অদ্ভুত মেয়েটির গল্প শোনালে।

সেদিন কিরে আসবার পর আরও কিছুকাল কাটলে। বুড়োশিবতলার ঘাটে যে সংসার পেতেছিল পুষ্প, তাতে যেন ভাঙন ধরেচে। আজ সাত বছর আগে প্রথম যেদিন যতীন এখান আসে, সেদিনটি থেকে পুষ্পের কত সাধ, কত আনন্দ, ছেলেবেলার সেই প্রিয় সাথীকে নিয়ে এখানে সংসার পাতবে। তাই অনেক আশা করে সাজিয়েছিল বুড়োশিবতলার ঘাটের সংসার।

ওপারের শ্রামাসুন্দরীর মন্দিরে আরতি-ঘণ্টাধ্বনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প আগে নিজেদের ঘরে প্রদীপ দেখায়, গৃহদেবতার সামনে স্নগন্ধি ধূপ জালিয়ে ফলফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করে, মনে মনে দেবদেবীকে স্মরণ করে। রঘুনাথদাস ওকে একটি সুন্দর ক্ষটিক-বিগ্রহ এনে দিয়েছেন, তিনি বলেন একজন শিল্পী মননশক্তি দ্বারা ভূবলোকের পদার্থে ইচ্ছামত রূপান্তর ঘটিয়ে এই সব দেবদেবীর মূর্ত্তি তৈরি করেন—এই লোকেরই চতুর্থ স্তরে কোথায় তিনি থাকেন। পুষ্প বলেছিল একদিন সেখানে গিয়ে দেখে আসবে।

কিন্তু কি জানি পুষ্পের ভাগ্যে কোথায় যেন কি গোলমাল আছে। সব মিথ্যে হয়ে যায় কেন? হঠাৎ আশা বোঁদিদি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সেই মুহূর্ত্তেই পুষ্প টের পেয়ে গেছে। কিন্তু আশ্বর্থ্যের বিষয় যতীন তার কিছুই জানে

না। যতীনের মুখের দিকে চেয়ে ওর কষ্ট হোল। আশা প্রারন্ধ কর্ত্তের ফলে ভুবলোকের কোন নিমন্তরে হয়তো ঘুরচে—যতীনদার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয় এ অবস্থায়, পুষ্প এ সত্য বুঝেচে।

সুতরাং মিছিমিছি কেন যতীনদাকে আশার মরণের কথা জানিয়ে কষ্ট দেওয়া। পৃথিবীতে থাকলেও তারা যেমন কোনো সাহায্য করতে পারেনি, এখানেও ঠিক তেমনি অবস্থা দাঁড়াবে। এ-লোকেও নিমন্তরের অধিবাসী আশার কাছে সে ও যতীনদা যেমনি অদৃষ্ট ছিল পৃথিবীতে থাকতে, তেমনিই থাকবে।

কিন্তু আশা কোথায় আছে একবার দেখা দরকার।

সেদিন সে রঘুনাথদাসের কাছে গেল, যতীনকে কিছু না জানিয়ে। দেখা পাবে কিনা সন্দেহ ছিল, কারণ এ সব মহাপুরুষ নিজের খেলালে থাকেন, আজ আশ্রম আছে, কাল নেই। সর্বপ্রকার মায়াবন্ধনের অতীত এঁরা। ভগবানের দেহে লয় না হয়ে ভক্তিসেবার জন্তে চিরময় আশ্রমে চিরময় বিগ্রহ স্থাপন করে সেবামৃত আনন্দ করচেন মাত্র। আজ আছেন, কাল হয়তো নাস্তি। দেখাই যাক্।

রঘুনাথদাস আচাৰ্য্যকে তার বড় ভাল লাগে। প্রেমে স্নেহে বালকস্বভাব বৃদ্ধ সাধু ঠিক যেন তার বাবার মত। আজ তার মনে হোল এ বিপদে এঁরই আশ্রয় নিতে হবে। অতি উচ্চস্তরে সাধুর আশ্রম, সেখানে পৌছোনো তার পক্ষে সব সময় সহজও নয়—তবে ভগবানের কৃপা ভরসা।

আশ্রমটি একটি বিশেষ মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। সাধুর আবাসস্থানের মাহাত্ম্যো দূর থেকেই পুষ্পের মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হোল—এ ভাব সে পূর্বেও এখানে আসবার সময় গাঢ় ভাবেই অনুভব করেছে। সেই অপূৰ্ণ আনন্দরস বার বার জন্মমৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত, কোন্ লীলাময়ের অনন্ত লীলারাজ্যে সে নিত্য অভিসারিকা চিরযৌবনা প্রেমিকা... জগন্নাথের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভের পার্শ্বচরিত্রী।

সেই খেত ক্ষটিকের দুগ্ধবল গোপাল-মন্দিরটি দূর থেকে দেখেই পুষ্প উদ্দেশে প্রণাম করলে। মন্দিরের চারিপাশের পুষ্পবাটিকাতে কত ধরনের ফুল ফুটে আছে, পূৰ্ব্বপর্য্যন্ত এই সুন্দর লতাকুঞ্জটিতে রঘুনাথদাস বসে নামগান করতেন। এবার তিনি একা নন, দুটি বালক ও দুটি উদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী কুমারী সেখানে বসে তাঁর সঙ্গে হাততালি দিয়ে গানে যোগ দিয়েচে। কেমন চমৎকার সুগন্ধ এখানকার! সেবারও এখানে আসতেই পুষ্প পেয়েছিল—অশুষ্ক, চন্দন, সুগন্ধ ধূপের ঘোঁষা, কত কি ফুলের সুবাস মিলে এই স্বর্গীয় সুগন্ধটার সৃষ্টি করেছে। আশ্চর্য্য, কোনো পার্থিব ধরনের বাসনা একেবারে থাকে না—এই সুমধুর গন্ধময়, নিমন্তক, চিরশান্তিময় পরিবেশের মধ্যে।

ওকে দেখে রঘুনাথদাস বল্লেন—এসো মা। আমি তোমার কথা ভাবছিলাম, বোসো।

পুষ্প ঠুঁকে প্রণাম করতেই আচাৰ্য্য বল্লেন—অপূনর্ভব হও।

বিস্ময়ে পুষ্প শিউরে উঠে বল্লেন—কি বল্লেন আচাৰ্য্যদেব। ওকি কথা?...জানেন—

তিনি হেসে বলেন—ঠিক বলেছি মা।

—আপনি তো জানেন, আমার বাসনা কামনা কিছুই এখনো যারনি, পৃথিবীতে আমার যাতায়াত বন্ধ হোলে কি করে চলবে? বলুন আপনি। জন্ম এখন থেকেই বন্ধ হবে?

রঘুনাথদাস পুস্পের গায়ে সম্মেহে হাত বুলিয়ে অনেকটা ঘেন আপনমনে স্থর করে বলেন—

কিয়ে মালুখ জনমিয়ে পশুপাখী, অথবা কীটপতঙ্গে

করমবিপাকে গতাগতি পুনপুন মতি রহ' তুয়া পরসঙ্গে।

এমন দিব্য মধুর স্থরের সে গান, বিজ্ঞাপতির বাণী যেন মূর্ত হয়ে উঠলো সুগায়ক রঘুনাথদাসের কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে।

তারপর পুস্পকে বলেন—যাও, গোপালকে দেখা দিয়ে এসো। বড় অভিমানী—সামলে রাখতে হয়।

পুস্প হেসে বলে—ওসব আপনার সঙ্গে, কই আমাদের সঙ্গে তো কোনোদিন একটা কথাও—

—হবে। দেখতে পাচ্ছি মা, দেখতে পাচ্ছি। গোপালের চিহ্নিত সেবিকা তুমি। সাধে কি বলেছি অপুনর্ভব হও? আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা বার হয়নি।

—আপনি বুড়ো দাছ হয়ে বসে আছেন, দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছেন কেন? ও রকম বলে মেরের অপরাধ হয় না?

বুদ্ধ প্রশন্নমুখে বলেন—ঠিক মা ঠিক। যাও দেখে এসো—

একটু পরে পুস্প আবার এসে তাঁর কাছে বসলো। এখানে সে কিজন্তে এসেছিল, তা যেন ভুলে গিয়েচে। এ পবিত্র আশ্রমে বসে কি করে ঐ সব কথা বলবে! হয়তো শেষ পর্যন্ত বলতে পারতো না, কিন্তু রঘুনাথদাসই বলেন—তোমাকে অস্বমনস্ক বলে মনে হচ্ছে কেন?

—আপনি অন্তর্যামী, সব জানেন। লজ্জা করে আপনাকে মুখে বলতে—

রঘুনাথ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসে রইলেন চোখ বুজে। তারপর গম্ভীরভাবে বলেন—কি চাও মা?

—দেই হতভাগীর সঙ্গে দেখা করতে বড় ইচ্ছে হয়। কি ভাবে আছে,—যদি কোনো উপকার করতে পারি।

—দেই মেরেটি প্রেতলোকে রয়েছে। তার চোখ খোলেনি, মনও অপরিণত। তার ওপর আত্মহত্যা-রূপ মহাপাপের ফলে প্রকৃতি একটা প্রতিশোধ নেবে।

—একবার দেখা হয় না?

—সে কোথায় আছে জানি না। ভূবল্লোকের নিয়ন্ত্র, যাকে সাধারণত নরক বলে থাকে পৃথিবীর ভাষায়—সে অনেক বড় জায়গা। তারও আবার অনেক স্তর আছে—চলো দেখি—

—প্রভু, আমার সঙ্গে তার একভাবে খানিকটা যোগ আছে, সুতরাং আমি গেলে তাকে বার করা সহজ হবে।

—ওসব না। সে যেহেতু পৃথিবীর যে গ্রাম থেকে এসেচে—তারই নিকটবর্তী কোনো নিম্নলোকে ভ্রাম্যমাণ। স্থল ধরনের বাসনা-কামনা নিয়ে পৃথিবীর আকর্ষণ ছেড়ে উর্দ্ধলোকে ওঠা অসম্ভব।

একটু পরে পুষ্প রঘুনাথদাসকে নিয়ে প্রথমে এল কুড়ুলে-বিনোদপুর, সেখানে কোন সন্ধান না পেয়ে গেল আশার বাণের গ্রাম রত্নপুরে। কয়েকটি নিম্ন শ্রেণীর ধূসরবর্ণের আত্মা গ্রামের বাঁশবনে, তেঁতুলগাছের ডালে, মাঠের মধ্যে বাবলা গাছে পা ঝুলিয়ে বসে হাওয়া খাচ্ছে। একটি চুপ্ত আত্মা গ্রামস্থ ব্রাহ্মণপাড়ার পুকুরপাড়ের এক নোনা গাছে বসে স্নানরতা স্ত্রীলোকদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। প্রায় তুরীয় অবস্থায়। পুষ্প মনে মনে হেসে বল্লেন—ভাখো পোড়ারমুখের কাণ্ড! ইচ্ছে হয় গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে আসি—হাঁ করে ঘেন কি গিলচে—হি—হি—

অবিশ্রি ওই সব নিম্নস্তরের আত্মার কাছে তারা অদৃশ্যই রইলো।

রঘুনাথদাস বল্লেন—চলো, এখানকার কাছাকাছি নিম্নলোকে—এখানেই, আছে।

অল্প পরেই ওরা এক বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তরের দ্বারা উষ্ণ স্থানে এসে পড়লো। তার চতুর্দিকের চক্রবাল-রেখা ধূমবাস্পে সমাচ্ছন্ন—যেন মনে হয় কাঁচা বনে লতাপাতা পুড়িয়ে অজস্র ধূমসৃষ্টি করে দাবানল জ্বলচে। অথচ অগ্নিশিখা দৃশ্যমান নয়—শুধুই মরুময় ধূ ধূ প্রান্তর, মাঝে মাঝে বৃক্ষলতাহীন প্রস্তরস্তূপ। ওরা সেই জনহীন মরুদেশের ওপর দিয়ে শূন্যপথে ধীরগতিতে যেতে যেতে দেখলে সে রাজ্য সম্পূর্ণরূপে জনহীন, জলহীন, বৃক্ষলতাহীন। সেখানকার আকাশ নীল নয়, ঘোলাটে ঘোলাটে শুভ্র লঘু বাস্পে ঢাকা। পুষ্পের মনে হোল ভাঙ্গা মাসের গুমটের দিনে পৃথিবীর আকাশে যেমন সাদামেঘ জমে থাকে—অনেকটা তেমনি।

পুষ্প বল্লেন—এই জায়গাটা যেন কেমন বিশ্রী—

রঘুনাথদাস বল্লেন—এই সব ভুবলোকের নীচ স্তর, পৃথিবীতে যাকে নরক বলে। এ অনেকদূর ব্যোপে রয়েছে—হাজার হাজার ক্রোশ চলে যাও, পৃথিবীর ঠিক ওপরে পৃথিবীর চারিপাশ ঘিরে এ রাজ্য বর্তমান। অথচ পৃথিবীর লোকের কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। এখানকার বাসিন্দারা আবার ভুবলোকের কোনো উচ্চ স্তর দেখতে পায় না।

—হাজার হাজার ক্রোশ! এমন জনহীন!

—তারও বেশি। যতদূর চলে যাও, এ অদ্ভুত লোকের আদি-অন্ত পাবে না। বহু হাজার ক্রোশ চলে যাও, এমনি। এ কোনো বাইরের অবস্থা নয়। এখানকার বাসিন্দাদের মানসিক-অবস্থা-প্রসূত। এরাও অনেক সময় ষড়দূর যায়—এ জনহীন মরু-পাথারের দেশের আদি-অন্ত পায় না খুঁজে, অস্ত্র কোন প্রাণীকেও দেখতে পায় না। চন্দ্র নেই, সূর্য নেই, তারা নেই—এই রকম চাপা আলো—কখনো কালো হয়ে আসে, ঘোর কালো, পৃথিবীর অমাবস্তার মত। উপনিষদে এ লোকের কথা বলে গিয়েচে—অহর্য্য নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্তা

—এই সে ভীষণ অন্ধ-তমিস্রা লোক—একশো বছর পর্য্যন্ত হয়তো টিকে যায় সেই অন্ধকার কোন কোন পাপী আত্মার কাছে। সে হতভাগ্য আশ্রয় ও আলো খুঁজে, সঙ্গী খুঁজে হয়রান হয়ে পড়ে।

পুষ্প শিউরে উঠলো। অস্পষ্ট স্বরে বললে—একশো বছর ধরে অমাবস্তা!

রঘুনাথদাস হেসে বললেন—কল্পা, জন্ম-মরণ-ভীতি-ভ্রংশী শ্রীকৃষ্ণমুরারির শরণ নাও—যেন এখানে কোনদিন আসতে না হয়। এ হোল হিরণ্যগভদেদের রাজ্য, তিনি এখানে শাসক ও পালক।

—তিনি কে?

—ব্রহ্মের তিন রূপ—স্থূলরূপে বিরাট, সূক্ষ্মরূপে হিরণ্যগর্ভ, কারণ-স্বরূপ ঈশ্বর।

—প্রভু, পৃথিবীর গ্রহদেব বৈশ্রবণ কে?

—তিনি পূর্ব্বকল্পের মহাপুরুষ। পৃথিবীর প্রজাপতি।

—তবে আপনার গোপাল কে?

রঘুনাথদাস প্রসন্ন হাস্তে বললেন—গোপাল সব। আমি শুকেই জানি। ওই ব্রহ্ম, ওই আত্মা, ওই ভগবান। আমি আর কারো খবর রাখিনে। ব্রহ্মের সাকার রূপ, জ্ঞানচক্ষে দেখলে মায়িক রূপ বটে। কিন্তু আমার চোখে গোপাল ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ করে রেখেছে। আমার আর কোনো তত্ত্বে দরকার কি। ভক্তির চোখে ভাবের চোখে দেখতে শেখো ভগবানকে। তাঁর ঐশ্বর্য্য ভুলে যাও। তাঁকে বন্ধু ভাবো, পুত্র ভাবো, পতি ভাবো—এমন কি দাস ভাবো।

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বললে—দাস ভাববো? কি বলেন ঠাকুর!

রঘুনাথ চীৎকার করে বললেন—কেন ভাববে না? দাবি করে ভাবো। প্রেমের সঙ্গে দাবি করে ভাবো। তিনি ভক্তের দাসত্ব করেচেন—করেন নি? তিনি যে প্রেমের কাড়াল—তাঁকে যেভাবেই ডাকো, ডাকলেই সাড়া দেবেন। তবে প্রেমের সঙ্গে ডাকা চাই। ভয় করে ডেকো না। ভয় করবার কিছু নেই তাঁকে।

পুষ্প মেয়েমানুষ, এ সব কথায় ওর চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়লো। যুক্ত-করে নমস্কার করে বললে—আপনার আশীর্ব্বাদ, ঠাকুর। নরকে এ কথা বললেন, নরক যে পূণ্যস্থান হয়ে উঠলো!

এমন সময় পুষ্প দেখতে পেলে আশাকে। একটা কালো পাথরের অমূল্যের টিলার ওপর সে মলিনমুখে চূপ করে বসে আছে।

রঘুনাথদাস বললেন—তুমি যাও মা। আমি এখানে থাকি।

—কিন্তু আমাকে যে ও দেখতে পাবে না?

—পাবে, যাও। কিন্তু একটা কথা মা—

—কি?

—ওই কষ্টাটির এখনও জ্ঞান হয়নি।

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বলে—সে কি প্রভু! ও তো দিবা জেগেই বসে আছে।

—ও মেয়েটি ধূম্যান দক্ষিণমার্গের পথিক। ওর গতির পথ বেকে আছে ধনুকের মত পৃথিবীর দিকে। তুমি দেবতে পাচ্চ না মা! ও অল্পদিন হোল পৃথিবী থেকে এসেচে—তার ওপর স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু হয়নি। আত্মহত্যা করেছে। ওর মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণাই হয়নি। যাও, কাছে গিয়ে বুঝতে পারবে।

পুষ্প কাছে যেতেই আশা বলে—তুমি যাবার কে গো? হ্যাঁগো, এটা কি আলিপুরের বাগান?

পুষ্প সম্মুখে বলে—কেন বৌদি? এটা কি বলে মনে হচ্ছে?

—বাড়ীওয়ালী মাসী বলেছিল আলিপুরের বাগান দেখাতে নিয়ে যাবে। সেখানে একটি কি বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে। আমি বলি, ছি ছি কি ঘেরা, বলি—নেতাদার সঙ্গে চলে এসেছিলাম সে আলাদা কথা। অল্প বয়েনে বিধবা হয়েছিলাম, কে খেতে পরতে দেয় সংসারে...না হ্যাঁ, সত্যি কথা বোলবো। মা বুড়ী হয়েচেন, তাঁর ঘাড়ে আমার আর একটি বিধবা দিদি...আচ্ছা, মাহেশের রথতলা এখন থেকে কতদূর? তুমি কে?

পুষ্প ওর পাশে গিয়ে বসলো। ওর দিকে সম্মুখে দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—আমি তোমাকে চিনি। তুমি আমার বৌদিদি হও।

—তা এখানে কি মানুষ নেই? এটা কোন্ জায়গা? খিদে-তেষ্ঠা পেয়েচে কিন্তু একথানা খাবারের দোকান নেই। মাহেশের রথতলাতে আমার এক দূর সম্পর্কের ভগ্নীপতি থাকে। সেখানে যাবার খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু এই অবস্থায় যেতে লজ্জাও করে—

—তুমি এখানে এলে কার সঙ্গে?

—এলাম কার সঙ্গে তা মনেই পড়ে না। একদিন বাড়ীওয়ালী মাসী বলে—তোমার আলিপুরের বাগানে নিয়ে যাবো—সেখানে একটি বাবু তোমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে চায়। ঘরে সেদিন কিছু খাবার নেই। বাড়ীভাড়া কুড়ি টাকার জন্তে তাগাদা করে করে বাড়ীওয়ালী তো আমার মাথা ধরিয়ে দিতে লাগলো। রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে শুলাম, তারপর যে কি হোল, আমার ভাল মনে হচ্ছে না।

—বাড়ীওয়ালী তোমার আলিপুরে নিয়ে গিয়েছিল?

—কি জানি ভাই, তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। এখানে আজ ক'দিন আছি তাও মনে নেই। খিদে-তেষ্ঠা পেয়েচে—অথচ খাবার পাইনে। না আছে একটা লোক, না আছে একটা দোকান-পসার। আচ্ছা, এর বাজারটা কোন্ দিকে?

পুষ্প কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—আশা বৌদি, যতীনদাকে মনে পড়ে?

আশা কেমন যেন চমকে উঠে ওর দিকে অলক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে বলে—তুমি তাঁকে কি করে জানলে?

—জানি আমি। দেশের লোক যে গো! একগায়ে বাড়ী।

আশার ছুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। হাত দিয়ে মুছে বললে—তিনি স্বর্গে চলে গিয়েছেন, তাঁর কথা আর আমার মুখে বলে কি লাভ?

—সে কথা বলচিনে বৌদি, সত্যি কথা বলো তো আমার কাছে, তাঁর কথা তোমার মনে হয় কি না?

আশা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললে—হয়। যখন হয় তখন বুকের মধ্যে কেমন করে উঠে—

—কেন বৌদি?

—আমি হতভাগী তাঁকে একদিনও সুখ দিইনি। তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, বুঝতাম না—কেবলই বাপের বাড়ী এসে থাকতাম স্বশ্রবণবাড়ী থেকে—

—কেন?

—স্বশ্রবণবাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট পেতাম। ছেলেমানুষ তখন—

—তোমার একথা সত্যি নয় বৌদি। আমার কাছে সব খুলে বলো না ভাই?

আশা চুপ করে নখ খুঁটতে লাগলো। এ কথার কোনো জবাব দিলে না। পুষ্প বললে—বলবে না ভাই?

আশা বললে—কি হবে শুনে সে সব কথা। আমার বুদ্ধির দোষেই যা কিছু সব হয়েছে। আমি আমাদের গ্রামের মজুমদার-পাড়ার একটা ছেলেকে ভালবাসতাম।

—বিয়ের আগে থেকে, না বিয়ের পরে?

—বিয়ের আগে নয়, কিছুদিন পরে।

—বিয়ের পরে অল্প কারো সঙ্গে ভাব করতে গেলে কেন? এটা খুব অজায় হয়েছে তোমার বৌদিদি। হিন্দুর মেয়ে, দ্বিচারিণীর ধর্ম কে শেখালে তোমায়?

আশা চুপ করে রইল। পুষ্পের কড়াঅুরে বোধহয় একটু ভয় খেয়েই গেল।

—কথার উত্তর দিলে না যে?

—আমার অদেষ্ঠ ভাই। ও কথার কি উত্তর দেবো?

—কিন্তু আমি তোমায় বলছি তুমি এখনও সেই লোকটাকেই ভালবাসো। যতীনদার ওপর তোমার কোনো টান নেই। আমি সব বুঝতে পারি ভাই। আচ্ছা, তোমার ঘেমা হয় না? যার জন্তে এত কষ্ট, যে তোমাকে কেলে চলে গেল, যার জন্তে তোমাকে আকিং খেয়ে মরতে হোল, আবার সেই ইতর লোকটার জন্তে এখনও ভাবনা? যতীনদা দেবতার মত স্বামী তোমার, তাকে একদিন দেখলে না মরবার সময়ে, তার কুলে কালি দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে এলে—

আশার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বললে—আকিং খাওয়ার কথা তো কেউ জানে না— তুমি কি করে জানলে? আমি তো—

—আকিং খেয়ে তুমি মারা গিয়েচ বৌদি। তুমি বেঁচে নেই—মরে প্রেতলোকে এসে কষ্ট পাচ্চ—

আশা এবার যেন খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। এটা তাহলে ঠাট্টা! তবুও আফিং খাওয়ার কথা এ কি ভাবে জানলে! পরক্ষণেই একথা ওর মনে হোল—কে এ মেয়েটা, গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেচে? এত হাঁড়ির খবরে ওর কি-ই বা দরকার? ওর গলা ধরে কে কাদতে গিয়েচে তা তো জানি নে। সে যা খুশি করেছে, তার জন্তে ওর কাছে এত কৈফিয়ৎ দেবার বা কি গরজ। শশুরবাড়ীর লোক বোধ হয়, ওই গাঁয়েরই মেয়ে—তাই এত গায়ে ঝাল।

মুহু হেসে বলে—তা যাই বলো ভাই—মরে ভূত হওয়াই বই কি এক রকম—

পুপ্প দৃঢ়কণ্ঠে বলে—তা নয়। আমি ঠাট্টা করিনি। মারা তুমি গিয়েচ। আফিং খেয়ে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে ছিলে কলকাতার বাগান, মনে নেই? তারপর তুমি মরে যাও, মরে এই প্রেতলোকে এসেচ।

আশার মুখে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও সন্দেহতার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে ও বলে—এখনও বিশ্বাস হোল না বৌদি? আচ্ছা, তোমার বিশ্বাস করাবো। চলো—তোমাদের গাঁয়ে তোমাদের বাড়ী যাবে?

আশা কিছু না ভেবেই বোঁকের মুখে বলে—সেখানে আর কি মুখ নিয়ে যাবো—

—গেলেও কেউ টের পাবে না। সত্যি-মিথ্যে চলো চট্ট করে পরীক্ষা করে নিয়ে আসি। তোমার প্রেতদেহ হয়েছে। এ দেহ পৃথিবীর মানুষের চোখে অদৃশ্য।

পুপ্পের কথার ভাবে ও সুরে আশা কি বুঝলে যেন, ওর হঠাৎ ভয়ানক আতঙ্ক হোল। কি সব কথা বলে এ! যদি সত্যিই তাই হয়? সে যদি সত্যি মরেই গিয়ে থাকে?

ঠিক সেই সময় একটি নিয়ন্ত্রণের প্রেত ছুটি অল্পবয়সী মেয়েকে একাকী দেখে পূর্বসংস্কার বশত ওদের দিকে ছুটে এল। মুখে দু-একটি অলীক কথাও উচ্চারণ করলে, যোর কামা-সক্তিতে তার চোখ ও মুখের অবস্থা উন্নত পশুর মত।

ওর বিকট হাবভাব দেখে আশা ভয়ে পুপ্পকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে বলে—ওই ঝাঞ্ঝা ভাই কে একটা আসচে—মাগো—

পুপ্প ও ভয় পেয়েছিল, সেও প্রথমটা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু হঠাৎ একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটলো, লোকটা ওদের কাছে এসে পড়ে পুপ্পের দিকে চেয়েই জড়সড় হয়ে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। তারপর দিগ্‌বিদগ্‌ জ্ঞানশূন্য ভাবে ছুট দিলে সোজা।

হঠাৎ আশা ভয়ে ও বিস্ময়ে পুপ্পের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বলে—ওকি! তোমার কপাল দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে যে!...এ কি! ওমা—কি সর্বনাশ।

পুপ্প অবাক হয়ে নিজের কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেল। সে আবার কি! পরক্ষণেই ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো দরদর করে। সে হাত দিয়ে মুছে বলে—ভাই বৌদি—

আশার ভয় ও বিস্ময় তখনও যায়নি। সে দূর থেকেই আপন মনে বললে—বাবা:—কি এ! আর দেখা যাচ্ছে না। কি আগুন!...

তারপর সে ছুটে এসে পুষ্পের পা ছুথানা জড়িয়ে ধরে বসে—কে আপনি? আমার বলুন কে আপনি? আপনি তো সহজ কেউ নয়। স্বর্গগো থেকে দেবি এসেছেন আমার দয়া করতে?

আশার মুখ দিয়ে অজ্ঞাতসারে একটা বড় সত্য কথা বেরুলো।...

যতীন সব শুনলে। আশার এই পরিণতি! সেই আশা। কি জানি কেন শুধুই মনে পড়ে ওদের কাঁটালগাছের দিকের ঘরের সেই ফুলশয্যায় বৃষ্টিধারামুখর রাত্রিটি, সেই সব দিনের কথা আজও যেন মনে হয় কাল ঘটে গেল। কেন এমন অসারতা সংসারে, কেন এমন মিথ্যার উৎপাত! যা ভালো বলে মনে হয়, জীবন যাতে পরিপূর্ণ হোল মনে হয়—তা কেন হুদিনও টেকে না? অমৃত বলে যা মনে হয়, তা থেকে বিষ ওঠে কেন?...

এই ঘোর বিষাদের হৃদ্যে যতীন সবদিক থেকে সব আলো একেবারে হারিয়ে ফেললে। কালো কালিতে সব লেপে একাকার হয়ে গেল। কেবল পুষ্প তাকে কত করে বুঝিয়ে রাখতো।

যতীন বলে—জীবনে আর কি রইল আমার? ওর সঙ্গে দেখাটা করিয়ে দাও—

—তোমাকে ও দেখতে পাবে না।

—তবে তোকে দেখতে পেলে যে?

—সে রঘুনাথদাস ঠাকুরের মহিমায়। তুমি কষ্ট পাবে। বৌদির সে কষ্ট তুমি কি করে দেখবে?

তখনকার মত যতীন বুঝে গেল। পুষ্পও কিছু নিশ্চিন্ত হোল। একটা অস্ত্র ঘটনাতেও যতীনের মন একটু অস্থির হয়ে চলে গেল। ওদের গ্রাম কুড়ুলে-বিনোদপুরের রায় সাহেব ভরসারাম কুণ্ডুর বড় ছেলে রামলাল কুণ্ডুর একদিন ও খুব বিষয় অবস্থায় দ্বিতীয় স্তরে উদ্দেশ্য-হীনভাবে ঘুরতে দেখলে। একটা গাছের তলায় সে বসে আছে গালে হাত দিয়ে, যতীন দেখে ওকে চিনতে পেরে তখনই ওকে দেখা দেওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করলে—নয়তো ওর দেহ রামলালের নিকট অদৃশ্যই থাকবে।

রামলাল ওকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রইল। বসে—যতীন না?

—হ্যাঁ। তুমি কবে এলে?

—আসা-আসি বুঝিনে, এ জিনিসটা কি বল তো? বাজী ঘাই, সবাইকে দেখি—বাবা, মা, বৌ—কেউ কথা বলে না। আমি মরে গিয়েছি বলে আমার নাম নিয়ে সবাই কাঁদচে!

—ঐ তো তুমি মরে এখানে এসেচ। এ জিনিসটাই মৃত্যু।

—আমারও সন্দেহ হয়েছিল, বুঝলে? কিন্তু ভাল বুঝতে পারিনি।

—কেন, তোমাকে কেউ নিয়ে আসেনি ?

—আমার ঠাকুরদাদা এসেছিল, এখনও মাঝে মাঝে আসে। বড় বকু বকু করে, আমার পছন্দ হয় না।

রামলাল যতীনের বয়সী, বড়লোকের ছেলে। সুরা ও নারীর পেছনে গত দশ বছরে লাখখানেক টাকা উড়িয়ে দিয়েছে। অত বড় ব্যবসা ওদের, কখনো কিছু দেখতো না, বুদ্ধ বাপ দোকান আগলে বসে থাকতো, রামলাল দোকান বা আড়তের ধারেও যেতো না। যতীন এসব জানে।

তারপর রামলাল হি-হি করে হেসে বললে—ঠাকুরদাদা কি করে জানো ? রোজ দোকানে গিয়ে বাবার পাশে বসে থাকে, বেচাকেনা দেখে। বাবা হাত-বাক্সের সামনে যেখানে বসে না ? ঠিক ওর পাশে রোজ ঠাকুরদা গিয়ে দুঘণ্টা তিনঘণ্টা করে বসে। মানে, ঠাকুরদাদার নিজের হাতে গড়া আড়তটা, ওর মায়া বড় বেশি।

—বলো কি ! উনি তো মারা গিয়েচেন আজ কুড়ি বাইশ বছর। তখন আমি কলেজে পড়ি, বেশ মনে আছে। এখনও রোজ তোমাদের আড়তে গিয়ে বসেন ?

রামলাল আবার হি-হি করে হাসতে লাগলো। বললে—আচ্ছা ভাই, সেকথা যাক্গে। এখানে কেমন করে মানুষ থাকে বলতে পারো ? আজ কতদিন এসেচি ঠিক মনে নেই, তবে মাস দুইএর বেশি হবে না। একটা মেয়েমানুষের মুখ দেখতে পাইনি এর মধ্যে ! এক ফোটা মাল পেটে ঘষিনি—ফুটি করবার কিছু নেই। ছাঃ, নিরিমিষ জায়গা বাপু, যা বলো ! মানুষ এখানে টাঁকে ?

পরে চোখ টিপে বললে—বলি, সন্ধান-টন্ধানে আছে ?

যতীন ওর পাশে বসলো। মনে মনে ভাবলে—A wasted life ! আমার নষ্ট হচ্ছে যেজন্তে, তা আমার নিজের দোষ নয়, কিন্তু এ নিজে জীবনটাকে বিলিয়ে দিয়ে এসেছে নিজের হাতে !

রামলাল বললে—আ'ছ কোথায় ?

—এখ'নেই।

—মাঝে মাঝে এসো। বড্ড একা পড়ে গিয়েচি। আচ্ছা, হরিমতিকে দেখতে পাও ? বুঝতে পেরেচ ?—গাঙু গোসাঁইএর মেয়ে হরিমতি। তাকে এসে পর্যন্ত খুঁজিচি—এক সময়ে তার সঙ্গে ছিল কিনা !

যতীন একটু অবাক হয়ে গেল। গাঙু গোসাঁইএর যে মেয়ের কথা এ বলচে, তাকে নির্ভাবতী বৈষ্ণবী হিসেবে সে জানতো। তবে সে যুবতী এবং সুন্দরী ছিল বটে। আশালতা ঘেবার বাপের বাড়ী চলে গেল, সেই বছর সে কি জানি কেন গলায় দড়ি দিয়ে মারা যায়। হরিমতির চরিত্র ভালো ছিল বলেই তার ধারণা আছে এ পর্য্যন্ত।

যতীন বললে—না, ওসব দেখিনি। তুমি এখন ওসব ছাড়। মরে চলে এসেচ পৃথিবী ছেড়ে। মদ মেয়েমানুষ এখানে কি কাজে লাগবে তোমার ? হরিমতিকে তা হোলে

তুমিই নষ্ট করেছিলে, তোমারি জন্তে তাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হয় ?

—না ভাই। তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি। সে ভালো চরিত্রের মেয়ে গোড়া থেকেই ছিল না। অঘোর কুণ্ডুর সঙ্গে তার গোলমাল হয় তা আমি জানি। জানাজানি পাছে হয় তাতেই সে গলায় দড়ি দিয়ে মরে। আমার অত খারাপ ভেবো না। ফুঁটিটুটি করতাম বটে, তা বলে—

—বেশ, তবে ও পথ একেবারে ছেড়ে দাও, নইলে যেমন কষ্ট পাচ্চ এমনি কষ্ট পাবে।

যতীন সেইদিন থেকে প্রায়ই রামলালের স্তরে গিয়ে তাকে বোঝাতো। রামলাল বাতীঘর পারনি, গাছতলাই তার আশ্রয়স্থান। যতীন তাকে উপরের স্বর্গের কথা বলতো, ভগবানের কথা বলতো—কিন্তু রামলাল নিঃস্বরের আত্মা, অতি স্থূল আসক্তিতে ওর মন বাঁধা। সে-সব ও কিছুই বোঝে না, ভালও লাগে না।

একদিন রামলালের ঠাকুরদাদা কেবলরাম কুণ্ডুর সঙ্গে দেখা! কেবলরাম ঘুঘু ব্যবসাদার, সামান্য অবস্থা থেকে বিখ্যাত ধনী ও আড়তদার হয়েছিল। ওকে দেখে বন্ধে—আরে, তুমি ভবভারণের ছেলে! খুব মনে আছে তোমার। আঁহা হা, অল্প বয়সে তোমরা সব চলে এলে, বড় হুংখের কথা। আমার নাতির দেখো না, ভরসারাম মরে গেলে অত বড় ব্যবসাটা গেল। কে দেখবে? এই তো সন্দেহ পর্যন্ত আড়তে বসে ছিলাম। রোজ গিয়ে দেখি। বড় মায়া ঐ আড়তটার ওপর। ভরসারাম তো বাঁধা আসরে গাইলে। কষ্ট কাকে বলে তা তো জানলে না। একলক্ষ আশি হাজার টাকা ক্যাশ রেখে আসি ব্যাঙ্কে, উইলে ছতাইকে সমান ভাগে ভাগ করে—

যতীন বলে—কুণ্ডু মশাই, এখন ওসব ছেড়ে দিন। আপনি আজ কুড়ি বছর এসেছেন, আজও দোকান আড়ত নিয়ে আছেন কেন? আপনি না গলায় তুলসীর মালা দিতেন? হরিনাম করতেন?

—সে এখনও করি। তা বলে—

—আচার্য্য রঘুনাথদাসের নাম জানেন?

কুণ্ডু মশাই হুংহাত জোড় করে প্রণাম করে বলে—কে তাঁর নাম না জানে? আমরা তাঁর দাসামুদার—

—আপনি যদি আড়ত দোকানে যাওয়া ছেড়ে দিতে পারেন, তবে সেখানে নিয়ে যাবো। তাঁর কাছে।

কেবলরাম কথাটা বিশ্বাস করলে না। ভাবলে এ একটা কথার কথা বুরি। উচ্চ স্বর্গের অনেক কথা যতীন স্মৃতিরাত্রা থেকে বোঝাতে বসলো। পুষ্পের সঙ্গে একদিন দেখা করিয়ে দিলে। কেবলরাম হাত জোড় করে প্রণাম করে বলে—তুমি কে মা?

পুষ্প হেসে বলে—তোমার নাতনী, দাছ—

কেবলরাম কেঁদে ফেললে। বলে—আমি পাপী, নরাধম। আমার সে ভাগ্যি কি আছে মা?

—মা নয়, আমায় দিদি বলে ডাকো দাছ—পুষ্প আবদারের স্বরে বলে।

কেবলরাম সেদিন থেকে পুষ্পের ক্রীতদাস হয়ে গেল। পুষ্প ম্যাজিক জানে নাকি? যতীন এক এক সময়ে ভাবে। পুষ্প কেবলরামকে ভরসা দিলে, এক দিন উচ্চ স্বর্গের বৈষ্ণব ভক্তদের শোকে ওকে নিয়ে যাবে। কেবলরাম মানুষটা সরল। বলে—দিদি, তুমিই তো দেবী, তুমি কম নও। ব্রাহ্মণের মেয়ে, তার ওপর আঙনের মতো আভা তোমার রূপের। আমি আর কোথাও যেতে চাইনি—তুমি দাছ বলে ডাকলে এই আমার স্বর্গ হয়ে গেল! আমরা কীটস্থ কীট।

আত্মা ওঠে ভালবাসায়! ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে। পুষ্প পিতামহের সমান বুদ্ধ কেবলরামকে পোত্রীর মত ভালবেসে ওকে তোলবার চেষ্টা করচে—যতীন বুঝতে পারলে। যতীনের শত লেকচারেও এ কাজ হোত না। যতীন ভাবে—নাঃ এসব কাজ পুষ্প পারে। পতিত-উদ্ধার কাজ আমার নয়। আমার নিজের কুকুর পথ্যি করে কোথায় তার ঠিক নেই।

কিন্তু রামলালের সাহায্য পুষ্পকে দিয়ে হবে না। পুষ্প অতি সুন্দরী নারী। রামলালের আসক্তি এখনও নিম্নমুখী, মোহে পড়ে যাবে, রামলালের মন গড়ে উঠতে অনেক দেরি। অন্তভাবে ওকে সাহায্য করতে লাগলো যতীন।

রামলালের দেখা পেয়ে যতীনের খানিকটা ভাল লাগে। হাজার হোক, দেশের লোক, সমবয়সীও বটে। ছুটো পৃথিবীর কথাবার্তা বলা যায়। দেবদেবীদের মধ্যে প্রাণ ইপিষে উঠেচে। শুধু বড় বড় কথা আর কাঁহাতক শোনা যায়—পুষ্পের মুখেই, বা অন্য যেখানে মাঝে দু-দশবার গিয়েচে, সেখানেই কি। পুষ্প বোঝে সব, বুঝে দুঃখিত হয়। রামলালের সঙ্গে অত মেলামেশা সে পছন্দ করে না।

যতীন রামলালের কাছে এসে বলে—রামলাল দা, কি তোমার ইচ্ছে করে?

—একটা ইচ্ছে আছে, অন্য কিছু হোক না হোক, একটা সিগারেট যদি খেতে পারতাম, একেবারে কিছু নেই—ছ্যাঃ; এখানে মানুষ থাকে কি করে?

—তোমার স্বীকে তো রেখে এসেচ, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে না?

রামলাল ইতস্তত করে বলে—হ্যাঁ—তা—হ্যাঁ—সে তো প্রায়ই দেখচি।

—যাও সেখানে?

—হ্যাঁ, তা—যাই। যাবে—চলো না গায়ে একবার।

যতীন গেল কুড়ুলে-বিনোদপুরে। পুষ্পের বারণ আছে এসব জায়গায় আসবার। এলেই পার্থিব আসক্তি ও তৃষ্ণা আত্মাকে পুনরায় জড়িয়ে ধরে। রামলাল ওর নিজের বাড়ীর দিকে চলে গেল, যতীন নিজের বাড়ী এল; ওর ছেলেমেয়ে আছে স্বস্তরবাড়ীতে, কিন্তু তাদের ওপর এতদিন যতীনের কোনো বিশেষ মায়া ছিল না, এখানে এসে তাদের জ্ঞেও মন কেমন করে উঠলো। ওদের বাড়ীটা একদম ভেঙে চূরে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে এই সাত আট বছরে। এখানে ঐ ঘরে সে আর আশা থাকতো, আশার হাতের চূনের দাগ এখনও ইট-বের-করা দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায়। ওখানে বসে আশা পান সাজতো, ঘোল বছর

আগের চূনের দাগ, কি তারও আগের হবে।

বিয়ের পরে প্রথমে আশা খুব পান পেতো এবং ওইখানটিতে বসে রোজ সকালে এক বাটা পান সাজতো সমস্ত দিনের মত। গুজব উঠলো এই সময়, পানে একরকম পোকা হয়েছে, অনেক লোক মারা যাচ্ছে পোকা-ধরা পান খেয়ে, যতীন আর বাজার থেকে পান আনতো না পাঁচ ছ'মাস। আশা বলতো—তুমি না খাও, আমার জন্তে এনো, না হয় মরে যাবো পান খেয়ে, তোমার আবার বিয়ে বাকি থাকবে না। পান না খেয়ে থকতে পারিনে—লক্ষীটি—কাল যেন ঘটে গিয়েচে সে সব দিন। আশা, আশালতা। স্বপ্ন...বহুদূর অতীতের স্বপ্ন আশালতা।

সন্ধ্যা হয়েছে। বোষ্টম বৌ ছাগল নিয়ে যাচ্ছে বাড়ীতে তাড়িয়ে—আহা, বুড়ো হয়ে পড়েচে বোষ্টম বৌ। তা তো হবেই, আট বছর হয়ে গেল। আচ্ছা তাকে যদি এখন দেখে বোষ্টম বৌ তো কি না জানি ভাবে।

হঠাৎ পেছন থেকে কে বলে উঠলো—তুমি কখন এলে গো?

যতীনের অন্তরাআ পর্ষাস্ত দিশ্বরে শিউরে চমকে উঠলো সে পরিচিত কর্ণের ডাকে। সে পেছন ফিরে চাইলে, আশা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার পেছনে। পরনে লালপাড় শাড়ী, ঠিক যেমনটি পরতো কুড়ুলে-বিনোদপুরের এ ঘরে; বয়েস তেমনি, চোখে না বুঝতে পারার বিশ্বয়ের মুঢ় দৃষ্টি।

—আশা! তুমি এখানে! কি করে এলে।

আশা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। যেন এখনো ভাল করে বিশ্বাস করতে পারচে না।

যতীন ওর দিকে এগিয়ে গেল হাত বাড়িয়ে। বলে—আশা, চিনতে পারচো না আমার?

আশা ওর মুখের দিকে তখনও চোখ রেখে বলে—খু-উ-ব।

—তুমি কে'থ' থেকে এলে?

—কি জানি কে'থ' থেকে যে এলুম। আজকাল কেমন হয়েছে আমার, সবই যেন কি যেন হয়। কোন্টা সত্যি কোন্টা স্বপ্ন বুঝতে পারিনে। সব গুলট-পালট হয়ে গিয়েচে কেমনতর। হ্যাঁগো, তুমি ঠিক তো?...

পরে বাস্তব হয়ে বলে—দাঁড়াও, একটা প্রণাম করে নিই তোমায়—

প্রণাম করে উঠে বলে—কতকাল দেখিনি। ছিলে কোথায়? সংসার যে ছারেখারে গেল, বাড়ী ঘরদোরের অবস্থা এ কি হয়েছে! আমি এতকাল আদিনি। বাপের বাড়ী থেকে আমাকে আনলেও না। নিজেও ভরঘুরে হয়ে বেড়াচ্চ। ছেলেমেয়ে ছোটোর কথাও তো ভাবতে হয়।

যতীন সম্মেহ কর্তে বলে—ঠিক, ঠিক। তুমি ভাল আছ আশা?

—আমি ভাল নেই।

—কেন, কি হয়েছে? আশা, আমার খুলে বলো সব—

—মাথার মধ্যে সব গোলমাল। কিছু বুঝতে পারিনে। সব স্বপ্ন বলে মনে হয়। কত কি যে ঘটে গেল জীবনে, বুঝিনে কোনটা স্বপ্ন কোনটা সত্য। এই তুমি দাঁড়িয়ে অ'ছ সামনে, আমার ঘেন কেমন মনে হচ্ছে। ঘেন মনে হচ্ছে কে বলেছিল, তুমি—না ছিঃ পে কথা বলতে নেই।

—আশা, আবার ঘর সংসার পাতাই এসো—

—পাতাতেই হবে। আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে—এক জায়গায় ছিলাম, মরুভূমি আর পাহাড়, লোক নেই জন নেই, কি ভয়ানক জায়গা। সেখানে ঘেন এক দেবীর সঙ্গে দেখা হোল তাঁর কপাল দিয়ে আগুনের মত হলুকা বেরুচ্ছে। কি ভেজ! বাবাঃ—কি রকম সব ব্যাপার। ও সব স্বপ্ন, কি বলো?

—নিশ্চয়ই, আশা।

—তুমি এলে ভালই হোল। ঘরদোর বাঁটপাট দিই। উছনগুলো ভেঙে জঙ্গল হয়ে গিয়েচে। চড়ুই পাখীর বাসা হয়েছে কড়িকাঠে। হাটবাজার করে এনে দাঁও। সেই মরুভূমির মত জায়গা থেকে কে ঘেন আমায় এখানে টেনে দিয়ে এল। থাকতে পারলাম না।

পরে কাছে এসে অপরাধীর সুরে বলে—হ্যাঁগো আমার বাপের বাড়ীতে ফেলে রেখেছিলে কেন এতদিন? রাগ করেছিলে বুঝি?

যতীন স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল, সে দৃষ্টিতে গভীর অনুকম্পা, অন্তলম্পর্শ, অনুকম্পা—সর্ববাসনাশূন্য উদার ক্ষমা...কোনো কথা বলে না।

আশা মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে হাসি-হাসি মুখে বলে—বেশ চেহারা হয়েছে তোমার।

হঠাৎ আশা চীৎকার করে উঠলো—একি! ওমা, একি হোল! কোথায় গেলে গো? এই যে ছিলে? ওমা এ সব কি!

যতীন বুঝলে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে আশার কাছে। পৃথিবীতে কতক্ষণ সে থাকবে, পৃথিবীর আসক্ত ও চিন্তার তার দেহ স্তূলস্তুরের দর্শনযোগ্য হয়েছিল অল্প সময়ের জন্তে, ওর চিন্তার প্রবল আকর্ষণ নরক থেকে আশাকে এনেছিল এখানে। আশাও আর থাকতে পারবে না। এখুনি ওকে চলে যেতে হবে। উভয় স্তরে জীবের কোন যোগাযোগ নেই।

রামলাল পর্যন্ত এসে যতীনকে আর দেখতে পেল না। যতীনের দেহ আবার তৃতীয় স্তরের মত হয়ে গিয়েচে।

রামলাল বলে—কোথায় গেলে, ও যতীনদা? থাকো থাকো, যাও কোথায়? ও যতীনদা—

ততক্ষণে নরকের প্রবল আকর্ষণে আশাও তার নিজের স্তরে নীত হয়েছে।

যতীন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। এ জগতের এই নিয়ম।

আশা সত্যিই বলেচে, কোনটা স্বপ্ন কোনটা আসল তা বোঝবার ঘো নেই।

সে কোন্ দেবতা, ধীর শরণ পে নিতে চায়, এ স্বপ্নের শেষ করতে চায়। করুণাময় এমন

কে মহাদেবতা আছেন, যার রূপাকটাক্কে আশা তো আশা, কত মহাপাপী উদ্ধার হয়ে যায় চোখের এক পলকে, মহারুদ্ধের জ্যোতিস্ত্রিশূলের এক চমকে অনন্ত বোম ঝলমল করে ওঠে পুণ্যের আলোয়, পাপতাপ পুড়ে হয় ছারখার, অবাস্তব স্বপ্নের অবগানে। হে অনন্তশয়নশায়ী নিদ্রিত মহাদেবতা, জাগো, জাগো!

ওদের বাড়ীর পেছনের বাঁশবনে করুণস্বরে পেঁচা ডাকচে। শীতকালে রাখালতায় থোকা থোকা ফুল ফুটেচে বেড়ার খোপজঙ্গলে। ঝিঁঝিঁ ডাকচে ডোবার ধারে। মনে হয় চাঁদ উঠচে পূর্বদিকের আকাশে। আকাশের নক্ষত্রদল পাংলা হয়ে এসেচে। বোধহয় পৃথিবীর কৃষ্ণা প্রতিপদ কিংবা দ্বিতীয়া তিথি।

পুষ্প করুণাদেবীর দেখা পায়নি বহুদিন।

তিনি নানা ধরনের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন, পুষ্প সেজন্তে তাঁকে তেমন ডাকে না। আজ অনেক দিন পরে পুষ্পের মনে হোল করুণাদেবীর একবার খোঁজ করা দরকার। সে ঠর সঙ্গ দেথা করার জন্তে উচ্চস্বর্গে উঠে গেল, তাঁর সেই ক্ষুদ্র গ্রহটিতে, সেই কুসুমিত উপবনে। যখনই সে এখানে আসে তখন কি এক বিস্ময়কর আবির্ভাবের আশায় সর্বদা সে থাকে, কি সৌন্দর্য্য ও শান্তির লীলাভূমি এই পবিত্র দেবায়তন। স্নগন্ধ কিসের সে জানে না, কোন্ ফুলের সে স্নগন্ধ তাও জানে না—কিন্তু অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয়, সারা মন খুশি হয়ে ওঠে হঠাৎ।

মহারূপসী দেবী ওকে হাসিমুখে হাত ধরে একটি বিশাল বনস্পতিতলে ক্ষটিকবেদীতে নিয়ে গিয়ে বসালেন। পুষ্প চেয়ে চেয়ে অবাক হয়ে ভাবলে—এ গাছ তো এত বড় দেখিনি এত বড় গাছই তো ছিল না।

করুণাদেবী মৃদু হেসে বলেন—কি ভাবচ, গাছটার কথা? ও তৈরি করেচি। বনস্পতিতে ভগবানের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব। তাই দেখি সারা সময় চোখের সামনে।

—কি গাছ?

—পৃথিবীতে ছিল না কোনোদিন, নাম নেই।

—আমি আপনার কাছে কোনো অপরাধ করেছিলাম কি? দেবা দেননি কতদিন। আমার কষ্ট তো জানেন সব। আপনি একবার চলুন, যতীনদা বড় কাতর হয়ে পড়েচে, আশা-বোধি নরকে। আত্মহত্যা করেছিল।

করুণাদেবী অদ্ভুত ধরনের হাসি হাসলেন। বলেন—সব জানি। আমার পৃথিবীর ছেলে-মেয়েদের সন্ধান রাখিনে আমি! আমিই যতীনের ব্যাকুলতা দেখে তার সঙ্গে ওর স্ত্রীর দেখা করিয়ে দিই। নইলে নরক থেকে পৃথিবীতে গিয়ে দেখতে পেতো না যতীনকে। এই দেখাতে আশার উপকার হবে—

—যতীনদা সেই থেকে কিন্তু পাগলের মত হয়েছে—

—যতীন অজ্ঞান।

—আপনি ভাল বোঝেন সব, দেবী। আপনি যতীনদা'কে সুখী করুন। ওর কষ্ট দেখতে পারিনে। আশা বোধির ভাল হয় কিসে?

করুণাদেবী ওকে কাছে টেনে নিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মত ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে ওর গালে হাত বুলিয়ে অতি ধীর শাস্ত্রসুরে বলতে লাগলেন—পুষ্প, তাকে ভালবাসি বড়। মনে আছে সব। ভাল হবে শেষে, কিন্তু—লক্ষ্মী, পুষ্প—

—কি দেবী?

করুণাদেবীর চোখে জল! পুষ্প অবাক হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কেমন মায়া হোল এই রাজরাজেশ্বরীর মত রূপবতী মহাশক্তিদারিণী দেবীর ওপর, কোলে শায়িতা ছোট্ট খুঁকী যেন, তার মেয়েটির মত। ভগবান এমন ভাবেই বোধ হয় মানুষের কাছে দরদেয় ঐশ্বর্য লুকিয়ে। সে নিজের অজ্ঞাতসারে অসামান্যেই করুণাদেবীর চোখের জল মুছিয়ে দিলে নিজের বস্ত্রাঞ্চলে।

দেবী বল্লেন—তাকে বড় দুঃখ পেতে হবে—

পুষ্পের বৃকের মধ্যে দ্রুত দ্রুত করে উঠলো। কেন, কিসের দুঃখ? কি কথা বলতে চাইচেন দেবী?

দেবী আবার বল্লেন—যতীন ও তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে আমার সঙ্গে। তার দরকার আছে। তুই চলে যা পুষ্প, আমি যাবো তারই বাড়ীতে একটু পরে। তারপর আমার সঙ্গে তোদের পৃথিবীতে একবার যেতে হবে।

—দেবী, গ্রহদেবের দেখা পাবো?

—সময় পাবে পুষ্প। তিনি কিছু পূর্বে এখানে ছিলেন।

উচ্চস্বর্গে দেবলোকের প্রেমিক-প্রেমিকা। পুষ্প যতই এঁদের হৃদয়কে দেখে, ততই আনন্দে ও শান্তিতে মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পুষ্প ও যতীনকে সঙ্গে নিয়ে করুণাদেবী একটি পুরাতন শহরে এলেন।

বাড়ীঘর সব পুরোনো ধরনের, পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে চলেচে, রাস্তাঘাট সেকালের ধরনের সরু সরু। একটা পুরানো বাড়ী গলির মধ্যে, সেই বাড়ীর পাশে ছোট্ট একটা বাগান। বেলা গিয়েচে, সন্ধ্যার কিছু আগে। বাড়ীটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পুষ্প ও যতীন হৃদয়েরই মনে হোল, এখানে ওরা যেন এর আগে এসেচে। যেন কতকাল আগে, ঠিক মনে করতে পারচে না।

হঠাৎ যতীন বল্লেন—এটা কোন্ জায়গা দেবী, আমি এ বাড়ী চিনি বলে মনে হচ্ছে—

তার মন আজ আনন্দে পূর্ণ, কারণ বহুদিন পরে আজ সে করুণাদেবীর দেখা পেয়েচে। এ যে কত সৌভাগ্যের কথা, এতদিন এখানে থেকে সে ভাল বুঝেচে।

দেবী বল্লেন—বেশ, বাড়ীর ভেতর যাও—

যতীনের মনে হোল এ বাড়ীর ভেতরের উঠোনে একটা পেয়ারার গাছ আছে, সে কতকাল আগে সেই গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে খেতো। বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই একটি ছোট

ঘর। একটা কুলুঙ্গির দিকে চাইতেই যেন বহু পুরোনো দিনের সৌরভের মত কোথাকার কত হারানো দিনের বহু অস্পষ্ট স্মৃতির সৌরভ এল কুলুঙ্গিটা থেকে। এক সুন্দরী নববধূর মুখ যেন মনে পড়ে, ঐ কুলুঙ্গিতে সে তার মাথার কাঁটা রাখতো শোবার আগে, এই ঘরের সঙ্গে যেন এক সময়ে কত সম্পর্ক ছিল ওর। বাড়ীটাতে অনেক ছেলেমেয়ে চলাফেরা করছে, দুটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক রান্নাঘরে কাজকর্ম করছে। ঐ ভোঁ সেই পেরোরা গাছটা। ওর তলায় বসে সে কত খেলা করেছে একটি মেয়ের সঙ্গে—মেয়েটিকে সে বড় ভালবাসতো। আজও যেন তার মুখ মনে পড়ে—কোথায় যেন চলে গিয়েছিল মেয়েটি।

পুষ্প ওর পেছনে পেছনে এসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকছে। সে বলে—যতীনদা, ওই সেই পেরোরা গাছ—

—কোন্ পেরোরা গাছ—

—মনে পড়চে ওর তলায় তুমি আর আমি খেলা করতাম, অনেক কাল আগে—স্পষ্ট মনে হচ্ছে—

—তুই তবে সেই মেয়ে পুষ্প—আমারও সব মনে পড়েচে। তুই মরে গিয়েছিলি আমার আগে। সে সব দিনের, দুঃখও যেন মনে আসচে।

—তুমি মাঝা গিয়েছিলে যতীনদা। আমার ওই বলে গালাগালি দিও না, বালাই বাট, আমি মরবো কেন?

—দেবী সঙ্গে নেই তাই তোর বাড়ি হয়েছে, তুই যা তা বলচিস আমার পুষ্প! আচ্ছা, বল তো, এক জায়গায় এ বাড়ীতে এক বুড়ো লোক বসে থাকতো, তার কি যেন হয়েছিল, বসেই থাকতো। মনে পড়চে তোর?

—মনে হয়েছে, দেওয়ালের গায়ে বালিস ঠেস দিয়ে।

যতীনের মনে হচ্ছিল যেন সে একটি সুপরিকল্পিত স্থানে বহু, বহু কাল পরে আবার এল। এ বাড়ীর সব ঘরদোর সে চেনে, অনেক কাল আগে এ বাড়ীতে সে বেড়িয়েছে প্রত্যেক ঘরদোরে। বহু প্রিয়জনের দুরাগত স্মৃতি যেন একটি গুরুভার বেদনার মত বুক চেপে বসেচে।

বাড়ীর ছেলেমেয়েরা রান্নাঘরে খেতে বসেচে। খুব গোলমাল করছে নিজেদের মধ্যে। ওদের প্রতি এমন একটি স্নেহ হয়েছে যতীনের, এরা অতি আপনাত্মক জন, কতদিনের সখ্যক এদের সঙ্গে। যতীন দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। ছেলেমেয়েদের খাওয়া হয়ে গেল, ওদের মা এবার হাতায় করে দুধ পাতে পাতে দিচ্ছে। অনেক পুরোনো হয়ে গিয়েছে বাড়ীটা, তার জানা বাড়ী এর চেয়ে ভাল, নতুন ছিল। সে সব বুঝতে পেরেচে, করুণাদেবী তাদের কেন এখানে এনেচেন।

পুষ্প বলে—যতুদা, আমাদের পূর্বজন্মের দেশ। কোন্ গ্রাম এটা বলতে পারো? তুমি আমি এখানে জন্মেছিলাম।

—তুই মরে গিয়েছিলি আমার আগে—রাগ করিস্নি বলচি বলে।

—আমার মনে পড়ছে।

—গত জন্মেও তাই। এই রকমই হচ্ছে জন্মে জন্মে। তুই মারা যাচ্চিস, আমি তোর পেছনে যাচ্চি। কিন্তু আর একটি মেয়ের কথা বড় মনে পড়ছে। তাতে আমাতে কিছুদিন এখানে ছিলাম। তারপর সেও কোথায় গেল চলে।

ওরা বাইরে এল। করুণাদেবী বল্লেন—মনে পড়লো ?

কিন্তু এ যে অদ্ভুত মনে পড়া। কত নিবিড় বর্ষারাতের টিপ টিপ জলপতনের সঙ্গে, কত বসন্তের প্রথম রেংদে পোড়া মাটির গন্ধের সঙ্গে জীবনের মস্ত বড় যাত্রাপথ একসুরে বাঁধা, আনন্দের নিবিড় স্মৃতি সেখানে বেদনার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে—গভীর বেদনা, যা শুধু জন্ম-জন্মান্তরের হারানো প্রিয়জনের বার্তা বহন করে আনে অন্তরতম অন্তরে। মনে হয়, সবই কি তবে মিথো, সবই স্বপ্ন ?

যতীনের দিগ্‌ধারা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওর মনের কথা পরিষ্কৃত হোল। করুণাদেবী বল্লেন—ওই জন্তে তোমাদের এনেচি। এখানে তোমাদের ঠিক এবারকার জন্মের আগের জন্মভূমি।

পুষ্প বল্লেন—এ কোন্ গ্রাম দেবী ? নাম মনে নেই।

—ত্রিবেণী। গঙ্গার তীরে। ঐ গঙ্গা—

—তা হোলে গত দুই জন্মে আমরা কাছাকাছিই ছিলাম, গঙ্গারই ধারে। এবার তো হালিসহরের এ পার সাগঙ্গ-কেউটার।

—স্থানের আকর্ষণ অনেক সময় এমন হয় যে গত জন্মের ভূমিতে কোনো না কোনো সময় আসতেই হবে। তবে জন্মান্তরীণ স্মৃতি সব আত্মার থাকে না পৃথিবীর স্থলদেহে। কখনো কেউ জাতিস্মর হয়। জাতিস্মর হওয়া উচ্চ অবস্থার লক্ষণ।

যতীন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। তার মন ভাল নেই। জগৎ ও জীবন দেখি সব ভেল্কির মত। কোন্টা সত্যি ? কোন্টা মিথো ? বাজে জিনিস সব। বাঁচা মরা কিছুই মধ্যে কিছু নেই। কেন এ বিড়ম্বনা ?

সে জিজ্ঞেস করলে—দেবী, এরা আমার কে ? এখন যারা আছে ?

—তোমার পৌত্রের পৌত্র।

—আর পুষ্পের ?

—পুষ্প অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়। আশা এ বাড়ীতে তোমার প্রথম স্ত্রী ছিল। সে অল্পবয়সে তোমার ছেড়ে চলে যায় এবারের মত। আমিই তোমাদের মিলিয়ে দিয়েছিলুম তিনজনকে আবার এ জন্মে। কিন্তু কর্ত্ত্বের ফল আমি খণ্ডন করতে পারিনি তোমাদের—চেষ্টা করলাম, কিন্তু কর্ত্ত্বশক্তি নিজের পথ ধরল ঠিক।

যতীন হতাশ সুরে বল্লেন—আপনি যখন পারলেন না, তখন আর কি উপায় দেবী। আপনি স্বয়ং যখন—

করুণাদেবী বল্লেন—কর্ত্ত্বের বন্ধন স্বয়ং ভগবান কাটিতে পারেন চোখের পলকে। তিনি ছাড়া আর কে পারে।

—আমি কি করেছিলাম দেবী, কেন আমার এ দুর্ভাগ্য হুই জন্ম ধরে ?

—এরও আগের জন্ম দেখবে ? কিন্তু ছবি দেখাবো। সামনের আকাশে চাও—সে স্থান এখন আর নেই, প্রাচীন গোড়ের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র গ্রাম। সে জন্মে প্রথমা স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে দুবার বিবাহ করেছিল। সে তোমার বড় ভালবাসতো। সেজন্তে তাকে আর আপনান্ন কবে পেলে না পর পর হুইজন্মেও। সতী লক্ষ্মীর মনে বড় কষ্ট দিয়ে ত্যাগ করেছিল।

—সেও কি আশা ?

—না।

—তবে সে কে দেবী ? বলুন দয়া করে—সে কি অন্তর চলে গিয়েচে ?

—সে এই তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে। সতীলক্ষ্মী তোমায় ছাড়েনি, কিন্তু তোমার কর্ম-ফলে তুমি ওকে পাচ্চ না। আমি পর পর হুইজন্মে চেষ্টা করছি, কিন্তু পেরে উঠছি কই !

পুষ্প অবাক হয়ে দেবীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এ সব কথা তার মনে নেই।

করুণাদেবী বলেন—তারও পূর্ব জন্মে তোমার কর্ম আরও খারাপ। যাক এ সব কথা। তোমাকে তিন জন্মের কথা জানতেই হবে, এর কারণ আছে। পুষ্প, তুই কষ্ট পাবি আমি জানি। আমি চেষ্টা করবো সে দুঃখ দূর করতে। যতীনকে ওর পূর্বজন্ম দেখালাম, কারণ ওর আত্মার প্রয়োজন হয়েছে।

পুষ্প বিবর্ণ মুখে বলে—কেন দেবী ?

করুণাদেবী ওর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বলেন—যতীনকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে।

পুষ্প জানে। সে জানে তার প্রশ্ন নিরর্থক। সে অনেকদিন থেকে বুঝতে পেরেচে। এই ভয়ই তার মন করছিল।

যতীন চমকে উঠলো। এত অল্পদিনে আবার পুনর্জন্ম কেন ? কোথায় রইল আশা, কোথায় রইল পুষ্প—তার কাছে যাবে সে পৃথিবীতে ?

তখন তার মন বলে উঠলো—কেন, মায়ের কাছে। যার কোল আঁধার করে সে চলে এসেচে।

করুণাদেবী বলেন—যতীন, তোমার অন্তরাঙ্গা চাইচে ঐ দুঃখিনী মায়ের কোলে আবার ফিরে যেতে। তোমার মায়ের অন্তরাঙ্গা কঁদচে তোমার জন্তে। সেখানে যেতে হবে তোমাকে। এ বাঁধন এড়াবার যো নেই। মাতৃশক্তি জগতের মধ্যে খুব বড়। তা ছাড়া আশার জন্তে তোমাকে যেতে হবে ভুলোকে। ভুবলোকের কোন উচ্চস্তরে ও যেতে পারবে না—বেচারী ! গ্রহদেবকে আমি বলেছি, আশার অন্তরাঙ্গা কঁদচে, অল্পতাপে সব পাপ মোচন হয়। আশাকেও আবার পৃথিবীতে পাঠাবো—তুমি জন্মগ্রহণের কিছু পরে। এই পাঁচ ছ' বছর ওকে নরকেই থাকতে হবে। তার আত্মা তাতে উন্নতি করবে। নিজের ভুল ক্রমশ বুঝবে। এই জন্মে আমি আবার তোমাদের মিলিয়ে দেবো। বোধ হয় তোমাদের প্রাক ও জন্মে কেটে যাবে।

পুষ্প পাণ্ডুরঙির মত দাঁড়িয়ে সব শুনলে। আকাশ পৃথিবী তার কাছে অন্ধকার হয়ে

গিয়েচে ততক্ষণে। জন্ম-জন্মান্তর যে জীবনের মাস, ঋতু ও বৎসর মাত্র, তাও যে শূন্য, অন্ধকার। ভূমা নয়, অগ্নেই তার সুখ ছিল।

করুণাদেবী সব জানেন। পুষ্পকে তিনি বুঝিয়ে বলেন। আশার জন্তে ও স্বার্থভাগ তাকে করতে হবে, যতীনের জন্তেও। এই জন্মে আশার সব ভুল মুছে দেওয়ার চেষ্টা তিনি করবেন। আচার্য্য রঘুনন্দন আশার আত্মার জন্তে তাঁর ইষ্টদেবকে জানিয়েছিলেন।

ভক্তের ক্ষমতা বড় তুচ্ছ নয়। গ্রহদেবের আসন টলেচে।

পুষ্প বলে—বুঝেচি। তিনি মহাপুরুষ, সেদিন যখন নরকে নিয়ে গেলেন আমার, তখনই আমার মনে ধোল নরক পবিত্র হোল! আপনারও আসন টললে—আমি ডাকলে আপনি ছাই আসেন!

করুণাদেবী বালিকার মত সকৌতুকে খিল খিল করে হাসলেন। বলেন—তুই আমার ওপর রাগ করলি বুঝি? ছিঃ—লক্ষ্মী দিদি—

পুষ্পর অভিমান তখনও যায়নি। সে ছুটু মেয়ের মত ঘাড় বেকিয়ে চুপ করে রইল।

দেবী বলেন—তোকে আমার কাছে নিয়ে যাবো পুষ্প—

—না। আমাকেও পৃথিবীতে পাটিয়ে দিন না, দিন না দয়া করে। সত্যি বলচি। স্বর্গে আমার দরকার নেই।

—পৃথিবীতে পাটিয়ে কি হবে? এবার যে চেষ্টা করবো ওদের ছুজনকে মিলিয়ে দিতে। পৃথিবীর মিলন না হোলে আশার প্রারব্ধ কিছুতেই কাটবে না। এ আত্মভাগ তুই করতে পারবি আমি জানি। ওরা জন্ম নিলেই তো সব ভুলে যাবে, কোনো কথা মনে থাকবে না এ জন্মের। আমি আবার দেখা করিয়ে দিই, যে যাকে চায় মিলিয়ে দিই। নতুন জীবের কি সাধ্য?

পুষ্প বলে—আমাদের পাটিয়ে দিন, সব ভুলে থাকি।

করুণাদেবী ওকে কাছে নিয়ে এলেন আদর করে। পুষ্পের দেহ শিউরে উঠলো, কি অপূর্ব সুগন্ধ দেবীর সারাদেহে, কি অপূর্ব স্পর্শসুখ! সে মেয়েমানুষ, তবুও এই রূপদী দেবীর স্নিগ্ধস্পর্শে ওর সারাদেহে যেন তড়িৎসঞ্চার হোল। অমৃতস্পর্শে আত্মা যেন নিজের অমরত্ব, অনন্তত্ব অসুভব করলে এক মুহূর্তে।

সন্মুখে বলেন—পুষ্প, তোকে পৃথিবীতে আর জন্ম নিতে হবে না। শূন্য গতির পথে তোর অনাবৃত্তি লাভ ঘটেছে। ওরা এখনও অপরিণত, শেখবার বাকি আছে, কর্ম এবার নষ্ট হয়ে যাবে হয়তো। পৃথিবীর জীবন বেশিদিনের নয়। আত্মার পক্ষে চোখের পলক মাত্র। আমি এবার যাই পুষ্প।

পুষ্প বলে—আমায় পৌছে দিয়ে যান—

—নিশ্চয়, চল যাই।

যাবার সময় করুণাদেবী বলে গেলেন, তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি আসবেন।

যতীন একা বসে ছিল বাড়ীতে। পৃথিবীতে আবার জন্ম নিতে হবে। শত সুখদুঃখের বন্ধনে আবার জড়ানো, মন্দ কি? সেই গরীব ঘরের বোটের কোল আলো করে আবার শিশু হয়ে কত বালালীলা করবে, নতুন আশ্বাদ, আবার আসবে আশা—হতভাগিনী আশা—নববধূরূপে তার ঘরে, আবার কত বর্ধারাত্রি, কত বসন্তপ্রভাত ওর সাহচর্য্যে কাটবে। পৃথিবীতে যেতে তার কষ্ট নেই, মধুর সেধানকার শৈশব, মধুর কৈশোর, মধুর যৌবন। চিরধৌবনের হাওয়া যেন বয় তার অমর আত্মার, পৃথিবীতে মাস যাবে মাস আসবে, নতুন ধানের গন্ধ বেড়বে ক্ষেতে ক্ষেতে, ক্ষুধায় বনের মেটে আলু তুলে ছুন দিয়ে পুড়িয়ে খাবে, তার মা যখন বৃদ্ধা হয়ে যাবে তাকে খাওয়াবে, আশা সংসার পাতবে নতুন লক্ষ্মীর হাঁড়িতে ধান দিয়ে।...

কেবল কষ্ট হয় পুষ্পের জন্তে। এতদিন ওর সঙ্গে থেকে কি মায়াই হয়েছে ওর ওপরে। কেন এমন বিচ্ছেদ? কি কষ্ট পাবে পুষ্প, তা সে জানে। আশা যদি কষ্ট না পেতো, যতীন কিছুতেই যেতো না।

পুষ্প এসে ওর হাত ধরে বল্লে—যতীনদা!

—কি পুষ্প?

—আমায় ভুলো না।

—আচ্ছা, পুষ্প—তুই বলতে পারিস, কেন আমাদের জীবনে এ দুর্ভাগ্য, কেন বার বার তোকে হারাচ্ছি? তোর বৌদিদিকে হারাচ্ছি?

—আমায় নিয়ে যাও সঙ্গে—

—ছিঃ পুষ্প। দেবী যা বলেন তাই তোমার আমার পক্ষে শুভ। ওঁর কথা শোনো।

—আমি কারো কথা শুনবো না, আমি যাবো।

—কি, এবারও একসঙ্গে খেলা করবি পুষ্প? তেমনিধারা সাগর-কেওটার ঘাটে? বেশ—অন্তুত সে সব দিন।

যতীন চোখ বুজে ভাবতে লাগলো। পুষ্প ওর হাত ধরে বসে রইল, বল্লে—তাই তো সাগর-কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট এ লোকেও ভুলতে পারিনি। জন্মান্তরের স্মৃতিতেও অক্ষয় ঘেন হয়। তোমার ষাওয়ার পথে দেবতার ফুল ফেলুন যতুদা—আমি হতভাগিনী, চিরকাল একাই থাকবো। এই আমার ভাগ্য।

যতীন ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—আমার মুক্তিতে দরকার নেই, কোনো কিছুর দরকার নেই। সমাধি-টমাধি, দেবী-টেবী সব বাজে। তোকে ছেড়ে যাবো না।

—আশা?

—তার অদৃষ্টে যা হয় হবে পুষ্প।

—ঠিক কথা যতুদা?

—প্রাণের সত্য কথা বললাম! এখন আমার অন্তর যা বলচে। সব তুচ্ছ হয়ে গিয়েচে আমার কাছে—তুই থাক পুষ্প আমার!

—জগতের, বিখের বহনুর সীমানায় চলে যাও যতুদা, তোমায় মুক্তি দিলাম। ভালবেসো, ভুলো না।

—ওসব থিয়েটারী ধরনের কথা কোথায় শিখলি রে? তোদের দোহাই, মুক্তি-টুক্তির কথা আমার আর শোনাসনে। চল তুই আর আমি পৃথিবীতে যাই, ছোট নদীর ধারে কুঁড়ে ঘরে সংসার পাতবো। সেই আমাদের স্বর্গ, সেই আমাদের সব।

পুষ্পের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো ঝরঝর করে। সে কোনো কথা বললে না।

সেদিনই যতীনের মনে হোল কে যেন কোথায় তাকে ডাকচে...সব সময় তার প্রাণের মধ্যে কিসের ধেন মোচড় দিচ্ছে...আশা, অভাগিনী আশা, ভুলোঁকের নীচের স্তরে অসহায়, একাকিনী পড়ে আছে, কেউ নেই তাকে দেখবার।

সত্যি আশা তাকে ডাকচে। তার অন্তরাআ শুনতে পেয়েচে অভাগিনীর ডাক।

সে পুষ্পকে কথাটা বললে—তোর বৌদিদি বড্ড কঁাদচে পুষ্প। সেদিন কুড়ুলে-বিনোদ-পুরের বাড়ীতে হঠাৎ দেখা হওয়ার পর থেকে ওর ডাক প্রায়ই শুন।

—আমি যাই সেখানে যতুদা, তুমি যেও না। দেখে আসি।

—কিছু ভাল লাগে না ওর জন্তে।

—কেন তোমাকে যেতে বারণ করি, ও সব নীচের স্তরে তোমায় যেতে দিতে আমার মন সরে না।

—তুই তো যাস্ দিবি।

—আমি গিয়েছিলাম আচার্য্য রঘুনাথের রূপায়। মহাপুরুষদের বিশেষ দয়ায় বিশেষ শক্তি হয়। নয়তো ওই সব স্তরে নানান রকমের নিম্নশ্রেণীর শক্তি খেলা করতে সক্ষম, মহাপুরুষদের রূপায় বিশেষ শক্তি লাভ করে সেখানে গেলে ওই সব দৃষ্ট শক্তি কোনো অনিষ্ট করতে পারে না। নয়তো বিপদ পদে পদে—এই জন্তেই তোমাকে ওখানে যেতে দিতে চাইনে যতুদা। চলো দেখি কি উপায় হয়।

রঘুনাথদাসের আশ্রমে যাবার পথে কবি ক্ষেমদাসের সঙ্গে দেখা। তিনি আপন মনে একটি বৃকতলায় চূপ করে বসে; অতি সুন্দর নির্জন স্থানটি, বনপুষ্প ফুটে আছে ঝর্ণার ধারে। ওরা কাছে গিয়ে দেখলে পৃথিবীর দিকে তিনি একদৃষ্টে চেয়ে কি যেন দেখছেন। ওদের দেখে সম্মিত মুখে সম্ভাষণ করলেন। যতীন ও পুষ্প দুজনেই গুঁকে প্রণাম করে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

ক্ষেমদাস বললেন—কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

পুষ্প বলল—রঘুনাথদাসের আশ্রমে। বড় বিপদে পড়ে যাচ্ছি। আপনিও শুনুন দেব—হুঁদী কিছু উপায় হয়। তারপর সে আশার কাহিনী সব খুলে বলল।

ক্ষেমদাস সব শুনে দীর্ঘভাবে বললেন—এই দুঃখ সনাতন। আত্মা নিরন্তর সাধনা করচে নিজেকে জানবার। আমার নিজের জীবনেও এমনি হয়েছিল। আমি তাই এখানে বসে

বসে ভাবছিলাম, আবার পৃথিবীতে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না উঠেচে যেমন উঠতো পাঁচশো বছর আগে, অনাচল্য মহাকাল নিজের কাজ করে চলেচে যেমন করতো হাজার বছর কি দু-হাজার বছর আগে—আমি পৃথিবীতে একটি মেয়েকে কত ভালবাসতাম, আমাদের গ্রামের সদানন্দী মঠের ফুলবাগানে কত বেড়াতাম দুজনে এমনি জ্যোৎস্নারাজে—লুকিয়ে লুকিয়ে,—এখন সে কোথায় ?

অনেকটা অন্তমনস্ক ভাবেই কবি মাথা দু'লিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস কেলে বল্লেন—সত্যি তাই ভাবি, কোথায় সে ?

পুষ্প অবাক হয়ে বল্লে—কেন, আপনি তাঁর দেখা পাননি আর ?

—না। বিবের ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গেল। জাখো, আমরা কবি, জগতে রূপরসের উপাসক। একেই বড় করেচি জীবনে। যারা বলেন সব যায়, তাঁদের কথা বুঝি না। যায় লয় হোলে এই রূপরসের জগৎটাও লয় হয়। তা আমরা চাইনে—তাই ছুঁব পাই, কিন্তু দুঃখের মধ্যেও জানি ভগবানই সৃষ্টি করেচেন এই জগৎ। সবই তিনি। কষ্ট পেলেও জানি তাঁর হাতে কষ্ট পাচ্ছি। প্রেমময়ের তাড়নার কষ্ট কি ? সব মুখ বুজে সহ্য করি। এটাও মানি, এই রূপরসের সাধনার মধ্যেই আমাদের সিদ্ধি। এ পথেও তাঁকে পাওয়া যায়। চলো, নরকে আমি নিজে যাবো, খুঁজে বার করি তোমাদের সেই মেয়েটিকে। তাঁর ছুঁব আমি কবি আমি বুঝি—

যতীন বল্লে—প্রভু, আমার পুনর্জন্ম ঠিক হয়ে গিয়েচে সেই মেয়েটিকে নিয়ে। করুণাদেবী জানিয়েচেন—

ক্ষেমদাস বল্লেন—তিনি যা করেচেন, তোমাদের মঙ্গলের জেহেই। তিনি পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী—তাঁকে তোমরা করুণাদেবী বল, দুর্গা বল, লক্ষ্মী বল, সীতা বল, সরস্বতী বল—সবই এক। তবে এখন মেয়েটির কাছে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। উপায় হয়ে গিয়েচে।

যতীন আশ্চর্য হয়ে গেল শুনে। অত বড় বড় পৌরাণিক দেবীর সঙ্গে সে করুণাদেবীকে এক আসনে বসায়নি। উনি যদি দুর্গা হন, কালী হন, সীতা হন, লক্ষ্মী হন—তবে তাঁর আর জন্মমরণের ভয় কিসের ? আশারই বা ভয় কিসের ? হারিসমুখে সে মহাগোরবে নরকে যেতেও প্রস্তুত।

ক্ষেমদাস ওর মনের ভাব বুঝে বল্লেন—জন্ম নিতে ছুঁব কিসের ? পৃথিবীর রূপরস আবার আশ্বাদ করে এসো। সেই জ্যোৎস্না, সেই বনবিহীন, কোকিলের কুহতান, সেই মায়ের কোলে যাপিত একান্তনির্ভরতার শৈশব, প্রথম যৌবনে প্রিয়ার প্রথম দর্শন—যাও যাও, ওরই মধ্যে ভগবানে মন রেখে—কর্ম যতদিন না কটে।

কিরে মা'রুখ জন'হিয়ে পশুপাখী অথবা কীটপতঙ্গ

করমবিপাকে গতাগতি পুন-পুন মতি রহ' তুয়া পরসঙ্গে।

মেয়েটির কাছে যাবার কোনো দরকার নেই। দেবী যখন তাঁর ব্যবস্থা করেচেন,

তখন আমাদের সেখানে যাওয়া ধৃষ্টতা হবে। দেবী সর্বমঙ্গলা তাকে শ্রেয়ের পথে চালিত করবেন।

ঠিক সেই সময় একজন জ্যোতির্ষয় মহাপুরুষের আবির্ভাব হোল বৃক্ষতলে। যতীন তাঁর দিকে চেয়েই চমকে উঠলো, ইনি সেই সন্ন্যাসী, যিনি একদিন স্পর্শদ্বারা তার মধ্যে সবিকর সমাধির অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছিলেন! সেই যোগী পুরুষই—নীল বিছাতের মত আভা বেকুচে, সারা দেহ থেকে ঠাণ্ডা।

যতীনের দিকে চেয়ে তিনি মুহূর্ত্তে হেসে বলেন—মনে আছে ?

যতীন ভাড়াভাড়া পায়ের ধূলো নিলে, পুষ্পও তাই করলে। ক্ষেমদাস চুপ করে বসে রইলেন।

তিনি আবার বলেন—মনে আছে ? বলেছিলাম সময় পেলে দেখা দেবো। এই সেই মেয়েটি বৃষ্টি ? এঁর তো খুব উচ্চ অবস্থা দেখছি। ক্ষেমদাসের দিকে চেয়ে বলেন—কবি যে! কি করচ বসে বসে ?

ক্ষেমদাস বলেন—তোমাদের মত সমাধির চেষ্টায় আছি—

—ও তোমাদের অনেক দূর। মায়িক-জগতের বন্ধন এখনও তোমাদের কাটেনি। আবার এদেরও মাথা খাচ কেন ও কথা বলে ?

—আমিও ঠিক ওই কথাই তোমায় বলতে পারি। অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান-ট্যান এই সব ক'চি ক'চি ছেলেমেয়ের মাথায় ঢোকাচ কেন ?

সন্ন্যাসী হেসে ক্ষেমদাসের কাছে এসে দাঁড়িয়ে স্নেহ স্বরে বলেন—তুমিও ঐ দলেরই একজন। কবি কিনা, মিথ্যা কল্পনার রাজ্যে বাস করো।

পুষ্প সময় বুঝে বলে—প্রভু, জানেন এঁর প্রতি পুনর্জন্মের আদেশ হয়েছে।

সন্ন্যাসী বলেন—নয়তো কি ভেবেচ ইনি মায়ায় অতীত হয়ে যাতায়াতের চক্রপথ এড়িয়ে ব্রহ্ম লাভ করেচেন ? আত্মানং বিজি—আত্মাকে জানো। আত্মাকে না জানলে যাতায়াত বন্ধ হবে না—

ক্ষেমদাস বলে উঠলেন—বয়েই গেল। ক্ষতিটা কি ?

—বাজে কথা বলা না কবি। তোমার ক্ষতি না হতে পারে। তোমার মত চোখ আর মন নিয়ে ক'জন পৃথিবীতে যাবে ? সাধারণ লোক গিয়ে অর্থ, যশ, মান, নারী নিয়ে উন্মত্ত থাকবে। প্রকৃতির মৌল্য মায়ায় খেলা হোক—ওবুও স্বীকার করি দেখতে জানলে তা দেখেও সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভের প্রতি মানুষের মন পৌঁছতে পারে। ও যে একটা সোপান। কিন্তু তা ক'জনের চোখ থাকে দেখবার ? আর্ন্তের সেবা করে ক'জন ? কাজেই মানুষের দুঃখ যায় না। মনে আনন্দ পায় না। ভোগ করতে করতে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে জরার অধিকার শুরু হয়েছে ! তখন মৃত্যুভয়ে বলির পশুর মত জড়পড় হয়ে থাকে। তা ছাড়া আছে শোক, বিচ্ছেদ, বিতর্নাস, অশ্রুমান, আশাভঙ্গের যন্ত্রণা। কোথায় সুখ বলা ?

—দুঃখের মধ্যেই আনন্দ হে সন্ন্যাসী—দুঃখ ভোগ করতে করতেই আত্মা বড় হয়ে ওঠে, বীতস্পৃহ হয়, বীতমম্বা হয়, বীতশোক হয়। ভগবানের দিকে মন যায়। জন্মে জন্মে আত্মা বললাভ করে, জন্ম-জন্মান্তরের চিত্তার আগুনে পুড়ে সে ক্রমশ নির্মল, শুদ্ধ, জ্ঞানী হয়ে ওঠে। ভগবানেরই এই ব্যবস্থা—এ তুমি অস্বীকার করতে পারো? ক'জন তোমার মত নর্যদাতীয়ে সারাজীবন তপশ্যা করে ভগবানের দর্শন পেয়েচে? বহু ভুগে, বহু ঠেকে, বহু নারী, সুরা, অর্থ বিত্ত ভোগ করে মানুষ ক্রমশ বিষয়ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়ে আসে—বহু জন্ম ধরে এমন চলে—তখন জন্ম-জন্মান্তরীণ স্মৃতি তাকে বলে আবার কোনো নতুন জন্মে—ও থেকে নিবৃত্ত হও, ও পথ তো দেখলে গত কত শত জন্ম ধরে, আবার সেই একই ফাঁদে পড়ো, সেই রকম কষ্ট পাবে। ভোগের দ্বারা আত্মাও তখন অনেকটা বীতস্পৃহ হয়ে উঠেচে—তখন সে ভোগ ছেড়ে ত্যাগের পথ খোঁজে।

—হ্যাঁ, তোমার কথা কাটি কি করে? তুমি কবি, অন্য পথ গিয়ে সত্যদৃষ্টি লাভ করেচ। কিন্তু একটা কথা বোঝো—যদি এক জন্মেই হয় তবে ভগবানের ওপর বোঝা চাপিয়ে শত শত জন্ম ধরে এ অনাগত চক্রে ঘোরাঘুরি কেন?...

ক্ষেমদাস সুকণ্ঠে গেয়ে উঠলেন হাত দুটি হৃদয়ের ভঙ্গিতে নেড়ে নেড়ে—

কিয়ে মানুষ জনমিয়ে পশুপাখী অথবা কীটপতঙ্গ

করমবিপাকে গতাগতি পুন-পুন মতি রহি তুয়া পরসঙ্গে—

সন্ন্যাসী বিরক্তির সুরে বল্লেন—আঃ, ও সব ভাবুকতা রাখো। আমার কথার উত্তর দাও।

ক্ষেমদাস বল্লেন—কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্তু মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেন্—কলিতে বহু দোষ, কিন্তু একটা গুণ এই যে, কৃষ্ণনাম কীর্তন করলেই পরা মুক্তি। তাই বলেচে—

এই পর্য্যন্ত বলেই আবার সুর করে কি বলতে যাচ্ছিলেন, সন্ন্যাসী ধমক দিয়ে বল্লেন—আবার ওই সব! গান আসচে কিসে এর মধ্যে? তা ছাড়া আমি তোমাদের ওই কৃষ্ণদৃষ্ণ মানিনে জানো? ওসক মারিক কল্লনা—ভগবানের আবার রূপ কি!

—তুমি শুধু পথে ভগবানের সঙ্গে নিজের সত্তা মিলিয়ে অর্ঘ্যতজ্ঞান লাভ করেচ। ভক্তি-পথের কিছুই জানো না। প্রেমভক্তি এখনও বাকি তোমার।

—মরুক গে। আমার কথার উত্তর দাও—

—উত্তর কি দেব? ভোগ না হোলে নিবৃত্তি হয় না। ভগবান তা জানেন, তাই শত জন্মের মধ্যে দিয়ে জীবকে তিনি ভোগ আশ্বাদ করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। সবারই হবে, তবে বিলম্বে।

সন্ন্যাসী শান্ত ভাবে বল্লেন—হাঁ ঠিক।

—তুমি মেনে নিলে?

—নিলাম। কিন্তু তুমি আমার কথার ঠিক উত্তর দিলে কৈ? যদি এক জন্মে হয় তবে হাজার জন্মের মধ্যে দিয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটি কেন?

ক্ষেমদাস হেসে বলেন—তার কারণ, সবাই তোমার মত মূর্তিকামী নয়, তোমার মত জ্ঞানী নয়—গত জন্মে তুমি যে উচ্চ অবস্থা নিয়ে জন্মেছিলে, যে জন্ম-জন্মান্তরীণ স্মৃতির ফলে তোমার মন মুমূক্ষু হয়েছিল, সংসারের আসক্তির বন্ধন কাটিয়েছিল—তুমিই বলো না, সে কি তুমি একজন্মে লাভ করেছিলে? তুমি তো ষড়ৈশ্বর্যশালী—মুক্ত পুরুষ—তোমার অজানা তো কিছুই নেই—বলো তুমি?

সন্ন্যাসী মুহূর্তে হেসে বলেন—তা ঠিক। গত জন্মের পূর্ব তিন জন্মেও আমি যোগী ছিলাম। আমার সে সময়ের গুরুভ্রাতা এখনও হিমালয়ের দুর্গম শিখরে তুষারাবৃত গুহায় দেহধারী হয়ে বাস করছেন। প্রায় আটশো বছর বয়েস হোল। লোকালয়ের কিছুই জানেন না। গত সাতশো বছরের মধ্যে তিনবার নীচে নেমে গিয়েছিলেন ভারতের লোকালয়ে। একবার নেমে শুনলেন শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করছেন। দ্বিতীয়বার নামলেন অনেকদিন পরে; নামতে নামতে শুনলেন যবনেরা ভারতে প্রবেশ করেছে—শুনে আর না নেমে গিয়ে উঠে নিজের আসনে চলে গেলেন, অনেকদিন আর নায়েন নি।

পুষ্প ও যতীন রুদ্ধকণ্ঠে শুনছিল। পুষ্প অধীর কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে—আর একবার কখন নেমেছিলেন?

—আমি তখন এ জন্মের পরেও দেহতাগ করেছি—এই সেদিন, পৃথিবীর হিসেবে বড়জোর সত্তর আশি বছর হবে। বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ভারতব্যাপী, আমরা অনেকে দলবদ্ধ হয়ে নেমে যাই ভারতে যদি কোন প্রতিকার করতে পারি। ঠুঁকেও নিয়েছিলাম আমাদের সঙ্গে। কুস্তমেলা সেবার প্রয়াগে। উনি মেলা দর্শন করে দশদিন থেকে ওপরে উঠে যান—সেই শেষ, আর লোকালয়ে যান নি।

ক্ষেমদাস প্রশ্ন করলেন—এখনও দেহে রয়েছেন কেন?

—যোগ-প্রক্রিয়ায় দেহ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে গিয়েছে, তাই দেহ ধারণ করেই আছেন। বাসনা-কামনা-শুভ্র মূক্তপুরুষ তিনি, দেহে থাকাও যা, দেহে না থাকলেও তা। তাঁর পক্ষে সব সমান। স্বেচ্ছাক্রমে বিশ্বের সর্বত্র তাঁর অবাধ গতি, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত। আমিও তাঁকে বলেছিলাম—আর দেহে কেন? উনি বলেন—হাম্ তো আত্মানন্দ আত্মারাম, হামারা ওয়াস্তে যো হ্যায় ব্রহ্মলোক, সো মেরা হিমবান, মেরা আসন। এহি পর পরমাত্মা বিরাজমান হ্যায়। লোকালোক তো মায়া—

ক্ষেমদাস বলেন—হ্যাঁ, ওসব অনেক উচ্চ অবস্থার কথা। আমাদের জ্ঞান নয় ওসব। আমরা ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ পাই, এই অপূর্ব সৌন্দর্য্যরসের আনন্দ করবে কে আমরা ছাড়া? তোমরা তো ব্রহ্ম হয়ে বুড়ি ছুঁয়ে বুড়ি হয়ে বসে আছ।

পুষ্প কুণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করলে—প্রভু, আমাদের একবার সেই সাধুর কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাবেন?

সন্ন্যাসী বলেন—না যা। তিনি লোকের ভিড় পছন্দ করেন না। তবে চলো আমার পূর্বজন্মের আর একটি গুরুভগ্নীর কাছে তোমার নিয়ে যাবো—তিনিও আজ পর্যন্ত দেহে

আছেন। গভীর বনের মধ্যে গুপ্তভাবে থাকেন—প্রায় সময়ই সমাধিস্থ থাকেন। চলো হে কবি, সমাধি দেখলে তোমার জাত যাবে না—

ক্ষেমদাস বলেন—না হে, আমি যাবো না। তুমি এদের নিয়ে যাও—আমার ও ধর্ম নয়। কবির ধর্ম স্বতন্ত্র।

সন্ন্যাসী হেসে এসে ক্ষেমদাসের হাত ধরে বলেন—ভগবানের মহিমা সর্বত্র। কেন যাবে না? চলো—

—বেশ, তাহলে তুমি কথা দাঁও আমার সঙ্গে ভক্ত বৈষ্ণবের আশ্রমে যাবে? যদি শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পারি দেখানে? প্রেমভক্তি নেবে?

সন্ন্যাসী পুনরায় হেসে বলেন—হবে, হবে। আচ্ছা যাবো, কথা দিলাম। প্রেমভক্তি নিই না নিই স্বতন্ত্র কথা। তোমাকেও তো আমি ঘটক্রোভেদ করে অদ্বৈতজ্ঞান পাইয়ে দিচ্ছি না জোর করে?

কিছুক্ষণ পরে ওরা সবাই সন্ন্যাসীর পিছু পিছু পৃথিবীর এক স্থানে নেমে এল। স্থানটি দেখেই ওরা বুঝলে, লোকালয় থেকে বহু দূরে কোনো এক নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ওরা দাঁড়িয়ে। সম্মুখে একটি পার্কৃত্য নদী, কিন্তু নদীগর্ভে কোথাও মাটি বা বালি নেই—সমস্তটা পাষাণময়, চওড়া সমতল, মসৃণ। প্রায় একশো হাত পরিমিত স্থান কি তার চেয়ে বেশি এমনি আপনা-আপনি পাথর-বাঁধানো। তারই মধ্যভাগ বেয়ে ক্ষুদ্র নদীটি ক্ষুদ্র একটি জল-প্রপাতের সৃষ্টি করে মর্যদ-কলতানে বয়ে চলেচে। উভয় তীরে নিবিড় জঙ্গল, মোটা মোটা লতা এ-গাছ থেকে ও-গাছে ছলচে; গভীর নিশীথকাল পৃথিবীতে, আকাশে ঠিক মাথার ওপরে চাঁদ, গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে সমস্ত অরণ্যভূমি মায়াময় হয়ে উঠেচে।

ওরা মুগ্ধ হয়ে সে অপূর্ণ অরণ্য দৃশ্য দেখচে, এগন সময়ে বনের মধ্যে বাঘের গর্জন শোনা গেল, দ্বিতীয়বার শোনা গেল আরও নিকটে। যতীন সভয়ে বলে উঠলো—ভই! চলুন পালাই—

অল্প পরেই ওপারের বনের লতাপাতা নিঃশব্দে সরিয়ে প্রকাণ্ড রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হাঁড়ির মত মুখ নদীজলে নামাতে দেখা গেল এবং তার জল খাওয়ার ‘চক্ চক্’ শব্দ বনের বিল্লীরবের সঙ্গে মিলে এই গভীর রহস্যময় রজনীর নৈঃশব্দ্য মুখর করে তুলতে লাগলো।

পুষ্প বলে—ভয় কি যতীনদা তোমার এখন বাঘের?

ক্ষেমদাস মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই অপূর্ণ শোভাময় জ্যোৎস্নাপ্রাবিত নির্জন বনকান্তারের দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। দুগাত জুড়ে নমস্কার করে বলেন—সুন্দর। সুন্দর! নমস্কার হে ভগবান, ধন্য তুমি, আদি কবি তুমি জগৎস্রষ্টা! কর্ণামৃতে ঠিক বলেচে—গধুগন্ধি...

সন্ন্যাসী বলেন—ব্রহ্মই জগৎ হয়ে রয়েছেন, য ওষধিযু যো বনস্পতিযু—তিনিই সর্বত্র। সামনে যা দেখচো এও তিনি, তাঁর বিশ্বরূপের এক রূপ—তবে অত ভাবুকতা আমাদের আসে না, ইনিয়ে-বিনিয়ে বর্ণনা করা আসে না।

ক্ষেমদাস হেসে বলেন—মাসবে কি হে! তাহাণে তো তুমি উপনিষদ তৈরি করে বসতে। তোমার সঙ্গে উপনিষদের কবিদের তর্কাতর্ক তো সেইখানে। তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, আবার কবিও ছিলেন। তোমার মত নীরস ব্রহ্মবিৎ ছিলেন না। ভগবানও কবি। উপনিষদে কি বলেনি তাঁকে, কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ ?

সন্ন্যাসী বলেন—চলো চলো, যে জন্তে এসেছি। উপনিষদে কবি বলেচে যিনি দ্রষ্টা তাঁকে। যিনি প্রজ্ঞার আলোকে এক চমকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান দর্শন করেন, চিন্তা ঘরা যাকে বুঝতে হয় না, তিনিই কবি ?

যতীন বলে—প্রভু, এ কোন্ জায়গা পৃথিবীর ?

—এ হোল বাস্তুর রাজ্য, মধ্যভারতের। এই নদীর নাম মহানদী, উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে সমুদ্রে পড়েচে। এখনে নদীর শৈশবাবস্থা দেখচ, সবে বেরিয়েচে অদূরবর্তী পাহাড়শ্রেণী থেকে। এখন এসো আমার সঙ্গে—

নদীর ওপারে কিছুদূরে ঘন বনে একটি পর্ণ-কুটারের কাছে ওরা যেতেই একটি সন্ন্যাসিনী তাড়াতাড়ি বার হয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। বলেন—আম্নন আপনারা। আমার বড় সৌভাগ্য আজ—

যতীন ও পুষ্পের মনে হোল ইনি যেন ওদের অপেক্ষাতেই ছিলেন। সন্ন্যাসিনীকে দেখে যতীন অবাক হয়ে গেল, সন্ন্যাসী বলেচেন তাঁর পূর্বজন্মের গুরুভগিনী—অথচ ইনি তো কুড়ি বৎসরের তরুণীর সত সুঠাম, স্নেহপা, তব্বী। উজ্জল গৌরবর্ণ, রূপ যেন কেটে পড়ে, মথার একটাল কালো চুলের রাশ।

সন্ন্যাসী বলেন—ভাল আছ ভগ্নী ?

সন্ন্যাসিনী হেসে হিন্দীতে বলেন—পরমাত্মা যেমন রেখেচেন। এঁরাও তো দেখচি বিদেহী আত্মা। এদের এনেচ কেন ?

পুষ্প ও যতীন সন্ন্যাসিনীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। ক্ষেমদাস যুক্তকরে নমস্কার করলেন।

সন্ন্যাসী বলেন—এঁরা এসেচেন তোমায় দেখতে। ইনি বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি ক্ষেমদাস—

সন্ন্যাসিনী বলেন—আইয়ে মহারাজ, আপকা চরণধূলসে হামারা আশ্রম পবিত্র হো গিয়া—পরমাত্মাকি রূপা।

ক্ষেমদাস বলেন—মা, আপনি দেবী, আপনার দর্শনে আমরা পুণ্যলাভ করলাম।

সন্ন্যাসিনীর স্নেহের মুখের লাবণ্যময় হাসি অরণ্যভূমির জ্যোৎস্নাস্নাত মৌনধ্যাকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলেচে। কুটারের ঝরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন—এহি নদীমে আজ পুণিমাঞ্চী রাতমে স্বর্গসে উতার করু অপ্সরীগোণ্ নহুতে থে। হাম বহু বরষসে দেখতে হে। আপকো মালুম হায় ?

ক্ষেমদাস বলেন—না মা, আমরা তো জানি না। আমাদের দেখাবেন ?

—আপ দেখেন মংতা ?

—হাঁ মা, দেখলেই দেখি।

সন্ন্যাসী বলেন—এঁর বয়স কত বল তো যতীন ?

যতীন সঙ্কুচিত ভাবে বলে—আমি কি বলবো ? দেখে তো মনে হয় কুড়ি-বাইশ।

সন্ন্যাসিনী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন বালিকার মত।

সন্ন্যাসী বলেন—তুমি তোমার জ্ঞান-মত বলেচ, তোমার দোষ নেই। তোমার ধারণা নেই এ বিষয়ে।

সন্ন্যাসিনী বলেন—তুমি ক্যা বোলতা হ্যায় রে বাঁচা ? হামারা তো এহি আসন পর পাঁচিস বরষ বীত গিয়া—ইসকা পহ্লে পঞ্জাবমে রাতি নদীকী তীরমে করিব সন্তর বরষ আসন থা। গুরুজীকা অহুজ্ঞাপর এহি বনমে মহানদীকে কিনারপর আশ্রম বনায়া।

যতীন মনে মনে হিসেব করে বলে—তা হোলে আমার প্রপিতামহীর চেয়েও আপনি বড়—

সন্ন্যাসী বলেন—ওঁর বয়স দেড়শো বছরের কাছাকাছি—বয়স কিছু বেশি হবে তো কম নয়।

ক্ষেমদাস বলেন—মা, দেহধারী হরে আছেন যে এখনো ?

সন্ন্যাসিনী হেসে বলেন—বহু নেতি ধোতি কিয়া—ইসিমে শরীর বনু গিয়া। আভি ধ্বংস নেহি হোগা কোই পান্‌ ছ' শো বরষ। কোই হরজ নেহি, রহে তো রহে।

যতীন আপন মনে ভাবলে—বাবা: এই দুর্গম বনের মধ্যে উনি একা কি করে থাকেন ! বাঘের ভয় করে না ? এ তো বাঘের আঁড্ডা দেখে এলাম।

সন্ন্যাসিনী ওর মন বুঝেই যেন বলেন—যখন সমাধিতে থাকি তখন বাঘ আসে, বিষাক্ত সাপ এসে মাথায় ওঠে। গায়ে বেড়ায়। সমাধি ভাঙলে ওদের যাতায়াতের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারি।

সন্ন্যাসী বলেন—আজকাল কি আহাংর ছেড়েচ ?

—না। কন্দমূল খাই, বেলগাছ আছে আশ্রমের পেছনে অনেক, বেল খাই। সামান্যই আহাংর।

ক্ষেমদাস বলেন—মা, তুমিও কি প্রেমভক্তির বিপক্ষে ? তুমিও নীরস অষ্টভক্তবাদী ?

সন্ন্যাসিনী হেসে বলেন—মাং পুছিয়ে। প্রেমভক্তি বহু রূপাসে লোভ হোতা হ্যায়—হামারা তো তিন যুগ গুজর গিয়া, ও বস্তু নেহি মিলা। কাঁহা মিলেগা বাংলাইরে মহাত্মা রূপা কবু। আপ দিচ্ছিহে হাম্‌কো !

ক্ষেমদাস বলেন—আমার শক্তি নেই মা। আমি কবি, এই পর্য্যন্ত। ও সব দেওয়া নেওয়ার মধ্যে আমি নেই। তবে তোমাকে আমি উর্দ্ধলোকে বৈষ্ণবাচার্যাদের আশ্রমে নিয়ে যেতে পারি, তাঁদের কাছে উপদেশ পেতে পারো। তবে দরকার কি মা ? তোমরা তো প্রতিক্ষেপে সমাধি-অবস্থায় ব্রহ্মকে আত্মাদ করচো—কি হবে প্রেমভক্তি ?

—আমার কাছে গৃহস্থদের নানা দেবদেবী আসেন, নানা দেশ থেকে আসেন—একা

থাকি বলে মাঝে মাঝে সঙ্গ দিতে আসেন। লঘদামোদর, গোপাল, উগ্রভায়া, মৃন্ময়ী, আমরার, অষ্টভুজা—যারও কত কি নাম। এসে গল্পগুজব করেন, সুখস্বপ্নের কথা বলেন। সেদিন এক ঠাকুর এসে হাজির আপনাদের বাংলাদেশের মুরশিদাবাদ জেলার কি গ্রাম থেকে—নাম শামসুন্দর। আমরা এসে ছলছল চোখে বলেন—যে গ্রামে আছেন, সেখানে নাকি গৃহস্থেরা অনাদর করচে, ঠিকমত ভোগ দিচ্ছে না, খেতে পান না—এই সব। তা আমি বললাম—আমার কাছে কেন তুমি? আমি তোমাদের মানিনে। যারা মানে তাদের কাছে গিয়ে প্রকট হও, তোমার নালিশ জানাও, আমাদের বলে কি হবে? বালক বিগ্রহ, ওর চোখে জল দেখে কষ্ট হোল—পাষণ্ডী গৃহস্থেরা কেন সেবা করে না কি জানি। ওই সব দেখে আমার মন কেমন করে, মনে হয় প্রেমভক্তি হোলে এঁদের নিয়ে আনন্দ করতাম।

সন্ন্যাসী হেসে বলেন—যায়া, যায়া, নির্বিকল্প ভূমি থেকে নেমে এসে তুমি আবার ঐ সব মায়িক ঠাকুরদেবতার সঙ্গে সখ্য পাতাতে চাও?

ক্ষেমদাস বলেন—মা, তোমাকে প্রেমভক্তি দেবার জন্মেই ওই সব দেবদেবী আসেন—আরও আসেন তুমি মেয়েমানুষ বলে—হাজার অদ্বৈতবাদী হোলেও এখনও তোমাদের মন এই এঁদের মত কঠোর, নীরস, শুষ্ক হয়ে ওঠেনি। তাই তোমার কাছে আসেন, কই এঁর কাছে তো আসেন না? এলে আমল পাবেন না বলেই আসেন না। ভগবানও প্রেমভক্তির কাঙাল, যে ভক্ত তারই কাছে লোভীর মত ঘোরেন। যে প্রেমভক্তি দিতে পারবে না, তার কাছে তো তিনি—

সন্ন্যাসী বাধা দিয়ে বিরক্তির সুরে বলেন—আঃ, তোমার ওই সব অসার, ফাঁকা ভাবুকতা-গুলো রাখবে দয়া করে? ওতে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করে সত্যি বলচি। যত খুশি প্রেম-ভক্তি বিলোপ গিয়ে তোমার সেই বৈষ্ণবাচার্য্যের আখড়ায়—আমাদের আর শুনিও না—যত খুশি কাব্যরচনা কর বুদ্ধাবন আর চাঁদের আলো আর কদম্বমূল নিয়ে সেখানে বসে।

ক্ষেমদাস বলেন—তোমাকেও একদিন ভক্তির ক্ষুরে মাথা মড়ুতে হবে হে কঠোর জ্ঞান-মার্গী সন্ন্যাসী। আমার নাম যদি ক্ষেমদাস হয়—

সন্ন্যাসী বলেন—আচ্ছা, এখন বন্ধ করো। তুমি আমাকে বলচো নীরস। তোমাকে আমি এমন এক জ্ঞানীর কাছে নিয়ে যাবো যিনি সম্পূর্ণ নাস্তিক, জড়বাদী। পঞ্চভূতের বিকারে এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে বলেন। ঈশ্বর মানেন না, সৃষ্টিকর্তা মানেন না; আত্মাকে বলেন পঞ্চভূতের বিকার, জড়ের, ধর্মের আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েছে, আপনা-আপনিই একদিন লয় হবে—এই মত পোষণ করেন।

—কে? লোকায়ত দর্শনের কর্তা চার্ব্বাক?

—চার্ব্বাক নন, তাঁর প্রভাবান্বিত কোনো শিষ্য।

—কি অবস্থা লাভ করছেন?

—স্বাগুবৎ অচলাবস্থা। খুব উচ্চস্তরেই আছেন, পুরুষকারের বলে উন্নতভূমি লাভ করেচেন, কিন্তু মুক্তি হয়নি। এর মধ্যে দুবার পৃথিবী ঘুরে এসেছেন। বলেন, এও জড়ের

ধর্ম। মুক্তি বলে কিছু নেই। ঈশ্বর মিথ্যা। কাকে তিনি উপাসনা করবেন? পুনর্জন্মে দুঃখিত নন। জন্মান্তরীণ স্মৃতি জলজল করচে মনে।

—কি অবলম্বনে আছেন?

—জড়ের ধর্ম পরীক্ষা করেন। তরুণ শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করেন। পৃথিবীতে বহু তরুণ-দলকে যুগে যুগে প্রভাবান্বিত করচেন জড়ধর্মের একচ্ছত্র প্রতিপাদনের জন্তে। ব্যাসক্তি-শূন্য, উদার পুরুষ।

—মৃত্যুর পরে দেহধ্বংসে আত্মা থাকে দেখেও জড়বাদী?

—হাঁ। বলেন, ওটাও জড়ের ধর্ম। গুটিপোকা দেহত্যাগ করে প্রজাপতি হচ্ছে এও দেখা যায়। আবশ্যক কি ঈশ্বরকে টেনে আনবার?

ক্ষেমদাস কানে আঙুল দিয়ে বলেন—ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, শুনতে নেই এসব কথা।

—কেন শুনতে নেই? এই ছাখো চোমাদের অজুদারত্ব। আমরা বলি, ব্রহ্মই জগতের সব হয়ে আছেন। নাস্তিক যিনি তিনি ব্রহ্মের বাইরে নন। ব্রহ্মের মধ্যে থেকে তিনি একথা বলছেন। এমন একদিন আসবে, ব্রহ্মজ্ঞান তিনি লাভ করবেন। বাদ পড়বেন না।

সন্ন্যাসিনী বলেন—আমারও তাই মত।

ক্ষেমদাস অধীরভাবে বলেন—বেশ, বেশ,। ওসব আলোচনা এখন থাক। চলো যাওয়া যাক! রাত্রি প্রভাত হয়ে এল—জ্যোৎস্না স্নান হয়ে আসচে। ওই শোনো ময়ূর ডাকচে বনে।

সন্ন্যাসিনীকে পুনরায় বন্দনা করে সকলে সেই গভীর বন পরিত্যাগ করলেন। কুটীরের আশেপাশে অনেক বস্ত্র দেবকাঞ্চন ফুল ফুটে আছে স্নান জ্যোৎস্নালোকে। অদূরের শৈলচূড়া শেষরাত্রের হিমবাষ্পে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। বস্ত্র কুকুটের রব রজনীর শেষ যান ঘোষণা করচে।

ক্ষেমদাস আকাশপথে বলেন—কি সন্ন্যাসী, যাবে তো রঘুনাথদাসের আশ্রমে?

সন্ন্যাসী রাজী হওয়াতে ওরা চক্ষের নিমেষে বৈষ্ণবাচার্য্যের আশ্রমের সামনে এসে পড়লো। ওরা সকলে রঘুনাথদাসের আগমনের দিকে গেল—পুষ্প গেল গোপাল-বিগ্রহ দেখতে ও তাঁর প্রাণের বাখা গোপালের পায়ে নিবেদন করতে। নীল ক্ষতিকে অপরূপ বিগ্রহের মুখে যেন করুণার হাসি লেগেই আছে। পুষ্প বাইরে এসে দাঁড়ালো, ঐ বিরাট অনন্ত বিশ্ব, আকাশের পটে কোটি কোটি নক্ষত্ররাজি (বৈষ্ণবাচার্য্যের আশ্রমে এখন রজনীর প্রথম যাম)—সেই যে সেদিন মহাপুরুষ উপনিষদের বাক্য উচ্চারণ করে শুনিয়েছিলেন—যশ্র ব্রহ্মাণ্ডস্ত সমস্ততঃ স্থিতানি এতাদৃশানন্তকোটিব্রহ্মাণানি সাবরণানি জলন্তি—এই ব্রহ্মাণ্ডের আশেপাশে আরও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড জলচে—সব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধীশ্বর, সেই বিরাট দেবতা কেন এখানে ক্ষুদ্র বিগ্রহে নিজেকে আবদ্ধ রেখেচেন কিসের টানে কে বলবে?

পুষ্প প্রণাম করলে সাষ্টাঙ্গে। সে বিরাটের কতটুকু ধারণা করতে পারে, মেরেমাছ

সে। সে অতি ক্ষুদ্র নারী মাত্র। দয়া করে মধুররূপে ধরা না দিলে সে কীরোদসাগরশায়ী মহাবিষ্ণুর কিংবা তাঁর চেয়েও এককটি সর্বেশ নিরাকার পরব্রহ্মের কি ধারণা করতে সমর্থ? মন্দির প্রণাম করে উঠে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করলে—হে ঠাকুর আশা বৌদিদিকে রূপা কর। এবার যতীনদা ও আশার ভ্রাতৃ তেজমার আশীর্ব্বাদে যেন সার্থক হয়ে ওঠে। আর যেন আশার কুপথে মতি না হয় হে ঠাকুর। ওর প্রারব্ধ কর্ম্ম এবার যেন ক্ষয় হয়। ওকে দয়া কর।

মন্দিরের নিভৃত কুঞ্জতলে অপূর্ব্ব পুষ্পসুবাস। যেন বহু জাতী, যুথী, মালতী, হেনা, নাগকেশর একসঙ্গে প্রস্ফুটিত হয়েছে। সম্মাসী ও ক্ষেমদাস শ্বেতপ্রস্তরের চত্বরে বৃক্ষতলে বসে রঘুনাথদাসের সঙ্গে আলাোচনা করতেন।

রঘুনাথদাস বলতেন—আপনি আমার বিগ্রহটি দর্শন করে আসছেন। আপনার ভক্তি হবে। উনি ভক্তি আকর্ষণ করেন। আপনার আগমনে আমার আশ্রম আজ ধ্বংস হয়ে গেল। কিছুকাল এখানে থাকুন।

সম্মাসী বলেন—আপনি মহাপুরুষ, আপনার নিকটে থাকবো এ তো পরম সৌভাগ্য। তবে এবার নয়, আমি ঘুরে আসবো। বিগ্রহ দর্শন করে আসি।

বিগ্রহ দর্শন করে একটু পরেই ফিরলেন। বলেন—আপনার বিগ্রহ দেখছি বড় বিপজ্জনক বস্তু—সত্যিই আমাকে উনি আকর্ষণ করছেন। আমার বলেন—আমার কেমন লাগচে? আমি বল্লম—আমি তোমাকে মানি না। একরকম জোর করে চলে এসেছি—

বলে আপন মনেই হাসতে লাগলেন।

রঘুনাথদাস বলেন—আমার গোপাল আপনার ভক্তি আকর্ষণ করতে চাইছেন। আপনি দেবেন না?

—ক্ষমা করবেন আচার্য্যদেব। আমার সংশয় যেদিন ছিন্ন হবে সেদিন এসে আপনার আশ্রমে দীক্ষা নেবো প্রেমভক্তির। এখন ওসব আমি পুতুল-পুজোর সমান মনে করি।

রঘুনাথদাসের প্রশান্ত মুখমণ্ডলে মৃদুমন্দ হাসি ফুটলো। ঈশ্বর দর্পভরে বলেন—আমার গোপালের ক্ষমতা থাকে, আপনাকে তিনি ভজাবেন। পুতুল কি কথা বলে? আপনি ব্রহ্মবিৎ, ভেবে দেখুন। আপনার মত ভক্ত উনি চাইছেন। ব্রহ্মভূমি থেকে নেমে এসে ভগবানের লীলাঙ্গী হয়ে থাকুন।

—আপাতত আমার একটি গুরুভগ্নী প্রেমভক্তির জন্তে ব্যাকুল। তাকে দিন দয়া করে।

—কোথায়?

—সম্প্রতি দেহে বর্ধমান আছেন, মহানদীর তীরের বনমধ্যে তাঁর আসন। পরমাত্মার দর্শন পেয়ে ধ্বংস হয়েছেন। বহুকাল থেকে দেহধারিণী। আপনি আহ্বান করলে তিনি এখানেই আসবেন।

—আমি অকিঞ্চন। আমার কি সাধ্য প্রেমভক্তি দিই। গোপাল দেবেন—

পুষ্প এই সময়েই হঠাৎ জাহ্নু পেতে বসে করজোড়ে বিনীত কণ্ঠে বলে—ওই সঙ্গে আমাকেও দিন আচার্য্যদেব। আমার একমাত্র অবলম্বন।

ক্ষেমদাস উৎসাহে হাতহালি দিয়ে বলে উঠলেন—সাধু! সাধু!

রঘুনাথ পুষ্পের মাথায় হাত দিয়ে বলেন—আমি কে মা? গোপালের কাছে চাও। আমি আশীর্বাদ করি তুমি পাবে।

পুষ্প যতীনকে দেখিয়ে বলে—এঁকে আশীর্বাদ করুন। ইনি শীঘ্র পুনর্জন্ম গ্রহণ করবেন। আদেশ হয়ে গেছে।

রঘুনাথ যতীনের দিকে ভাল করে চেয়ে বলেন—পুনর্জন্ম হচ্ছে? খুব ভাল। ভগবানে মন যেন থাকে আশীর্বাদ করচি। পুনর্জন্মে ভয় কি, যদি কৃষ্ণপদে মতি থাকে।

যতীন পুষ্প ভিন্ন উপস্থিত সকলের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলে।

পুষ্প বলে—প্রভু, আবার আপনাদের দেখা ইনি পাবেন?

সন্ন্যাসী বলেন—নিশ্চয়, দেহ অন্তে। আমরা আর কোথায় যাচ্ছি।

রঘুনাথ বলেন—ইচ্ছা করে প্রভু, আর একবার পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে ভক্তিদর্শ প্রচার করে আসি। জীবের বড় কষ্ট। দেখে শুনে বড় কষ্ট পাই। জীবের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন বুঝলে একবার ছেড়ে শতবার যেতে প্রস্তুত আছি। সেদিন মহাপ্রভুকে বলেছিলাম, উনি বলেন—এখন পৃথিবীতে অল্প সময় এসেছে, লোকজনের অল্পপ্রকার মতি। এখন আমাদের পূর্বতন পন্থায় কাজ হবে না। গ্রহদেব বৈশ্রবণ এ বিষয়ে সেদিন মহাপ্রভু ও আরও উর্দ্ধলোকের কয়েকটি মহাপুরুষের সঙ্গে পরামর্শ করেচেন। তারা বলেন, পৃথিবী এখনও তৈরী হয়নি। গ্রহদেব বৈশ্রবণ কয়েকজন শক্তিমান আত্মা পাঠাচ্ছেন পৃথিবীতে, এঁরা ধ্বংসও দুর্দৈব আনবেন পৃথিবীতে গিয়ে। পৃথিবী আলোড়িত হবে—লোকের দৃষ্টি উর্দ্ধমুখী হবে। ভোগবাদ ও জড়বাদের অবসান না হোলে জীবের মঙ্গল নেই। টেলে সাজতে হবে গোটা পৃথিবীটাকে। আপনিই তো ইচ্ছা করলে করতে পারেন।

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন।

যতীন অসতর্ক মুহুর্তে সবিস্ময়ে বলে উঠল—কে? ইনি!

ক্ষেমদাস বলেন—হাঁ, ইনি। অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ, ওঁরা গ্রহদেবের সমান। ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটাতে পারেন। ব্রহ্মহুত্রে বলেচে—সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ। মুক্তপুরুষের সমস্ত ঐশ্বর্য সংকল্পমাত্র উদয় হয়।

সন্ন্যাসী হেসে বলেন—স্বর্গের মাথায় একটু বেশি বলে কবি। ভোগমাত্রমেধাম্ অনাদি-সিদ্ধেন্দ্রেশ্বরেণ সমানম্—শঙ্করাচার্য্য কি বলেচেন প্রণিধান কর। মুক্তের ভোগ ঈশ্বরের সমান হয়, শক্তি কি তাঁর সমান হয়?

—আমি ঈশ্বরের কথা বলিনি, গ্রহদেবের কথা বলেচি।

—গ্রহদেব শক্তিমান বটে কিন্তু ঈশ্বরের বিনা অহুজ্জায় তিনি কিছুই করতে পারেন না।

—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করতে সমর্থ কি না?

—হাঁ। কিন্তু ঈশ্বরের অহুমতিক্রমে।

—আপনি?

—না। আমার ওপর সে ভার হস্ত নেই। আমি আদার বাপারী, সৃষ্টি স্থিতির খোঁজে আমার দরকার কি? সৃষ্টি বলচোই বা কাকে? নিপুণ ব্রহ্ম যখন দেশ ও কালের সীমার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেন, তখন তাকে বলে সৃষ্টি—উর্নাত ধমন নিজের দেহনিঃসৃত রস তন্তুরূপে প্রসারিত করে।

রঘুনাথদাস বলেন—মহাপুরুষ, ক্ষেমদাস ঠিকই বলেছেন। আপনি পারেন সব, অসাধারণ শক্তি আপনাদের। সেই শক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কোনো কাজে আসে না। ভগবানের দাসভাবে ভক্তভাবে তাঁকে সেবা করে সেই শক্তির সদ্যবহার করুন। কিংবা পৃথিবীর বা অস্ত্র গ্রহলোকের জীবকুলের সেবা করুন। জীবের সেবায় স্বয়ং ভগবান তাঁর পার্শ্বচরদের নিয়ে সর্বদা নিযুক্ত। আপনি মহাজ্ঞানী, আপনাকে আমি কি উপদেশ দেব?

স্মাসী বিনীতভাবে নমস্কার করে বলেন—আপনার আদেশ শিরোধার্য।

যতীন অবাক হয়ে ভাবলে, এত বড় বড় লোক, কিন্তু কি অদ্ভুত বিনয় এদের। সত্যি, বড় ভাল লাগছে।

ক্ষেমদাস হঠাৎ বলে উঠলেন—বৃন্দাবনে আরতি হচ্ছে গোপাল-মন্দিরে। আমি আর থাকতে পারবো না। চল।

আজও পৃথিবীর সুন্দর জ্যোৎস্না। বৃন্দাবনের বনপথে আলোছায়ার খেলা দেখে ওরা সবাই মুগ্ধ। শহরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলচে, মোটর যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে, লোক গিজ্গিজ্জ করচে। চান্দাচুর ওয়ালা সুর করে মোড়ে দাঁড়িয়ে সওদা কিরি করচে। গোপালের মন্দিরের আরতির সময়ে কত মশরীরা ভক্ত, কত জ্যোতির্ষ্ময় আত্মা সেদিনকার মত মন্দিরের মধ্যে উপস্থিত। অনেকে স্বর্গীয় পুষ্প বিগ্রহের অঙ্গে বর্ষণ করতে লাগলেন আরতির সময়ে।

পুষ্প চেয়ে দেখতে দেখতে তাঁদের মধ্যে করুণাদেবীকে দেখে চমকে উঠলো। আরও একটি দেবী আছেন ওঁর সঙ্গে। দুজনে মন্দিরের এক কোণে সাধারণ গৃহস্থঘরের নারীদের মত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আরতি দর্শন করছেন। পুষ্পকে তাঁরা ডাকতেই সে কাছে গেল। পুষ্প দেখলে, অপরা দেবীটি তারই পূর্বপরিচিতা প্রণয়দেবী।

প্রণয়দেবী বলেন—অনেকদিন ভোমায় দেখিনি। আরতি শেষ হয়ে যাক্, বাইরে চলো, কথা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পের মনে পড়লো কেবলরাম কুণ্ডুর কথা। প্রণয়দেবীর ‘অনেকদিন দেখিনি’ এই কথাতে ওর মনে পড়লো। সেই নিম্নস্তরের বিষয়াসক্ত আত্মাকে সে দাছ বলে ডেকেচে। অথচ অনেকদিন তার কাছে যাওয়া হয়নি বটে। তাকে আজ এখনি বৃন্দাবনে এনে গোপাল-মন্দিরে আরতি দেখাতে হবে। ধন্ত হয়ে যাবে কেবলরাম—স্বর্গ-মর্ত্যের মিলনদৃশ্য এভাবে দেখার সৌভাগ্য আর তার হবে না।

আচ্ছা, আশা-বৌদিকে আনলে হয় না? ধন্ত হয়ে যার, উদ্ধার হয়ে যার একদিনে সে। করুণাদেবীকে সে কথাটা জিজ্ঞেস করলে। দেবী বলেন—আশার আধ্যাত্মিক বুদ্ধি এখনও সূপ্ত। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সে, দেখেও দেখবে না এ সব। অত সহজে পাপী উদ্ধার

হয় না পুষ্প, ত'হোলে আমরা বসে থাকতাম না—নরক উজাড় করে পাপী হাজারে হাজারে নিয়ে এসে ফেলতাম।

পুষ্প লজ্জিত হোল।

শ্রুণুদেবী বল্লেন—তোমাদের তিনজনের ওপর আমার দৃষ্টি বহু জন্ম আগে থেকে রেখেছি। এখনও অনেক গতাগতি বাকি ওদের দুজনের। পুঞ্জন্ম ভিন্ন আশার আত্মা কিছুতেই কর্কশ করতে পারবে না। তুমি ব্যস্ত হয়ে না পুষ্প, যা করবার তিনিই করবেন। আমরা তার দাসী যাত্র।

পুষ্প ওদের অহুমতি নিয়ে চক্ষের নিমেষে কেবলরামের স্তরে এসে দেখলে বৃদ্ধ সেখানে নেই। তবে বোধহয় অব্যবহার্য কুড়ুলে-বিনোদপুরে ওর ছেলের আড়তে গিয়ে বসেচে। কিন্তু একা যেতে পুষ্পের বড় ভয় করে। পৃথিবীর স্থলস্তরে নিম্নশ্রেণীর দুই আত্মাদের উপদ্রব বড় বেশি, এরা অনেক সময় দেহধারী ও বিদেহী সকলকেই বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে। বৃন্দাবনে ছিল একজন, পৃথিবীর হোলেও সে একটা পবিত্র দেবস্থান, ওখানে প্রেতঘোনির উপদ্রব খুব কম।

ভগবানের নাম স্মরণ করে সে কুড়ুলে-বিনোদপুরে কুড়ুর গদিতে এসে দেখে বৃদ্ধ কেবলরাম তার বড় ছেলে বিনোদের পাশে হাতবাক্স সামনে বসে আছে। সন্ধ্যার সময়, হাটুরে খরিদদারের ভিড় দোকানে। বিনোদের দুই কর্কশারী হাঁকে বলচে—জোড়া ফুলন শাড়ী, ছ' নং—

বিনোদ খাতায় টুকতে টুকতে মাথা তুলে বলচে—টাকা না লোহু?

খরিদদার বলচে—আজ্ঞে লোট্ কুতু মশার। দু'মণ পাট ব্যাচলাম রাম তেলির আড়তে—সব লোট্ দেলে। লোট্ এখন ক'নে ভাঙতি যাই আপনাদের দোকান ছাড়া? বাবু, কিছু কম নেন্ দামটা।

বিনোদের কিছু বলবার পূর্বেই তার পার্শ্বপাশে কেবলরাম বলে উঠলো—ওতে লাভ নেই এক পরশাও! তুমি পুরোনো খন্দের বলে শুধু কেনা-দামে দেওয়া।

পুষ্প বুঝতে পারলে, এ অতি কপটকথা। বৃদ্ধের মন বলচে জোড়াপিছু দেড় টাকা লাভ হয়েছে এই পাড়ারগের মুখ খন্দেরের কাছে। এই সময় বিনোদ বল্লেন—যাও, দু'আনা কম দাওগে জোড়ায়, তুমি পুরোনো খন্দের, তোমার সঙ্গে অস্তরকম।

কেবলরাম পুরের ওপর চটে উঠে বল্লেন—তবেই তুমি ব্যবসা করেচ! খন্দেরের এককথার অমনি জোড়ার দু' আনা ছাড়া!

অবিশ্রু ওর কথা দোকানদার বা খরিদদার কেউ শুনতে পেল না। পুষ্প ওর পাশে গিয়ে ডাকলে—ও দাছ! পুষ্পের কর্কশর শব্দে বৃদ্ধ চমকে উঠে ওর দিকে চাইলে। পুষ্প হাসিমুখে বল্লেন—আচ্ছা, কেন এই সন্কেবেলা বসে বসে মিথ্যে কথাগুলো বেমালুম কইচ দাছ? হিঃ—

কেবলরাম অপরাধীর ক্রায় উঠে দাঁড়ালো। পুষ্প বল্লেন—আবার তুমি এই দোকানে এসে

বসে আছে ? পৃথিবীর অসংখ্য তোমার গেল না ? কি হবে তোমার দোকানপসার আর খদ্দের ? টাকার লাভলোকসানেই বা তোমার কি হবে ?

কেবলরাম বিষণ্ণভাবে বল্লে—যাই কোথায় দিদি বলো ? এই গদি আর আড়ত ছাড়া গত পঞ্চাশ বছর আর কিছু চিনি'নি। কোথাও ভাল লাগে না। এখানটাতে এলে পুরোনো অভ্যাসের বশে আড়তের কাজ করে যাই। নইলে কি করি বলো ? তুমিই তো দিদি দর্শন দাও'ন কতদিন !

—আচ্ছা এখন চলো আমার সঙ্গে—দে'রি ক'রো না, বেরিয়ে এসো।

মহুর্জের মধ্যে কেবলরামকে নিয়ে পুষ্প গোপাল-মন্দিরে এল। ধূপধূনার সুগন্ধি ধূমে মন্দিরের গর্ভগৃহ ভরে গিয়েচে, আরতি তখনও পূর্ববৎ চলচে—পাঁচমিনিটের জন্ত মাত্র পুষ্প অনুপস্থিত ছিল। কেবলরাম পুষ্পের কুশার সজ্জান অবস্থায় আছে, জ্যোতির্ময় মহাপুষ্পদেরও সে দেখে ভয়ে সম্মুখে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচে। সম্মাসীর তেজঃপুঞ্জ দেহকান্তির দিকে আড়ে আড়ে চেয়ে দেখলে। আরতির শেষে যখন সবাই মন্দির-দ্বারপথে বেরিয়ে আসচে, তখন একজন বিদেহী ভক্ত ক্ষেমদাসকে জিজ্ঞেস করলে—প্রভু, শুনেচি বৃন্দাবনে যমুনাতীরে জ্যোৎস্নারাত্রি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা হয়—আমি কি দেখতে পাবো ? আমি এখানে নতুন এসেছি।

ক্ষেমদাস বল্লেন—আপনি গিয়ে দেখতে পারেন। লোকে দেখে অনেক, ভাগ্যবান ভক্ত হওয়া চাই।

কেবলরাম অবাক হয়ে পুষ্পকে বল্লে—এটা কোন্ জায়গা দিদি ?

ক্ষেমদাস বল্লেন—তুমি চিনতে পারলে না ? এটা বৃন্দাবন, গোপাল-মন্দির।

পুষ্প বল্লে—আর ইনি বৈষ্ণব কবি ক্ষেমদাস—

কেবলরাম খতমত খেয়ে ক্ষেমদাসের পায়ে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলে। তারপর করুণা-দেবীর সামনে ওকে এনে কেলতেই ও আরও আড়ষ্ট ও কঁচুমাচু হয়ে গেল। করুণাদেবী রহস্য করে বল্লেন—তোমার নান্দীর দৌলতে স্বর্গ পাবে তুমি।

কেবলরামের চোখ ধাঁধিয়ে গেল এই দুই দেবীর অপরূপ রূপের জ্যোতিতে। সে হাতজোড় করে বল্লে—স্বর্গ তো এখানে। আমার মত পাপী যে বৃন্দাবনে এসে আরতি দেখেচে, আপনাদের মত দেবী, এঁদের মত মহাপুরুষের দেখা পেয়েচে—আর তো কিছু বাকি নেই স্বর্গের।

পুষ্প ধমক দিয়ে বল্লে—এখন ছেড়ে দিলে আবার কুড়ুলে-বিনোদপুরের দোকানে গিয়ে বসবে তো ? আর মিথ্যে কথা বলবে।

কেবলরাম জিত কেটে বল্লে—আর না।

—ঠিক ?

—হঠাৎ ছাড়তে পারবো না—মিথ্যে কথা বলে কি হবে। কোথায় যাই বলো তো সন্দেহবাটা !

—কেন, এই গোপাল-মন্দিরে এসে আরতি দেখবে রোজ। কবি ক্ষেমদাস রোজ এখানে এসময় থাকেন, তোমায় যত্ন করবেন দাদু।

—কেউ কিছু বলবে না?

—না, দেবমন্দিরে সবাই অধিকার। যখনই তোমার দেবদর্শনে স্পৃহা জেগেচে, বুঝতে হবে তখনই তুমি উচ্চতর স্তরের জীব হয়ে যাবে! ইচ্ছামাত্রেরই সিদ্ধি। চলো যমুনার ধারে দাঁড়িয়ে দেখো—

ওরা চীরঘাটের কাছে যমুনার তীরে এসে জ্যোৎস্নালোকে কিছুক্ষণ বসলো। ওদের সঙ্গে সঙ্গ করুণাদেবী ও প্রণয়দেবীও এলেন। কেবলরাম সরল লোক, ওর মনে কেমন একধরনের ভক্তির উদয় হোল। যমুনার দিকে চেয়ে ওর জ্বলন্ত বেয়ে জল পড়তে লাগলো। করুণাদেবীকে বলল—মা, আমার কি পুণ্য ছিল পূর্বজন্মের? বৃন্দাবন, যমুনার তীর, আপনাদের মত দেবীর দেখা পাওয়া—আজ আমার হোল কি তাই ভাবচি।

করুণাদেবী বললেন—কেবলরামকে রেখে এসে পুষ্প, তারপর আমাদের পৌছে দেবে—

পুষ্প হেসে বক্রদৃষ্টিতে অদ্ভুতভাবে চেয়ে বলল—আমি পৌছে দেবো আপনাদের! কেন ঠাট্টা করেন বলুন।

ফেরবার পথে কেবলরাম বলল—তোমায় কি যে বলি দিদি। তুমি সাক্ষাৎ দেবী, নইলে এত দয়া! যেখানে নিয়ে গিয়েছিলে, আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য নেই সেখানে যাই। একটা কথা দিদি বলচি। আমার নাতি রামলাল আজ ছবছর হোল এখানে এসেচে পৃথিবী থেকে। তোমায় বলতে লজ্জা হয়, সম্ভ্রান্তি রম্বলপুরের এক বাগদী মাগীর পিছু পিছু ঘুরচে ছ'মাস। সে যদি জল আনতে যায়, ও তার পিছু পিছু যায়; সে যদি রান্নাঘরে রাঁধে, ও পাশে বসে থাকে। অল্প সময় সেই মাগীর বাড়ীর উঠানে এক তেঁতুলগাছে ছাখো দিনরাত বসে। কত ধমক দিলাম—কথা শোনে না। একটা উপায় করা তুমি লক্ষ্মীটি। সে মাগী ওকে দেবতেও পার না, ওর ঘুরেই সুখ। এ কি বন্ধন বলা দিকি, দিদি? ওই তো নরক। তুমি দেবী, ওকে তুমি বাঁচাও এ নরক থেকে।

গভীর রাত্রিকাল। পুষ্প একা সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে দেখা করতে গেল। ওঁকে দেখা পর্যন্ত কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করতে ওঁর প্রতি! না দেখা করে যেন ও থাকতে পারচে না। সন্ন্যাসিনী ওকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন—আপনি সেদিন এসেছিলেন না?

—হ্যাঁ, মা। আপনাদের দর্শনে পুণ্য, তাই দেখতে এলাম।

সন্ন্যাসিনীর প্রজ্ঞানৈত্র উদ্ভাসিত, স্মরণ্য পুষ্পকে স্থল আবরণে নিজ দেহকে আবৃত করতে হয়নি। সন্ন্যাসিনী বললেন—আপনি বিদেহী, পৃথিবীর কলমূল দিয়ে অতিথিসংকার করতে পারলাম না। ক্রটি মার্জনা করবেন।

পুষ্প লজ্জিত হয়ে বলল—ওকথা বলে আমার অপরাধী করবেন না মা। আমি কত ক্ষুত্র।

সন্ন্যাসিনী হেসে বলেন—আপনি ক্ষুদ্র কে বলে—আপনি এখানে আসবেন আমি সমাধিতে জেনেচি। আপনি আমার প্রেমভক্তি শিক্ষার উপায় করবেন।

পুষ্প সবিস্ময়ে বলে—আমি!

—বিশ্বের ভগবান কাকে দিয়ে কি কাজ করান, তা তো বলা যায় না।

—মা, আপনার বাড়ী কোথায় ছিল? পিতামাতা কে ছিলেন? জানবার বড় কৌতূহল হচ্ছে।

—আমার দেশ ছিল পাঞ্জাবে। অল্পবয়সে আমি দীক্ষা নিই, বিবাহ হয়নি, চিরকুমারী। নানান স্থানে ঘুরে আযোধ্যায় আসি। সেখানে সে সময়ে মাঠের মধ্যে গাছের তলায় এক সিদ্ধ মহাপুরুষ বাস করতেন—সকলে তাঁকে পাগলা বাবা বলতো। পাগলের মত থাকতেন। তিনি আমার দয়া করে যোগদীক্ষা দেন। যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেদিন আপনারা এসেছিলেন, ঠুরও গুরু তিনি।

—তিনি আছেন কোথায় এখন?

—প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর হোল তিনি দেহ রেখেছেন। তিনি যে কত কালের লোক কেউ জানতো না। আমি কখনো সে প্রশ্ন করিনি। এখন বিদেহী অবস্থায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। জীবমুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। মাঝে মাঝে এখনও দেখা দেন। তিনিই বলেছিলেন, তুমি নারী, তোমাকে প্রেমভক্তি শিখতে হবে। অদ্বৈতভূমি থেকে নেমে তোমাকে লীলারস আশ্বাদ করতে হবে। তাই অপেক্ষায় আছি। আপনি যে আসবেন তাও তিনি বলেছিলেন।

পুষ্পের চোখ বেয়ে দর দর ধারে জল পড়লো। মনে মনে ভাবলে—ভগবানের কি খেলা! আমার মত নিতান্ত দীনহীনা, অতি সামান্ত মেয়েমানুষের ওপর তাঁর কি অসীম অমুগ্ধ। এ কি অভূত কাণ্ড, কখনো তো এমন ভাবিনি।

ও বলে—আপনার কাছে সেই ঠাকুরেরা আর এসেছিলেন?

—হ্যাঁ দেখুন, ওই এক কাণ্ড। কেন আমার কাছে? মুন্সামী বলে এক দেব সেদিন এসেছিলেন, কোন্ গ্রামে ভাড়া মন্দিরে থাকেন—কতক্ষণ গল্প করে গেলেন। তাঁর সাধ নতুন মন্দিরে কেউ প্রতিষ্ঠিত করে। আমি বললাম, কোনো খনী গৃহস্থকে স্বপ্ন দিন। আমার কি হাত? আমি কি করতে পারি?

—ওদের কি আপনি এমন স্থলচক্ষে দেখেন?

—না, সমাধি অবস্থায় দেখা দেন। আমি বলি, আমি তোমাদের মানি না, চলে যাও। ততই আমার কাছে ভিড়। দেখুন তো মুশকিল!

—এও ভগবানের কৌশল আপনাকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দেওয়ার। নীরস অদ্বৈতজ্ঞানী মনকে সরস করবার আয়োজন।

—আমি ওসব মানি না।

—তবে প্রেমভক্তি কি করে লাভ হবে?

—সাকার উপাসনা মাসিক। যে মন্মথী দেবীর পূজা করবে, সে দেবীকে নিয়েই মশগুল থাকবে; যে শ্যামসুন্দরের পূজা করবে, সে তাঁর দর্শন পেয়েই খুশি থাকবে। ও সব এক প্রকারের বন্ধন। ওতে বদ্ধ হয়ে থাকলে আরও উচ্চভূমিতে উঠে ব্রহ্মদর্শন তাঁর হবে না, নিজের আত্মাকে ব্রহ্মে সে লীন করতেও পারবে না। মায়া তাকে আবদ্ধ করবে।

—অপনি যা জানেন, আমি তা জানিনে দেবী। তবে আমি এষ্টটুকু জানি প্রকৃত ভক্ত যে, সে মুক্তি চায় না, ব্রহ্ম চায় না। ভগবানের দাস হয়ে থাকতে চায়, রস আশ্বাদ করতে চায়। ভক্তির পথেই সে সমাধিলাভ করে, ব্রহ্মদর্শনও তাঁর হয়। তবে এসব আমার শোনা কথা—আমি অজ্ঞান, কি জানি বলুন। আমার সঙ্গে বৃন্দাবনে চলুন, গোবিন্দ-মন্দিরে আরতির সময় কত ভক্তের দর্শন পাবেন। তাঁরা সব বলে দেবেন।

—যাবো, আমার নিয়ে যাবেন। একটি গৃহস্থের বৌ আছে, বড় উচ্চ অবস্থা। একপাল ছেলেমেয়ে—ছেলেকে কোলে নিয়ে হয়তো আদর করচে—অমনি সমাধিস্থ হয়ে পড়ে। সেদিন আমার কাছে স্থলদেহে এসেছিল। সেও প্রেমভক্তি চায়—তাকেও নিয়ে যাবো।

—কি করে বিনা দীক্ষায় এমন উচ্চ অবস্থা পেলে সংসারে থেকে?

—পূর্বজন্মের অবস্থা ভাল ছিল। কর্মবন্ধনে অটকে পড়ে এ জন্মে সংসার করতে হয়েছে। সামান্য কর্ম ছিল, এ জন্মে শেষ হয়ে যাবে। তার বাড়ী এই জঙ্গলের বাইরে এক লোকালয়ে। অহোরাত্নের মেয়ে। ওর অবস্থা দেখে আমি পর্যাস্ত অবাক হয়ে গেছি। আমার কাছে এসে কত কাঁদে।

পুষ্প বিদায় নিয়ে চলে এল। মাহুঘেই দেবতা হয়ে গিয়েচে এ যে সে কত প্রত্যক্ষ করলে এই জগতে এসে! যে মূল বাসনা আসক্তি ত্যাগ করে শুদ্ধ মুক্ত হয়েছে—সেই দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, ভগবান তাকেই কৃপা করেচেন। দৃষ্টি উদার ও স্বচ্ছ না হোলে কেউই উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, অথচ মাহুঘকে দেবত্ব নিয়ে যাবার জন্তে উর্জালোকে কত ব্যবস্থা, কত অগ্রহ। তবুও কেন অন্ধত্ব ঘোচে না মাহুঘের, কেন রামলালের মত আশা-বৌদ্ধির মত জীবেরা ভুবলোকের অতি স্থূল আসক্তির বন্ধনে দেবত্বের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত আছে?

বুড়োশিবতলার ঘাটে যতীন একা চুপ করে বসে ছিল। পুষ্পকে দেখে খুব খুশি হোল। বলে—যত দেখছি, আমিও অবাক হয়ে যাচ্ছি, পুষ্প। আমার চোখ খুলে যাচ্ছে। তুই কিছু ভাবিসনে, পৃথিবীতে জন্ম নেবো কত বছরের জন্তে? ষাট সত্তর কি অশি? অনন্ত জীবনের তুলনায় কদিন? কিসের জন্ত কিসের মৃত্যু? সব ছায়া, মায়া—একমাত্র আমি অমর, অনন্ত, শাস্ত। আমাকে কেউ কোনদিন ধ্বংস করতে পারবে না। আজকাল তাঁর সংসর্গে থেকে আমার চোখ খুলে গিয়েচে।

পুষ্প ওকে রামলালের কথা বলে। যতীন সব শুনে হাসতে লাগলো। আজকাল এই শ্রেণীর লোকের জন্তে তার গভীর অল্পকম্পা জাগে। পথ দেখিয়ে দেবার কেউ নেই

তাই এমনি হয়েচে—ওদের দোষ নেই।

পুষ্প বল্লে—তুমি ওর ভৃত্তে কিছু করো। আমি সেখানে যাবো না, গেলেও তার উপকার হবে না। এক মোহ থেকে আর এক মোহে পড়ে যাবে—

—তোর সাহায্য ছাড়া হবে না পুষ্প, আমি অবিশ্বাসি গিয়ে দেখছি।

যতীন রামলালকে খুঁজে বার করলে। সে একটি নীচজাতীয় মেয়ের বাড়ীর উঠানে বসে ছিল। মেয়েটি টেকিতে পাড় দিয়ে দান ভানচে। তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশের কম নয়, কালো ও অত্যন্ত কৃশকায়। সম্ভবত মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়াতে ভোগে। মুখখানা নিতান্ত মন্দ নয়। চোখ দুটো বড় বড়—সমস্ত দেহের মধ্যে চোখ দুটোই ভালো।

রামলাল যতীনকে দেখে বল্লে—যতীনদা যে! তোমাকে কে সন্ধান দিল হে? বুড়োটা নিশ্চয়ই। বেঁচে থাকতে জালিয়েচে আবার মরেও যে একটু ফুঁটি করবো তার যো নেই। হাড় ভাজা ভাজা করলে। শেদিন এসেছিল, আমি হাকিয়ে দিয়েছি। বল্লাম—আমি যা ইচ্ছে করবো, তোমার বিষয়ের ভাগ তো পিতৃশ্রম করিনে যে তোমায় ভয় করবো। এখন আমি স্বাধীন।

যতীন হেসে বল্লে—বুড়োর দোষ নেই। সে তোমার ভালোর জন্তেই সন্ধান নিয়েচে। এই ভাবে বাঁশগাছে তেঁতুলগাছে কতদিন কাটাবে?

—দিব্যা আছি। দোহাই তোমার, তুমি আর লেকচার খেঁড়ো না।

—কিন্তু এতে তোমার লাভটা কি? কেন এর পেছনে পেছনে ঘুরচো—

—আমার দেখেই সুখ। ওর নাম সোনা মণি। সোনা মণি দান ভানে, আমি ঐ খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি; আমতলায় পুকুরঘাটে নাইতে যায় একা একা—আমি সঙ্গে যাই, যতক্ষণ না নাওয়া হয়, আমি নোনাকাছে বসে বসে দেখি। রাত্রে ও রাঁধে—আমি রান্নাঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকি। বেশ চমৎকার দেখতে সোনা, অমন চেহারা ভদ্রর লোকের ঘরে হয় না। শরীরের বাধুনি কি!...আমি তো কোনো অনিষ্ট করচিনে কারো, বসে থাকি—এই মাত্র।

—নিজের অনিষ্ট নিজেই করচো। ওপরে উঠতে পারবে না। পৃথিবীর বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে।

—থাকি থাকবো। বেশ ফুঁটিতেই আছি—আমি ওপরে উঠতে চাইনে, নীচেও নামতে চাইনে। স্বগ্গে টগ্গে তোমরা থাকো গিয়ে। আর ওই বুড়োটা যে দোকানের গদিতে বসে আছে দিনরাত, তাতে বৃষ্টি দোষ হয় না? ওটাকে পারো তো তোমাদের স্বগ্গে নিয়ে যাও টেনে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাও এখানে, বেশ আছি। কেন আর জালাও দাদা, বেঁচে থেকে এমন আনন্দে থাকিনি। বেঁচে থাকতে এমন করলে আমার ওর স্বামী লাঠি নিয়ে তাড়া করতো—এ বেশ আছি, কেউ টের পায় না।

—চলো আমার সঙ্গে একজায়গায়, তোমায় নিয়ে যাবো—

—আমায় মাপ করো ভাই। সোনা মণিকে কেলে আমি পাদমেকং ন গচ্ছতি—

—খাক্ আর দেবভাষাকে ধ্বংস করে লাভ নেই! এখন আমার সঙ্গে চলো—যাবে?

রামলাল যতীনের ইঙ্গিতে সোনা বাগ্‌দিনীর বাড়ীর উঠোন থেকে অল্পদূরে একটা বাঁশঝাড়ের তলায় গিয়ে দাঁড়ালো। কতদিন পরে কীতের দিনে করা শুকনো বাঁশপাতার ধুলোভরা গন্ধ আজ যতীনের নাকে এসে লাগচে। যেন সে দেহেই বেঁচে আছে—পৃথিবী মায়ের বৃকের ঢুলাল। বনমূলোর গাছ কুঁচ কুঁচি সাদা ফুলে ভর্তি—দুচারটে বাঁশঝাড়ের পরেই দিগন্তব্যাপী ধানের ক্ষেত, সব ধান কাটা হয়ে গিয়েচে অন্নাগ্নের শেষে। শুকনো ধানের গোড়া এখনো ক্ষেতের সর্বত্র।

যতীন বোধ হয় একটু অস্বস্তিক্স হয়ে পড়েছিল, রামলাল অধীর ভাবে বললে—কি বলচো বলো যতীনদা।

যতীন বললে—ও কি? আবার ও পাড়ার পুকুরঘাটের দিকে চাইচো কেন? কে আছে ওখানে?

রামলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—নাঃ—বামুনের মেয়ে।

—আবার কি?

—ওই যে সাদা কোঠাবাড়ীটা—ওই বাড়ী থেকে যোজ বেরিয়ে পুকুরঘাটে যায়। বামুনবাড়ী।

—তাই হয়েছে কি?

—যোল সতেরো বছর বয়েস। দেখবে?—এসো, এসো—এতক্ষণ নামচে জলে। নামটি বেশ, সন্ধ্যারাগী। ফর্সা, একরাশ চুল, একটু পরে ভিজ্ঞে কাপড়ে নেয়ে বাড়ী ফিরবে। মুখখানি বড় চমৎকার। ছিপছিপে লিকলিকে সৰু বেতের মত হলে পড়ে পড়ে। মুক্তোর মত ঝকঝক করে দাঁতগুলো যখন হাসে। সৰ্ব্বদাই হাসচে।

—তাতে তোমার কি?

—আমার কিছু না। বামুনের মেয়ে। ওরা মুখুখো।

—মরে গিয়েচ তখন আবার বামুন শুদ্ধুরই বা কি? ওতে কি তোমার লাভ?

রামলাল জিভ্‌কেটে দুহাত তুলে নমস্কার করে বললে—বাপুঁরে! ও কথা বলতে নেই। বামুন জাত! আমরা হলাম তেলি তামুলী। আমি শুধু চোখে দেখেই খুশি। আমার ও সব উঁচু নজর নেই দাদা। সোনাঘণির হৈসেলে বসেই আমার সব। ওকে পেয়েই আমার বেশ চলে যাচ্ছে।

—পেলে আর কি করে তা তো বুঝলাম না।

—ওরই নাম পাওয়া। দেহ নেই, কি করবো বলো। সত্যি, একটা কথা দাদা। পৃথিবীতে জন্মাবার কৌশলটা বলে দিতে পারো? দেহ না ধরলে কোনো সুখ নেই। মেয়েদের ভালো করে পাইনি জীবনে। ওদের না পেয়ে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গিয়েচে আমার।

—কেন, তুমি তো বিয়ে করেছিলে?

রামলার বিরক্তির সঙ্গে মুখ খিঁচিয়ে বলে—আরে দূর, বিয়ে!—সে ওই বুড়োটার পাঞ্জায় পড়ে। নাতবৌএর মুখ না-দেখে নাকি মরবে না! আমার ঘাড়ে যা তা একটা চাপিয়ে দিয়ে বুড়ো তো পটল তুললো। আজকাল কেমন সব স্কুলে কলেজে পড়া মেয়ে দেখিচি কলকাতায়। তাদের শাড়ী পরবার কায়দাই আলাদা। কথাবার্তার ধরনই আলাদা।—না সত্যি যতীনদা, তুমি আমার যথার্থ উপকার করবে আমার জন্ম নেওয়ার কৌশলটুকু বলে দাও দাদা। মেয়েমানুষের সঙ্গে ছুদিন প্রাণভরে ভালবাসা করে মিলেমিশে আসি ছুনিয়াতে কিরে। আমার বৃকের ভেতরটা সর্বদা হু হু করে দাদা। ও জিনিসটা আমি জানিনি—সত্যিকার মেয়েমানুষ পাইনি। স্বগ্গে টগ্গে তোমরা যাও—আমি তো কারো কোনো অনিষ্ট করতে চাইচিনে ভাই। আমার নেযা অধিকার চাইচি। সবাই দিব্যি কত ফুঁটি করচে—আমি অল্পবয়সে মরে গেলুম, যে বয়সে ভোগ করার কথা সেই বয়সে। আমার একটা হিলে করো, তোমার পায়ে পড়ি দাদা। মেয়েমানুষ না পেলে স্বগ্গে গিয়ে আমার কোনো সুখ হবে না। বুড়োটার সঙ্গে দেখা হোলে তাকেও বোলো। তিনি এখন আসেন আমায় উপদেশ দিতে! তুমি জানো, বিয়ের আগে বন্ধু পালের মেয়ে সরলার সঙ্গে আমার একটু ভাব হয়েছিল। মেয়েটা কেঠনগরে মেয়ে-ইস্কুলে পড়তো। ছবার আমার সঙ্গে লুকিয়ে আলাপ করেছিল। টাকা পাবে না বলে ঐ বুড়ো সেখানে আমার বিয়ে দিতে চাইলে না। সেও দিব্যি মেয়ে ছিল।

—এখন সেকোথায়?

—কেঠনগরে বিয়ে হয়েছে। শশুরবাড়ী থাকে। আমি সেদিন গিয়ে একবার দেখে এসেছি। কষ্ট হয় বলে যাইনে। তার চেয়ে আমার সোনামণি ভালো। কি চমৎকার একটা তিল ওর নাকের বাঁদিকে—দেখনি?—চলে? তাহলে—শোনো শোনো—তোমাদের তো অন্তর্দীন হোতে সময় লাগে না একমিনিটও। এই আছে এই নেই। তোমরা হোলে স্বগ্গের মানুষ। তাহলে—আমার একটা উপায়—

যতীন ততক্ষণে বুড়োশিবতলার ঘাটে এসে পৌছেছে। পুষ্পের প্রশ্নের উত্তরে বলে—হোল না। একেবারে বুড়ু আত্মা। ওকে পুনর্জন্মে পাঠাবার ব্যবস্থা করো পুষ্প। মেয়েমানুষের কথা বলতে অজ্ঞান। ভোগ না করলে ওর নারীতে আসক্তি যাবে না।

পুষ্প হেসে বিজয়িনীর মত দপিত সুরে গ্রীবা ঝাঁকিয়ে বলে—স্বর্গে মেয়েমানুষের অভাব? যদি বলা আজই তাকে দেখিয়ে দিয়ে আসি কাকে মেয়েমানুষ বলে! করুণাদেবীকেও নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিই—মুর্ছা হয়ে পড়ে যাবে তক্ষুনি।

যতীন মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর বিজয়িতার মত অপূর্ব কান্তির দিকে চেয়ে বলে—তুমিই যথেষ্ট। আর তাঁকে নিয়ে যেতে হবে কেন। মুর্ছা তো দূরের কথা, একদম পাগল হয়ে ক্ষেপে যাবে। কিন্তু তার দরকার নেই। বিভ্রান্তই করে দেওয়া হবে, উপকার কিছু হবে না তাতে।

পুষ্প কৃত্রিম রাগের সুরের রেশ তখনও টেনেই বলে—না, আমার রাগ হয়েছে শুনে যে,

যে মূৰ্খ বলে স্বর্গে নারী নেই! নারীকে খুঁজতে যেতে হবে পৃথিবীতে!

—তোমরা চোপ ধাঁড়িয়ে বেচারীকে পাগল করেই দিতে পারো, কিন্তু সে যা চায় তা দেবে কোথা থেকে? ওকে পাঠিয়ে দাও পৃথিবীতে। একজোড়া আশ্রহভরা কালো ভ্রমরচোখের চাউনি ওর দরকার হয়েছে।

—আচ্ছা, যতুদা, আমি যদি ওকে একেবারে আক্রমণ করবো তখন সন্ধ্যা হয়ে যেতে পারি?

—জন্ম নেওয়ার পরে?

পুষ্প হাসি-হাসি মুখে বলে—হ্যাঁ। নয়তো কি, এখানে?

—কিলিয়ে কাটাল পাকানোর দরকার কি? আত্মাকে তার স্বাভাবিক পথে তার স্বাভাবিক গতিতে যেতে দাও।

—এই কথাটিই আশা-বৌদির বেলা তুমি এতদিন বুঝতে চাইতে না যতুদা। অপরের বেলাতে বেশ তো বুঝলে।

যতীন চূপ করে রইল।

ওপরের হালিশ্বরের শ্রীমানন্দরীর মন্দিরে সন্ধ্যার আরাতিধ্বনি শোনা গেল। গন্ধার বৃক্ক সন্ধ্যা আকাশের প্রতিচ্ছবি।

সেদিন আশা একা পাথরের ওপরে বসে খুব কাঁদছিল।

একজন বিকটাকৃতি সাধুপুরুষের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল একদিন এই মরুভূমির ও পাহাড়ের দেশে। তিনি ওকে বলেচেন—পৃথিবীর মৃত্যুর পরে সাত লোক, প্রত্যেক লোকে আবার সাতটা স্তর। প্রত্যেক বার মানুষকে মরে নতুন দেহ ধরে নতুন স্তরে জন্ম নিতে হয়—ইত্যাদি। আশার মাথায় ওসব জটিলতা ঢোকে না—এক এক সময়ে সে বেশ বুঝতে পারে সে মরেই গিয়েচে বটে। কিন্তু মরেও তো নিস্তার নেই, ছবার তো মরা যায় না—না হয় আবার চেষ্টা করে দেখতো। কোথায় গেল মা, বাবা, স্বামী ছেলেমেয়ে—এ কি বিশ্রী জীবন, না আছে আশার আলো, না আছে আনন্দ, না আছে ভালবাসা, স্নেহ, দয়া। কেন মিছে বেঁচে থাকা? অথচ মরতেও তো পারে না। এ কি বন্ধন!

সেই যে একদিন স্বামীকে সে দেখলে, যেন তার পুরানো স্বপ্নরবাড়ীর ঘরে সে গেল—কথাবার্তা বলে স্বামীর সঙ্গে। কি অদ্ভুত আনন্দে দিনটা কেটেছিল—যত অল্প সময়ের জন্তেই দেখা হোক না কেন। নাঃ—কোথায় কি যে সব হয়ে গেল ওলটপালট। সংসার গেল ভেঙে। সে হোল অল্পবয়সে বিধবা। কত আশার স্বপ্ন দেখেছিল সে বিয়ের রাত্রে—সব মেয়েই দেখে। কেন তার ভাগ্যে এমন হোল! এই এক জায়গা—এমন ভয়ঙ্কর স্থান সে কখনো দেখেনি। মাঝে মাঝে ওর চারিদিকে অন্ধকার ঘিরে আসে, মাঝে মাঝে আলো হয়। গাছ নেই পালা নেই—পাথর আর বালি। চারিদিকে উঁচু উঁচু পাথরের চিহ্নমত। যতদূর যাও, কেবল এমন। মানুষ নেই, জন নেই।

মাঝে মাঝে কিন্তু অতি বিকট আকারের দু-একজন লোক দেখা যায়। অসহায়

স্বীলোককে একা পেয়ে তাঁদের মধ্যে দু'বার দুজন আক্রমণ করতে ছুটে এসেছিল। একবার কে এক দেবী (—কোথা থেকে এসেছিলেন, তাঁর নাম পুষ্প—বৌদিদি বলে ডেকেছিলেন তাঁর মত সামান্য মেয়েকে—) তাকে উদ্ধার করেন। আর একবার কেউ রক্ষা করতে আসেনি—একা ছুটে ছুটে সে এক পাহাড়ের গুহার ঢুকে গেল। আশ্চর্যের বিষয়, যে তার পিছু পিছু ছুটে আসছিল—সে তাকে আর খুঁজে পেল না।

গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থঘরের বৌ—একি উৎপাত তার স্বীকৃতি !

কি জানি, সেদিন স্বপ্নবাবড়ীতে কি ভাবে যে সে স্বামীকে দেখেছিল...সেই থেকে তার মন অন্তরকম হয়ে গিয়েছে। কেবলই সাধ হর আবার সেই স্বপ্নবাবড়ীর ভাড়া কোঠার ঘরে সে তার ছোট্ট সংসার পাতবে, বাশবাগানের দিকের রান্নাঘরটিতে বসে বসে কত কি রান্না করবে। ডাল, মোচার খন্ট, স্নজুনি (উনি স্নজুনি বড় ভালবাসেন), কই মাছের ঝোল মানকচু দিয়ে...

উনি এসে বলবেন—কি গো বৌ, রান্না কি হয়ে গেল ?

—এসো...হয়েছে। হাত পা ধুয়ে নাও—জল গরম করে রেখেচি। বড্ড শীত আজ।

মাটির প্রদীপ জ্বলে রান্নাঘরের মেজতে কাঠের গিলস্বজ্জ। তালপাতার চোটাই পেতে স্বামীকে আশা বসতে দিলে। মুখ দেখে মনে হোল উনি খুব ক্ষুধার্ত।—হ্যাঁগা, একটু চা করে দেবো ?

—তা দাও, বড্ডই শীত।

—কাপগুলো সব ভেঙে কেলেচে থোকা। কাঁসার গেলাসে খাও—ওবেলা ছোটো কাপ কিনে নিয়ে এসো না গা কুড়ুলের বাজার থেকে।...চা খেতে খেতে উনি কত রকম মজার গল্প করতেন। সে বসে বসে শুনে একমনে। সুন্দর দিনগুলি স্বপ্নের মত নেমেছিল তাঁর জীবনে। আনন্দ...অফুরন্ত আনন্দ...সে সতী, পবিত্র, সাধবী। স্বামী ছাড়া কাউকে জানে না।

হঠাৎ আশা চমকে উঠলো। সে কার মুখের দিয়ে চেয়ে আছে ? কে তার সামনে বসে চা খেতে খেতে গল্প করছে ? তাঁর স্বামী নয়—এ তো নেতানারান ! কুড়ুলে বিনোদপুরের বাড়ী নয়—এ কলকাতার মাণিকতলার সেই বাড়ীউলি মাসীর বাড়ী, সেই রান্নাঘর, তাদের ছোট্ট কুঠীরটার সামনে কালিমত রান্নাঘরটা। ওই তো রান্নাঘরে, তার হাতে তৈরি সেই দড়ির শিকে, হাঁড়িকুড়ি বুনিয়ে রাখবার জন্তে সে নিজের হাতে গুটা বুনছিল মনে আছে। ওই তো সেই তাদের ঘরখানা, জানালা দিয়ে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, মুগের ডালের হাড়ি, বিছানার কোণটা...উঃ ! বিছানাটা দেখে ওর গা কেমন ঘিন্ ঘিন্ করে উঠলো। এই যে খানিকটা মাত্র আগে সে নিজেকে সতী সাধবী, স্বামী-অফুরন্ত, পরম পবিত্রা, আনন্দময়ী রূপে বর্ণনা করে মধুর অত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল, কোথায় গেল ওর সে অত্মপ্রসাদের পবিত্রতা ও নির্ভরশীলতা ! সে এই বিছানার একসঙ্গে শোয়নি নেতাদার সঙ্গে ? এই পুরু ঠোঁটওয়ালা, চোখের কোণে কালি ইন্দ্ৰিয়সক্ত নেতাদা, যার মুখ দিয়ে এই মুহূর্তে এখন মনের গন্ধ বার

হচ্ছে...যার অত্যাচারে তাকে আফিং খেয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌কট্‌ করে মরতে হয়েছিল। ওই তো সেই তক্তাপোশ, য'র ওপরে সে ছট্‌কট্‌ করেছিল আফিং খেয়ে।

আশা চমকে শিউরে উঠতেই নেতানারায়ণ দাঁত বার করে বলে—বলি, আর একটু চা দেবে, না একেবারে গরম গরম ভাতই বাড়বে? বড় রাত হয়ে গেছে। পেয়ে-দেয়ে চলো শুয়ে পড়া যাক। যে শীত পড়েচে!

আশা কাঠ হয়ে বসে রইল। এ কোথা থেকে কোথায় সে এসে পড়ল। অদৃষ্টের কি নির্যম পরিহাস এ!

নেতানারায়ণ বলে—সত্যি, আমিও যে দিনকতক তোমায় খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছি কত! তারপর—

আশার মুখ দিয়ে আপনা-আপনিই বেরুলো—কি তারপর?

—তারপর কে যেন টেনে নিয়ে এল আমায় এখানে। উঃ সে কি আকর্ষণ! আমি বলি কোথায় যাচ্ছি—তারপরই দেখি আমি একেবারে বাড়ীউলি মাসীর বাড়ীতে মানিকতলায়। একেবারে তোমার কাছে। চল গিয়ে শুইগে যাই। রাত হোল অনেক।

বিরক্তি, ভয়, হতাশা ও অপবিত্রতার অল্পভূতিতে আশার সর্বশরীর যেন জলে উঠলো আগুনের মত। সে যে এইমাত্র তার স্বপ্নবাড়ীর সেই পবিত্র কোঠাবাড়ীতে তার স্থায়ী সঙ্গ ছিল—প্রথম বিবাহিত জীবনের সেই স্মৃতিমধুর রাত্রির ছায়ায়; কেন এই অপবিত্র, কলঙ্কিত শয্যাপ্রান্তে তার আবহান? এ কি নিষ্ঠুরতা।

ও বলে উঠলো—আমি যাবো না। তুমি তো আমার কৈলে বাড়ী পালিয়ে ছিলে? কেন আবার এলে তবে? আমায় ছেড়ে দাও। আমি যাবো না ঘরে।

নেতানারায়ণ কাঁঝালো সুরে বলে—যাবে না স্ততে? তবে কি সারারাত এখানে বসে থাকতে হবে নাকি?

—আমি আর মানিকতলার নেই—আমরা মরে গিয়েছি। তুমি আর আমি দুজনই। চলে যাও তুমি আমার কাছ থেকে—তুমিও মরে গিয়েচ।

নেতানারায়ণ অবাক হয়ে বলে—কি যে বলো তুমি। ঠাট্টা করচো নাকি? এই তাখো সেই মানিকতলার আমাদের ঘর। চিনতে পারচো না? যাবে কোথায় নিজেদের আস্তানা ছেড়ে? ক্ষেপলে নাকি? চলো—চলো—

আশা কলের পুতুলের মত ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানাটিতে শুয়ে পড়লো। ওর সর্বশরীর যন্ত্রণায় রি রি করচে, বমি হয়ে যাবে যেন এখন। সমস্ত দেহ মন যেন অপবিত্র হয়ে গিয়েচে ওর, সকালে উঠে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে না এলে এভাবে যেন যাবে না। যাবে সে গঙ্গা-শ্রানে—ভোরে উঠেই যাবে বাড়ীউলি মাসীকে নিয়ে।

নেতানারায়ণ ঘরে ঢুকে দোরের খিল বন্ধ করে দিলে।

আশা অসহায় আর্ন্ত সুরে বলে উঠলো—ওকি! খিল দিলে যে?

নেতা ওর দিকে চেয়ে কড়া, নীরস কণ্ঠে বলে উঠলো—কী স্বাকামী করচো সন্দে

থেকে! সরে শোও, ওপাশে বাও।

আশা বিছোঁহিবার ভঙ্গিতে বিছানাতে উঠে বসে বলে—খিল খুলে দাও বলচি। আমি থাকবো না এ ঘরে। আমি তোমার সঙ্গে থাকবো না এক ঘরে—বাড়ীউলি মাসীর সঙ্গে শোবো—

নেতানারাণ ভীষণ রেগে আশার চুলের মুঠি ধরে বিছানায় ঘুরিয়ে কৈলে দিয়ে বাঁধখাই হয়ে বলে—তোমার মেয়েমানুষের না কিছুচি করেছে—ভালো কথা বল কেউ নও তুমি। যত বলচি রাত হয়েছে শুয়ে পড়। তোমার হাড় ভেঙে চূর্ণ করবো বেশি নেকুগিরি যদি করবি। তুলে দিইচিন্ নেতানারাণকে—হাত ধরে একদিন বেরিয়ে এসেছিলি মনে নেই? সেদিন কে আশ্রয় দিত তোকে, আমি যদি না এখানে আনতাম। কোন্ বাবা ছিল তোর সেদিন?

—গবরদার, বাবা তুলো না বলচি—আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে।

—তবে রে বেইমান মাগি—তোকে মজা না দেখালে—

কথা শেষ না করেই নেতানারাণ আশাকে আখালি-পাখালি কিলচড় মারতে লাগলো। খাট থেকে মেজের ওপর ফেলে দিলে তলপেটে লাগি মেরে। ..

কেউ নেই কোনো দিকে। আশা মেজের ওপর গড়িয়ে পড়ে ডুকরে কঁদে উঠলো, আর্ন্ত অসহায় হয়ে—ওর বেদনার্ত পশুর দত চাপা বড় টাঁৎকারে মালিকতলার বাড়ীউলি মাসীর বাড়ীটা কৈপে কৈপে উঠছিল যেন। কেন এমন হোল? সে যে ভাল হোতে চেয়েছিল, সে যে সব তুলতে চেয়েছিল, সে যে খণ্ডরবাড়ীতে গিয়েছিল প্রথমখোবনের বিবাহিত দিনের স্মৃতিমধুর অবকাশে...সেই মাখবী রাত্রির শুভ আছবান কেন এ কলঙ্কিত বাড়ীর কলঙ্কিত শয্যাপ্রান্তে উপপতির নিষ্ঠুর আছবানে পরিণত হোল? হা ভগবান।

পহিদিন সকালে উঠে আশা ছুট্ দিলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে।

কেউ ওঠেনি বাড়ীতে। বাড়ীউলি মাসী ঘুমুজে, পালের ঘরে পাল মশাই এরা ঘুমুজে... এই ঠাকৈ খিল খুলে আশা পালাচ্ছে স্বপ্ত কলকাতা শহরের রাস্তা দিয়ে। সে কোথায় যাবে, কি বুজাত কিছুই জানে না। গভরাতির অপবিত্র স্থতিতে ওর গা ঘিন ঘিন করচে...না, আর এদর নয়। তাকে ভালো হতে হবে। সে চায় না এ পাপ সঙ্গ। উপপতির আসদলিগা তার মন থেকে মুছে ধুয়ে গিরেচে কবে, বমি হয় সে কথা ভাবলে, মরার পরেও যেন গা বমি বমি করে। যতদূর হয় চলে যাবে, গঙ্গানান করে শুদ্ধ হবে, এ পাপপুত্রীর ত্রিীমানায় আর সে আসবে না। ভগবান তাকে রক্ষা করুন। সে বেঁচে নেই, যেখানে খুশি সে যেতে পারে। কলকাতা শহর অনেকদূরে মিনিয়ে থেল।

পৃথিবীর পাপস্থতি আর তাকে কষ্ট দেবে না। অনেকদূর সে চলে এসেচে বাড়ীউলি মাসীর কাছ থেকে। এ তার শৈশবের নিষাপ দিনগুলিতে সে কিঁরে গিরেচে।

সে যেন তাদের গ্রামে ঘুঘুঘানের পুকুরপাড়ে নিতাই ভড়ের বাড়ী নিতাই ভড়ের মেয়ে সুবির সঙ্গে খেলা করতে গিরেচে। ঐ তাদের পাড়ার পুকুরপাড়ের সেই বড় তেঁতুলগাছটা। ঐ নিতাই ভড়ের বাড়ীর উঠানের খানের গোলা। নিষাপ, হুলর শৈশবকাল। এখানে

শুধু তার মাকে সে জানে, কোনো স্থিতি তার মনে নেই—হেমন্তের প্রথমে শিশিরাত্র গ্রাম্য মাঠে নব ধানগুচ্ছের আন্দোলনের মত তার জীবনের আনন্দে ঢঞ্চল, ঝরা শিউলিফুলের সুবাস-সুগন্ধিত জীবনের অতি মধুর প্রভাত...

—সুবি—ও সুবি—খেলবিনে অঞ্জ, বাইরে আয় ভাই—

সুবি বাইরে এসে বলে হাসিমুখে—আশাদি, কোথায় ছিলি রে? ক'দিন খেলতে আসিসনি—

আশা খুশি হোল। এ তার সত্যিকার শৈশব। সে বেঁচে গেল। এই তার সুন্দর, মধুর আশ্রয়। তার মা—এখুনি তার মা ডাকতে আসবে তাকে। খুশির সুরে পরম নির্ভরতার সঙ্গে আশা ডাকলে সুবিকে। সুবি ছুটে এল, ওর হাতে একটা পেন্সের ডাল।

—কি হবে রে পেন্সের ডাল?

—বাজাবো। এই ঝাঙ্—

সুবি পেন্সের ডালের ফুটোতে মুখ দিয়ে পৌঁ পৌঁ করে বাজাতে লাগলো।

আশা হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো খুশি হয়ে। কি মজা! কি মজা!

সুবি বললে—চল, মুখুঘোদের নন্দিনী দিদি খুশরবাড়ী থেকে এসেচে—দেখে আসি।

—না ভাই, মা বকবে।

—বাড়ীতে বলে আয় না? নন্দিনী দিদিকে দেখেই চলে আসবো—

—চল তবে। কিন্তু ভাই দেয়ি করা হবে না—

ওরা কত জায়গায় খেলা করে বেড়ালে। বনমূলো-ফুলের বড়া ভেজে খাওয়ার অভিনয় করলে।

শৈশবের অতিপরিচিত সব খেলার জায়গা। নন্দিনী দিদি কত বড়, ওদের মায়ের বয়স্কি ওদের দুজনের আর কি বয়সটা? নদীর ওপর মেঘ আসচে, কতদূর থেকে অকালবর্ষার মেঘ ভেসে আসচে আকাশ ভরে। হেমন্তে কাশ ফুলের শোভা।

সুবি বলে—বেলা বেশি হয়েছে—বাড়ী কিরি—

—হ্যাঁ চল ভাই—মা বকবে—

মা তাকে বকবে সে জানে। টক কাঁচা তেঁতুল খাওয়ার জন্তে বকবে, এতক্ষণ বাইরে থাকার জন্তে বকবে। তারপর রান্নাবরেন্ন দাওয়ায় বসে ওকে খাইয়ে দেবে। উত্তরের বড় ওর জন্তে মাহুর পেতে অন্নপূর্ণা দিদি ছেলেমেয়ে নিয়ে গুয়ে আছে। খেয়ে গিয়ে অন্নপূর্ণা দিদির পাশে ও গুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

সুবি বলে—আমাদের বাড়ী দুটি ভাত খাবি আশা?

—দূর, তোরা জেলে। জেলের বাড়ী বুঝি বামুনের মেয়ে খায়?

—হুকিয়ে?

সুবি হাসলে। ওর বড় বন্ধু সুবি। কষ্ট হয় সুবির মনে দুঃখ দিতে। তবু বলে—না ভাই সুবি, কিছু মনে করিস্ নি। আমার বাড়ীতে ভাত তো হয়েইচে—

—বড়ি ভাতে ভাত খাবিনি আমার সঙ্গে ? মা নতুন বড়ি দিচ্ছে—

—দুঃ, বড়ি বুঝি এখন দেয় ? বড়ি দেয় সেই মাঘ মাসে। নতুন কুমড়ো নতুন কলাইএর ডাল উঠলে। মিথ্যে কথা বলিস্নি সুব।

—মিথ্যে বলিনি। পুরোনো ডালের বুঝি বড়ি হয় না ? চল আমার সঙ্গে—

আশা বাড়ী করছে। বেগা অনেক হয়ে গিয়েছে। মুখুন্দের পুকুরখাতে আর কেউ নাইচে না, সবাই নেয়ে বাড়ী চলে গিয়েছে। তেঁতুলের ডালে মোটা মোটা কাঁচা তেঁতুল ঝুলচে দেখে ওর জিবে জল এল।

দুটো তেঁতুল পাড়লে হোত। কিন্তু কি করে পাড়ে ? সুবিকে বলে হোত, সে অনেক রকম বুদ্ধি ধরে, একটা কিছু উপায় করতে পারতো।

পুকুরপাড়েই সরু রাস্তা ধরে খানিকদূর গিয়ে ওদের বাড়ী। সারি সারি পেঁপে গাছ। একটা ধানের গোলা। তাদের মুচিপাড়ার ধানের ক্ষেত থেকে বছরের ধান এসে গোলা ভর্তি হয়। এখন সব চোখে পড়বে।

কিন্তু একটু যেন অস্বরকম।

পেঁপে গাছের সারি নেই। ধানের গোলা নেই। তাদের বাড়ীর চটা-ওঠা ভাঙা পাঁচিলটা নেই। এ কোথায় সে যাচ্ছে ? তাদের বাড়ীটা নয়। আতঙ্কে ওর বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় দিতে লাগলো। বাড়ীউলি মাসীর বাড়ীর সেই দোরটা। মাণিকতলার বাড়ীউলি মাসী। আশা চীৎকার করে পেছনে ফিরে পালাবার চেষ্টা করতাই নেতানারায়ণ দোর খুলে বের হয়ে এসে বলে—কোথায় ছিলে এতক্ষণ চাঁদ ? কাল দু'এক ঘা দিয়েছিলাম বলে রাগ হয়েছে বুঝি ?

তারপরই সে আশার মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে ইতরের ভঙ্গিতে গাইলে তুড়ি দিতে দিতে—

দুটো কথা কি তোমার প্রাণে সয় না ?

একঘরে ঘর করতে গেলে ঝগড়া কি, প্রাণ, হয় না ?

দুটো কথা কি—

এসো এসো শোবে এসো—বেলা হয়ে গিয়েছে।

ব্যাবস্থিকা হরিণীর মত আশা ছটকট করতে লাগলো নেতানারায়ণের হাতে।

তারপর সে ছুম ছুম করে নিষ্ঠুরভাবে মাথা কুটে লাগলো ঘরের চৌকাঠে। সে আজ মরে যাবে। এক কলঙ্কিত জীবন সে রাখতে চায় না। বাথা লাগচে, রক্তারক্তি হচ্ছে—কিন্তু সে মরতে পারবে না। সে অমর। অনন্তকাল ধরে সে মাথা কুটলেও মরবে না।

নেতানারায়ণ তাকে হাত ধরে ওঠাতে লাগলো। বলতে লাগলো—কি পাগলামি করো। ক্ষেপলে নাকি ? চলো শুই গিয়ে—

সন্ধ্যাবেলা উঠুনে আঁচ দিচ্ছে ঘরে ঘরে। নেতানারায়ণ বাড়ী নেই, কোথায় গিয়েছে। ও এসে বাড়ীউলি মাসীর দরজায় দাঁড়ালো। কোথায় সে পালাবে তাই ভাবচে। এ কি

ভয়ানক নাগপাশের বন্ধনে তাকে পড়তে হয়েছে। আর সে এ বাড়ীতে থাকতে পারবে না।
ঐ ঘরে কত রাজে কুলবধুর জীবন কলঙ্কিত হয়েছে। তারপর ঐ ঘরের ঐ তক্তপোশে বিষ
খেয়ে যন্ত্রণায় হটকট করতে করতে তার সে শোচনীয় মৃত্যু! আবার সে বেয়িয়ে পড়লো।

এই কলকাতা শহরের সর্বত্র তার স্মৃতির বিষ ছড়ানো। কালীঘাট? কালীঘাটে কি করে
যাবে, নেতাদা সেখানেও একবার তাকে নিয়ে গিয়ে সেখানে বিষ ছড়িয়ে এসেছে। আবার
সে ছুটে চলে যাবে কুড়ুলে-বিনোদপুরে স্বামীর ঘরে। সেখানে যেতে পারলে সে বাঁচে।

কিন্তু একদিন কেমন করে হঠাৎ গিয়ে পড়েছিল—সেইদিন গিয়ে উঁর সঙ্গে দেখাও
হয়েছিল। কিন্তু সেখানে যাবার পথ সে জানে না। চিনে আজ আর যেতে পারবে না।
ভুলে গিয়েছে সে পথটা।

তার এক সহইএর বাড়ী আছে স্রবর্ণপুর। সেখানকার রজনী ডাক্তারের মেয়ে। কুমারী-
জীবনের বন্ধু। রজনী ডাক্তারের বাড়ীর পাশে ছিল ওর বড়দিদির স্বশুরবাড়ী, যে বড়দিদি
বিধবা হয়ে ইদানীং ওদের সংসারে ছিলেন। জামাইবাবুর সঙ্গে একবার দিদির ওখানে
বেড়াতে গিয়ে স্রবর্ণপুরে রজনী ডাক্তারের মেয়ে বীণার সঙ্গে আলাপ হয়।

তাদের কাঁটালতলার দুর্গাপিঁড়ি পাতা দেখে আশা বলতো—ভাই সহী, কাঁটালতলার
দুর্গাপিঁড়ি কেন?

বীণা বলতো—দুর্গাপিঁড়ি ঘরে তুলতে নেই আমাদের। বাপঠাকুরদার আমল থেকে
কাঁটালতলাতেই থাকে—

সহইএর বিয়ে হয়েছিল কাঁচরাপাড়ার কাছে বাগ বলে গ্রামে। বাগের দত্তদের বাড়ী,
তার। ওখানকার নাম-করা জমিদার। সহী যদি তাকে আশ্রয় দেয়, সেই পবিত্র কুমারীজীবনে
সে লুকুতে পারে। কলকাতার বাড়ীউলি মাসীর বাড়ী থেকে সে চলে যাবে সোজা—স্রবর্ণপুর
গ্রামের সেই কাঁটালতলার, যেখানে সহীএদের দুর্গাপিঁড়ি পাতা থাকে সারা বছর।

উল্লনের আঁচের ধোঁয়ায় অন্ধকারে অস্পষ্ট সিঁড়ির পথ বেয়ে সে নেমে এল রাস্তায়। কি
জানি কেন, বাড়ীটা থেকে সামান্য একটু দূরে চলে এলেও ও নিজেকে পবিত্র মনে করে।
মনের সব গ্লানি কেটে যায়...সে নির্মল, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ আত্মা...এতটুকু পাপের বা মলিনতার
ছোঁয়াচ লাগেনি তার সারা দেহমনে।

হঠাৎ কেমন করে সে রজনী ডাক্তারের কোঠাবাড়ীটার উঠানে নিজেকে দেখতে পেলে।
সেই কাঁটালতলায়।

—ও সহী!

—ও মা—কত কাল পরে এলি তুই? ভাল আছিস্ সহী?

বীণার বিয়ে হয়নি, সিঁথিতে সিঁহুর নেই। বীণা এসে ওকে জড়িয়ে ধরলে কত
আদরে।

আশা আনন্দে ও উৎসাহে অবীর হয়ে উঠলো। বীণাকে বললে—সহী, তুই আমাকে ধরে
রাখু ভাই। কোথাও যেতে দিস্নি।

—না, থাক্ এখানে। কোথাও যেতে দেবো না—

—ভাই, এ সত্য না স্বপ্ন ?

—কেন রে ?

—আজকাল আমার কি যে হয়েছে, কোন্টা স্বপ্ন, কোন্টা সত্যি বুঝতে পারিনে। দুটোতে কেমন যেন জড়িয়ে গিয়েছে।

—না ভাই। ওই সেই দুর্গাপিঁড়ি-পাতা কাঁটালতলা। আমাদের ইতুপুজোর ঘট ওখানে সাজানো আছে। এখন সন্দেহ গেল রাজকুমারী ?

—ঠাট্টা করিস্ নি। আমার ভয়-ভয় করে সর্দনা। কি হয়েছে আমার বলতে পারিস্ ?

—তোর মাথা হয়েছে। নে, আর দুটো মুড়ি আর ফুট্ কলাই ভাজা খা। তুই ভালবাসিস্—
—মনে আছে ?

—থব।

সারাদিন দুই সইএ কত গল্পগুজব কতকাল পরে। সব ভুলে গিয়েছে আশা—সে পবিত্র, পবিত্র। সামনে তার সুদীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। সইএর সঙ্গে গল্পে কত ভবিষ্যৎ জীবনের রঙীন স্বপ্ন আঁকে সে রজনী ডাক্তারের বাগানের বাতাবীলেবুতলার ছায়ায় বসে। শবুরবাড়ী হবে পাড়ারগায়ে বড় গেরস্থ ঘরে, আট দশটা ধানের গোলা থাকবে বাড়ীতে, সে বাড়ীর বো-হিসেবে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাবে গোলার সামনে বেদীতে...ধান মেপে মেপে গোলায় তুলবে। স্বামী হবে উকিল বা ডাক্তার। সারাদিন পরে খেটেখুটে এসে বলবে—ও বড়-বৌ—আলো দেখাও—

বীণা হাসে। সেও তার মনের কথা বলে।

গ্রামের একটি ছেলেকে সে ভালবাসে। যদি তার সঙ্গে বিয়ে হয়—

ও সব কথা কেন ? ও কথা সে শুনতে আসেনি। তবুও সে জিজ্ঞেস করলে—কে ভাই ছেলেটি ?

—ব্রাহ্মণ। সত্যনারায়ণ চাটুয্যের মেজছেলে। তাকে দেখাবো একদিন।

যতক্ষণ সে সইএর বাড়ী রইল, সে হয়ে গেল একেবারে ঠিক তেরো' চোদ্দ বছরের সরলা মেয়েটি। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল। কাঁটালতলার ছায়া পড়লো, রাঙা রোদ একটু একটু দেখা যায় গাছের তলায়। এ সময়ে আশাকে বাড়ী কিরতেই হবেই।

সইকে বল্লে—আমার সঙ্গে একটু এগিয়ে চল্ না আমাদের বাড়ী পর্যন্ত সই ?

—চল্ এগিয়ে দিয়ে আসি—

বাঁশবাগানের তলা দিয়ে অন্ধকার সন্ধ্যার পথে দুই সইএ চলেচে। ওই জামাইবাবুদের বাড়ীটা। বড়দি এতক্ষণ চা করে নিয়ে বসে আছে ওর জন্তে।

বীণা বল্লে—ওই তোদের বাড়ীর দরজাটা—আমি চলি সই। এর পরে একলা যেতে পারবো না—

বীণা চলে গেল অন্ধকার বাঁশবনের পথটা দিয়ে একা একা। আশা সইএর অপস্রিয়মাণ

মুন্ডির দিকে চেয়ে রইল—তারপর যখন আর দেখা গেল না তখন সামনের দিকে চেয়েই ভয়ে ওর বুক কঁপে উঠলো...কি ওখানে ?

ও চীৎকার করে ডাক দলে—ও সেই—ও বড়দি—

ওর সামনে বাড়ীউলি মাসীর দরজা, যে দরজাটা খুলে সকালে আজই পালিয়ে গিয়েছিল লুকিয়ে। ওর চীৎকার শুনে দরজাটা খুলে নেতানারায়ণ ছুপাটি দাঁত বের করে এগিয়ে এসে বলে—বাপের! কি তোমার কাণ্ড! কোথায় গিয়েছিলে সারাদিন ?...

তার পর ওর হাত ধরে টানতে টানতে বলে—চলো, চলো, রাত হয়ে গিয়েছে—শোবে এসো, শোবে এসো...

কতকাল যে কেটে গেল মানিকতলার বাড়ীউলি মাসীর সেই বাড়ীটাতে। তার কোন হিসেব নেই, কোনো লেখাজোখা নেই—আশার মনে হয় বাল্যকাল থেকে তার বিবাহের সময়, তারপর তার সমস্ত বিবাহিত জীবন নিয়ে যতটা সময়ের অভিজ্ঞতা তার আছে—তেমনি কত বাল্যজীবন, কত বিবাহিত জীবন, কত বৈধবাজীবন এবং কত মানিকতলার জীবন তার কেটে গেল—সে কিন্তু সেই এক ভাবেই রইল একই জারগায় স্থব্বৎ অচল।

নেতাদা তাকে ছাড়ে না! কতবার সে পালিয়ে গিয়েছে—জীবনের কত জানা অজানা কোণে। কত বছরের ব্যবধান রচনা করেছে সে বর্তমান জীবনের ও সেই সব অতীত দিনের শান্তি ও পবিত্রতামণ্ডিত অবকাশের।

কিন্তু কোনো ব্যবধান টেকে না।

সব এসে মিশে যায় বর্তমানের এই কলকাতা মানিকতলার বাড়ীউলি মাসীর বাড়ীর দরজায় এই ঘরটাতে, ওই তক্তাপোশটাতে।

এখন যেন তার মনে হয়—এসব যা ঘটেছে, এ আসল নয়, সব যেন অবাস্তব, স্বপ্নবৎ...এ সব ছায়াবাজি...জীবনটাই যেন একটা মস্ত ছায়াবাজি হয়ে গেল তার...

সই, মা, ভাই, বোন, স্বামী, ছেলে-মেয়ে কিছুই নিত্য নয় তার জীবনে...আসে আবার চলে যায়...বাড়ীউলি মাসীর এ বাড়ীটাই কি এদের মধ্যে একমাত্র সত্যি? আর নেতাদা, আর এই স্ক্র রাশ'ঘরটা...আর ওই ছোট ঘরের ছোট তক্তাপোশটা এর কি কোনো শেষ হবে না, এ দিনের এই সব টিকে থেকে যাবে চিরকাল?

কোনটা সত্যি, কোনটা স্বপ্ন আজকাল সে বুঝতে পারে না। যেটাকে সত্যি ভেবে হয়তো আঁকড়াতে যায়—সেটাই মিথ্যে হয়ে স্বপ্ন হয়ে যায়। তার কি কোনো রোগ হোল? এমন সাধের, এমন আদরের, এমন আশা-আনন্দের জীবনের শেষকালে এ কি ঘটলো? কোথায় চলে গেল স্বামী, কোথায় গেল বাপের ভিটে, স্বস্তরের ভিটে? এ কি-ভাবে পাগল বা বুদ্ধিহীন কিংবা রোগগ্রস্ত অবস্থায় সে পড়ে রইল?

নেতানারায়ণ এসে বলে—রাশা করবে না আজ? বসে আছ যে—

—আমি জানিনে। তুমি আমার বিরক্ত করতে এসো না—

—কেন, আজ আবার রাজরাণীর কি মেজাজ হোল ?

—তুমি চলে যাও এখান থেকে—

নেতানারায়ণ ওর কাছে এসে বলে—বড্ড ঠাট্টা কর তুমি মাঝে মাঝে। কোথায় যাই বল তো ? এখন আমি চলে গেলে তুমি থাকবে কি ? রূপের ব্যবসা যে খুলবে, সে আর হবে না। আরনাতে চেহারাখানা দেখেচো এদানিং ?

আবার কি-সব যাচ্ছেতাই কথা। অনবরত অপবিত্র অলীল ধরনের এই সব কথা কেন তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্বদা শুনতে হয়। ও ভেবে ভেবে বলে—আমরা তো মরে গিয়েচি—খাবার আর দরকার কি ?

নেতানারায়ণ ওর দিকে চেয়ে বলে—মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ? তবে খাচ্ কেন ? রোজ রোজ রান্নাবান্না করচো কেন ? বাজার করচি কেন ?

—কেউ খাচ্ছে না। কেউ বাজার করচে না। সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন।

কিন্তু নেতানারায়ণের চোখের বিষয়ের দৃষ্টি এত অকপট যে, নিজের বিবেচনার ওপর আশা আস্থা হারালে। নিজে যা বলতে চাইছিল, শেষ করতে পারলে না। মিনতির সুরে বলে—আচ্ছা নেতাদা, তোমার কি মনে হয় ? এমন কেন হচ্ছে বলতে পারো ? এ সব কি ? সত্যি না স্বপ্ন ?

—তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

—তাই বলে কি তোমার বিশ্বাস ?

—নইলে আবোল-তাবোল বকবে কেন ? *স্বপ্ন কিসের ? আমি রইচি, আমি হাটবাজার করচি, খাচ্ছি দাচ্ছি—সব স্বপ্ন হোল কি ভাবে ? এই ঘরবাড়ী দেখতে পাচ্ছ না ?—বাড়ীউলি মাসী, ও বাড়ীউলি মাসী—শুনে যাও এদিকে। কি বলচে শোনো ও !

—বাড়ীউলি মাসী বলে—কি গা ?

—ও বলচে এ সব নাকি মিথ্যে। তুমি, ঘরবাড়ী, এই বিছানা—সব স্বপ্ন।

—কি জানি বাপু, ও সব তোমরা বসে বসে ভাবো। আমাদের খেটে খেতে হয়, শখের ভাবনা ভাববার সময় নেই। বেলা হোল দুপুর, উঠুনে আঁচ পড়েনি। পালেদের বৌ সেই কোন্ সকালে একবাটি চা খাইয়েছিল ডেকে। যাই—

নেতা ওর দিকে চেয়ে বলে—শুনলে ?

আশা বোকার মত শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে হতাশ ভাবে বলে—কি জানি বাপু। আমার যেন এক এক সময় মনে হয় এ সব স্বপ্ন দেখেচি তুমি আমি। এ ঘর নেই, বাড়ী নেই, খাট নেই, বিছানা নেই—ওই রাস্তা, লোকচলাচল সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন। কেবল তুমি আর আমি আছি—আর এই যে সব দেখছি সব স্বপ্ন দেখেচি আমরা দুজনে।

—বা রে, বাড়ীউলি মাসী এলো, কথা বলে গেল, ও-ও কিছু নয় ?

পরে বিভ্রান্তকে বোঝাবার সুরে সদয়ভাবে বলে—ও সব তোমার মাথার ভুল। সব সত্যি—দেখচো না বাড়ীউলি মাসী এসে কি বলে গেল। একবার তোমাকে হোমিওপ্যাথিক

‘ওযুধ খাওয়াতে হবে। রাত্তিরে ভাল ঘুম হচ্ছে না, না কি ?

আশা বলে—তবে মাঝে মাঝে পাই আবার হারাই কেন ?

অনেকটা অন্তমনস্ক সুরে কথাটা বলে ফেলেই ও চাপতে চেষ্টা করলে। বলে—কি জানি, যা বলচো, তাই বোধ হয় হবে। আচ্ছা আমরা এখানে কতকাল থাকবো ? চলে যাবো এখান থেকে।

—কেন যাবো ? বেশ আছি।

—আমাকে আমার গায়ে রেখে এসো—আসবে লক্ষ্মীটি ?...

নেতা রেগে উঠে বলে—মেরে হাড় গুঁড়ো করবো। সেই শব্দ বাদরটার জন্তে মন কেমন করচে বুঝি ? আমি সব জানি।

—না না, সত্যি না নেতাদা। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি। আমার এখানে থাকতে ভাল লাগচে না। ভয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন এমন জায়গায় এসে পড়েছি, এখান থেকে বেরুবার পথ নেই। এই ছোট্ট ঘরটা, ওই তক্তাপোশটা...এ বাড়ীর যেন চারিদিকে দেয়াল দিয়ে আমাদের কে আটকেচে। এখান থেকে কেউ বেরুতে দেবে না। এ সবও সত্যি নয়, এ সব মিথ্যে, সব ছান্নাবান্নি। যা এই সব দেখছি না ?...সব ভুল।

নেতা ব্যঙ্গের সুরে বলে—আবার আবোল-তাবোল বকুনি ? মাথা কি একেবারে গেল ?

আশা আপন মনেই বলে যাচ্ছিল—এ থেকে তোমার আমার কোনোদিন উদ্ধার নেই। জানো, আমি অনেক চেষ্টা করেছি পালাবার, বাইরে যাবার। কিন্তু পারিনি—কে আবার এই সবার মধ্যে আমার এনে ফেলেচে। অথচ আমি চাই উদ্ধার পেতে এসব থেকে, এখান থেকে অনেক দূরে চলে যেতে—যেখানে এসব নেই। কেন পারিনি জানো ? অনেক চেষ্টা করেছি আমি পালাবার—পারিনি।

আশা অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়লো। নেতা না-বোঝার দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল উদ্ভিগ্ধভাবে।

নেতা নানারকম অত্যাচার শুরু করলো ক্রমে ক্রমে আশার ওপর। ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখে, মারধর তো করেই। বাড়ীউলি মাসী যোগ দিয়েচে নেতাদার দিকে। ওকে বলে—বলুয়, এক মারোয়াড়ী বাবু জুটিয়ে দিচ্ছি—তা হোল না। লোকে কি যার সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার সঙ্গেই ঘর করে চিরকাল ? কত দেখছ আমার এ বয়সে। ওই যে পাশের বাড়ীর বিন্দি, আপন দেওয়ার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল, তা কই এখন ? কোথায় গেল সে রসের নাগর দেওর ? নোয়াঙলা খোট্টা বাবু রাখেনি ওকে ? কেমন ছাপর খাট, গদি, এক পুরুস্তত রূপোর বাসন ! দুপয়সা গুছিয়েচে—

কি বকমারি করেচে আশা। এই কথাবার্তা তার গায়ে ছুঁচের মত বেঁধে আজকাল। কেউ ভাল কথা যদি বলতো ছুটো এখানে। কালি টেলে টেলে তার সারা গায়ে কালি মাখিয়ে দেয় এরা।

কিন্তু কাটলো বহুকাল। অনেক দিন, বৎসর, মাস—অনেক জীবন, জন্ম মৃত্যু যেন জড়িয়ে এক হয়ে গিয়েছে। সত্যিতে স্বপ্নতে জড়িয়ে এক হয়ে গিয়েছে। এমন শক্ত হয়ে পাক জড়িয়ে গিয়েছে এবং আরও যাচ্ছে দিন দিন যে, কেউ খুলতে পারবে না। একদিন সে আকিৎ আনিয়ে নিল পাঁলেদের ছেলের হাত দিয়ে। সেদিন নেতানারণ কোথায় বেরিয়েচে— ভালোই হয়েছে, একেবারে সব যন্ত্রণার অবসান সে আজ করবে। ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে রইল আকিৎ খেয়ে—তারপর ক্রমে কিমিয়ে পড়লো। পেটে কোথায় যেন ভীষণ বেদনা করেছে... সব যন্ত্রণার আজ একেবারে শেষ হবে। সকলের মুখে অল্লীল কথা শুনে হবে না। কিন্তু কোথা থেকে নেতানারণ ফিরে এসে ওর ঘরের দোর ভেঙে খিল খুলে ওর মাথার চুল ধরে সারা বারান্দা হাটিয়ে বেড়াতে লাগলো। কিছুতেই ওকে বসতে দেয় না, গালে চড় মারে— বলে—বসতে চাও? ভ্রাকামি করে আবার আকিৎ খাওয়া হয়েছে—ওটো বৈচে, তারপর তোমার হাড় আর মাস—

বাড়ীউলি মাসী কোন্ ফাঁকে কাছে এসে চুপি চুপি বলে—বম্বু বাপু, দিবি মারোয়াড়ী বাবু জুটিয়ে দিচ্ছি। অমন কত হচ্ছে আজকাল। কেন মিছিমিছি আকিৎ খেয়ে কষ্ট পাওয়া? ...দিবি সুখে থাকবে। ওই পাশের বাড়ীর বিন্দি? ছাপর খাট, কলের গান, বাসনকোসন। ও যে আপন দেওরের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল—

ওর মন আর পারে না। অবসন্ন, ক্লান্ত মন যেন বলে ওঠে—ভগবান, আমি আর পারিনে। আমায় বাঁচাও—এ থেকে উদ্ধার করো—

কে যেন ওর কথা শোনে। আশার স্বপ্নাচ্ছন্ন, অবসন্ন মন বোঝে না কে সে। অনেক-দূরের, অনেক আকাশের পারের কোন্ দেশ থেকে সে যেন উড়ে আসে পাখায় ভর করে। একবার আশার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে যেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী, মহিমময়ী দেবীমূর্তি ভেসে ওঠে। বরাভয়করা, শ্রিতহাস্তমধুরা...অপরূপ রূপসী জ্যোতির্ষ্ময়ী নারী। আর মনে আছে এক সাদা বড় পাহাড়ের ছবি, সবাই মিলে, তাকে ছুঁড়ে যেন সেই সাদা পাহাড় থেকে বহুদূরে নীচের দিকে কেলে দিচ্ছে।

দেবী যেন হাসিমুখে বলেন—যাও, ভাল হও—ভুল আর কোনো না।

কে যেন প্রশ্ন করলে—আশা-বৌদির স্বামীর সঙ্গে মিলবে কি করে? ও তো সব ভুলে যাবে। দেবী বলেন—আমি সব মিলিয়ে দিই। ওরা তো নতুন মানুষ হয়ে চললো, ওদের সাধ্য কি?

তারপর গভীর অন্তলম্পর্শ অন্ধকার ও বিম্বৃতি। অন্ধকার...অন্ধকার।

পুষ্প একদিন সেই নির্জন গ্রহটিতে একা গেল। ওর বড় কৌতূহল হয়েছিল বনকান্তার, অরণ্যানী ও শৈলমালায় পরিপূর্ণ ওই ছায়াভরা গ্রহের জীবনযাত্রা দেখতে।

এবারও রাত্রি নেমেচে গ্রহটিতে।

জীবকুল স্তম্ভ। অপূর্ণ স্বন্দর দেশ। বোধহয় ঐ গ্রহে তখন বসন্ত ঋতু। সেই দিক্‌দিশাহীন অরণ্যে কান্তারে নাম-না-জানা কত কি বন-কুমুদ-সুবাস। বনে বনে ছাওয়া সারা দেশ। বনের গাছপালার মধ্যে দিয়ে বেকে এসে ওর সাথী তারার নীল জ্যোৎস্না পড়েচে। নৈশ পক্ষীকুলের কচিং পক্ষ-বিধ্বন।

গ্রহের দিক্‌বিদিক সে চেনে না। পৃথিবীতে গেলে তবে উত্তর দক্ষিণ দিক বুঝতে পারে। এ গ্রহের লোকে কাকে কোন্‌ দিক বলে কে জানে? কিন্তু এর মাঝামাঝি থেকে একটু বা দিকে বেঁধে এক উত্তম শৈলশ্রেণী বহুদূর ব্যোপে চলে গিয়েছে, অনেক ছোট বড় নদী এই শৈলগাত্র থেকে নেমে চলেচে নীচেকার বনাবৃত উপত্যকায়। দু' একটি বড় জলপ্রপাত বনের মধ্যে।

ওর আকাশে বাতাসে বনে বনানীতে কেমন একটা শুদ্ধ, অপাপবদ্ধ আনন্দ। এর বাতাসে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যে নেবে, সে-ই যেন হয়ে উঠবে আনন্দময় ব্রহ্মদর্শী ভক্ত, ধীর ও নির্লোভ, তৃষ্ণাহীন ও উদার। এর বনতলে জীবের অমরত্বের কথা লেখা আছে, লেখা আছে এ বাণী যে এই বনতলে তাঁর আসন পাতা। উচ্চ জগৎ বটে।

হঠাৎ ও দেখলে একটি বনপাদপের তলে শিলাসনে স্বয়ং কবি ক্ষেমদাস বসে।

ও দেখে বড় খুশি হয়ে কাছে গেল। ক্ষেমদাস বল্লেন—এসো এসো, যিনি আদি কবি, বিশ্বস্রষ্টা, তাঁর বিষয়ে আমি কবিতা রচনা করছি।

—আপনি এ গ্রহ জানেন?

—কেন জানবো না? এরকম একটা নয়—দীর্ঘ বনফুলের মাংলার মত একসারি গ্রহ আছে বিশ্বের এ অংশে। আমি জানি। তবে এখানে আসতে হয় যখন এ গ্রহে রাত্রি।

—কেন?

—এখানকার লোক উচ্চশ্রেণীর জীব। ওরা আমাদের দেখতে পাবে দিনের আলোয়। এখন ওরা স্তম্ভ। ব'সে ওই শিলাসনে। বেশ লাগে এখানে। লোকালয় এ গ্রহে খুব কম। বনে হিংস্র জন্তু নেই। কেমন নীল জ্যোৎস্না পড়েচে দেখেচ? বড় ভালবাসি এ দেশ।

—আপনি এখানে আসেন কেন?

—একটি তরুণ কবি আছে এ গ্রহে, তাকে প্রেরণা দিই। ভগবদ্ভক্ত। এই শিলাসনেই সে ধানিক আগেও বসে ছিল। প্রতি রাতে নির্জনে এসে বসে। সৃষ্টির এ সৌন্দর্যের স্তবগান রচনা করে। ওই তার উপাসনা। তুমি জানো আমারও ওই পথ। তাই তার পাশে এসে দাঁড়াই।

—তিনি দেখতে পান আপনাকে?

—না। আমাকে বা তোমাকে দেখতে পাবে না। তোমার সঙ্গী যতীনকে দেখতে পেতো। সে এখন কত বড় ছেলে?

পুষ্প সলজ্জভাবে বল্লেন—ন'বছরের বালক।

ক্ষেমদাস হেসে বলে—আবার নব জন্মলীলা। বেশ লাগে আমার। আবার মাতৃকোড়ে যাপিত শৈশব। চমৎকার।

পুষ্প হেসে বলে—সন্ন্যাসী এখানে উপস্থিত থাকলে আপনার কথা যেমনে নিতেন ?

—জানি সে বলে বার বার দেহ ধারণ করা মুক্তির পথে বাধা। সে বলে ও থেকে উদ্ধার নেই। সেই একই জীবনের পুনরাবৃত্তি, চক্রপথে উদ্বেগহীন গতগতি। সেই একই লোভ, তৃষ্ণা, অহঙ্কার নিয়ে বার বার অসার জন্ম ও মরণ। এই তো ?

—কথাটা কি মিথ্যে ?

—না। মানি। কিন্তু সে কাদের পক্ষে ? যারা জীবনের উদ্বেগকে খুঁজে পাননি বা ভগবানের দিকে চৈতন্ত প্রসারিত করেনি তাদের পক্ষে। যারা জানে না স্থূল দেহের পরিণাম ধূমভস্ম নয়, জন্মের পূর্বেরও সে ছিল, মৃত্যুর পরেও সে থাকবে, ভুলোকে শুধু নয়, ব্রহ্ম থেকে জীব নেমে আসতে যে সাতটি চৈতন্তের স্তর আছে, এই সাত স্তরের প্রত্যেকটি স্তরে এক একটি লোক, সে এই সব লোকেরই উত্তরাধিকারী, ভগবানের সে লীলা-সংচর। যারা এ কথা জানে না, জানবার চেষ্টা করে না, জেনেও গ্রহণ করে না বিষয়ের গোঁহে—তাদের পক্ষে সন্ন্যাসীর কথা পরম সত্য। কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

পুষ্প একমনে শুনছিল। এই পবিত্র গ্রহের তপোবনসদৃশ অরণ্যকান্তারে এ দেশের ঋষিকবির যথানে নিদ্রাহীন গভীর রাত্রে ভগবানের স্তবগাথা রচনা করেন—এ গ্রহের উপনিষদ জন্ম লাভ করে তাঁদের হাতে—এই স্থানই ক্ষেমদাসের উপদেশ উচ্চারিত হবার উপযুক্ত বটে। পুষ্প ব্যগ্রস্বরে বলে—বলুন, দেব, বলুন—

ক্ষেমদাস আবার বলেন—তবে বিদিত্যতিমুতামেতি—যে তাঁকে জেনেচে সে দেহধারণ করেও মুক্ত, যেমন দেখেছিলে সন্ন্যাসীর গুরুভ্রাতাকে, বন-মধ্যস্থ সেই সন্ন্যাসীকে। ষাঁদের চৈতন্ত জাগ্রত হয়েছে, দেহ থেকেও তাঁরা জীবমুক্ত। ভগবানকে যারা ভালবাসে মনপ্রাণ দিয়ে, দেহধারণ করেও তারা জীবমুক্ত। তাঁরা জানেন এই বিশ্বের সমস্ত গ্রহ, সব তারা, সব বসন্ত, সব জীবলোক আমার। আমি এদের মাধুর্য উপভোগ করবো। তাঁর সৌন্দর্যের স্তবগান রচনা করে যাবো। আমি তাঁর চারণ-কবি। আমি ছাড়া কে গান গাইবে এই বিশ্বদেবের অনন্ত সৌন্দর্য-শিল্পের ? তাঁর গান গেয়েই যুগে যুগে অমর অজর হয়ে আমি বেঁচে থাকবো। শত জন্মের মধ্যেও যদি তাঁর সেবা করে যাই আর আসি আমার তাতে ক্ষতি কিসের ?

ক্ষেমদাস চুপ করলেন।

পুষ্প বলে—এ দেশের সেই কবিকে দেখা যায় না ?

—এতক্ষণ সে ছিল এখানেই। সেও ভগবানের চারণ-কবি। এই প্রকৃতির সৌন্দর্যের সে স্তবগীতি রচনা করে। সে এখন যুঁমিয়েচে।

—বিবাহিত ?

—এ দেশের নিয়ম বৃষ্টি না। স্ত্রীলোকদের অদ্ভুত স্বাধীনতা এখানে। তারা যার ঘরে

যতদিন ইচ্ছা থাকে। আবার সেখানে সভ্যতার প্রেম আছে, সেখানে পৃথিবীর স্বামী-স্ত্রীর মত আজীবন বাস করে। আমাদের কবির সঙ্গে তিন চারটি নারী থাকে—কিন্তু তারা কেউই পৃথিবীর তুলনায় স্নন্দরী নয়। এদেশের মেয়েরা স্নন্দরী নয়। অবশ্য নারী তিনটির সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক জানি না। এদেশে হয়তো তাতে দোষ হয় না। যে দেশের যে নিয়ম।

ওরা কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলো বনের মধ্যে গাছতলাতে দু-তিনটি লোক নিদ্রিত। ক্ষেমদাস বল্লেন—ওই ঝাণ্ডো কবি শুয়ে। ঐ পাশেই তিনটি নারী।

পুষ্প আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—গাছতলাতে কেন সবাই?

—এখানে লোকের ঘরবাড়ি নেই পৃথিবীর মত। ওদের দেহ অন্ত ভাবে তৈরী। রোগ নেই এখানে, হিংস্র জন্তু বা সর্প নেই। দেহের কোনো ক্ষতি হয় না। অল্প আয়ু বলে ঘরবাড়ি করে না কেউ।

—তবে মরে কিসে?

—এরা যেচ্ছামৃত্যু। জানী ও নিস্পৃহ অত্মা কিনা! নির্দিষ্ট সময় আস্তে যেদিন হয় এরা মৃত্যুর জন্তে প্রস্তুত হবে। মন যেদিন এদের তৈরী হবে সেদিন যেচ্ছায় দেহত্যাগ করবে। মৃত্যুতে এরা শোক করে না। এরা জানে মৃত্যু দেহের পরিবর্তন মাত্র।

—পুনর্জন্ম?

—এখানে যারা জন্ম নেয়, তারা অনেক জন্ম ঘুরে এসেচে। পৃথিবীতে বহু জন্ম কেটেচে এদের। শেষ জন্ম এখানে কাটায়। তার পরেই মহর্লোকে চলে যায় একেবারে, আর করে না। কিন্তু তুমি একটা কথা বোধ হয় জানো না—পৃথিবীর চেয়ে নিকৃষ্টতর গ্রহও অনেক আছে। নিম্ন-শ্রেণীর আত্মাদের পুনর্জন্ম অনেক সময় ওই সব নিকৃষ্টতর লোকে হয়।

—সে সব স্থান কি রকম?

—একটাতে তোমাকে এখুনি নিয়ে যেতে পারি। চোখেই দেখবে, না কানে শুনেবে? তবে একটা কথা। সে সব দেখে কষ্ট পাবে। মেয়েমানুষ তুমি, সে সব গ্রহলোক দেখলে তোমার মনে হবে ভগবান বড় নিষ্ঠুর।

চক্ষুর পলকে ওরা একস্থানে এসে পৌঁছলো। সে স্থানটির সর্বত্র উষর মরুভূমি ও কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর স্তূপ। কিন্তু সে স্তূপ প্রস্তর নয়—তা কি, পুষ্প জানে না। উল্লঙ্গ বিকটদর্শন অর্দ্ধমহুগ্ধাকৃতি জীব ছ' একজনকে সেই কৃষ্ণবস্ত্র স্তূপের ওপর বসে থাকতে দেখা গেল। মাঝে মাঝে তারা উঠে মাটির মধ্যে হাত দিয়ে গর্ত খুঁড়ে কি বার করচে ও পরম লোলুপতার সঙ্গে মুখে পুরচে।

ক্ষেমদাস বল্লেন—চলো এখান থেকে। ওরা কীটপতঙ্গ খুঁজে থাকে। ওই ওদের আহার। ওই ওদের আহার সংগ্রহ রীতি। একজনের বস্ত্রস্তূপে আর একটি জীব যদি আসে, তবে দুই জীবের মারামারি করবে। এ একে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে। এ জগতে স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, দয়া, সেবা, স্থায়-বিচার, শিক্ষা, সংগীত কিছু নেই। আছে কেবল হৃদ্যন্ত আহার-প্রচেষ্টা। জীবের জীবের কলহ।

পুষ্প বলে—চলুন এখান থেকে। হাঁপ লাগচে। কি জড় পদার্থে গড়া এ দেশ, প্রাণ যেন কেমন করে উঠলো। এও কি ভগবানের রাজ্য? উঃ—

ক্ষেমদাস হেসে বলেন—এখনও দেখোনি। চলো আরও দেখাই—এর চেয়েও ভয়ানক স্থান দেখবে। যেখানে পিতামাতা পুত্রকন্যার সম্বন্ধ পর্যন্ত নেই। যেখানে—না সে তোমাকে বলব না!

পুষ্প অধীর ভাবে বলে—কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলেন? উঃ—বলেই সে ঝরঝর করে কঁদে ফেললে। হাত-জোড় করে বলে—আমার একমাত্র সম্বল ভগবানে ভক্তি, আর আমার কিছু নেই জীবনে। দেব, দয়া করে সেটুকুও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না—কৃপা করুন—আমি নিতান্ত অভাগিনী!

ক্ষেমদাস হেসে বলেন—পাগল! সেই অনন্ত মহাশক্তির এক দিকই কেবল দেখবে? রুদ্ধদেবেয় বাম মুখ দেখলেই ভক্তি চটে যাবে অত ঝুঁকো ভক্তি তোমার অন্তত সাজে না। তুমি আমি তাঁর উদ্দেশ্যের কতটুকু বুঝি? চলো কিরি। ওই জন্তু আনতে চাইনি তোমাকে এখানে। এতেই এই, এর চেয়েও নিকৃষ্ট লোকে নিয়ে গেলে—

—না দেব। আমার পৃথিবীতে অন্তত নিয়ে চলুন। আমাদের পৃথিবীতে—চলুন গঙ্গাতীরে—

মহাশূন্ত বেয়ে সেই মুহূর্তে ওরা এসে পৃথিবীতে একস্থানে বৃক্ষতলে দাঁড়ালো। বর্ষাকাল পৃথিবীতে, ভীষণ ঝুটি হচ্ছে। স্থানটা পাহাড়ে ঘেরা, পাহাড় ঝাপসা হয়ে গিয়েছে ঝুটির ধারায়।

ক্ষেমদাস বলেন—নিষে এলাম গঙ্গাতীরে। ওই অদূরে গঙ্গা—

—এটা কোন্ স্থান?

—হরিদ্বার।

পুষ্পের চোখ জুড়িয়ে গেল ধারামুখর অপরাহ্নের বহুপরিচিত, অতি প্রিয় শোভায়। তার মন বলে উঠলো—এই তো আমাদের পৃথিবী, আমাদের স্বর্গ। ভগবান এখানে কত ফুলে ফলে নিজেকে ধরা দেন, কত জ্যোৎস্নার আলোয়, কত অসহায় শিশুর হাসিতে। আজ চিনলাম তোমায় ভাল করে, আমাদের মাটির স্বর্গকে, আর চিনলাম মানুষকে। মানুষই মাটি দিয়ে গড়া দেবতা—তুদিন পরে সত্যিকার দেবতা হয়ে যাবে। জয় নীলারণা-কুস্তলা অতল-সাগর-মেখলা চিরসুন্দরী সুন্দরী পৃথিবীর। জয় জয় মানুষের। জয় বেগুবংশিহরিতা দিগন্তলীন-প্রান্তর-শোভিতা ভূতধাত্রী মাতার।

ক্ষেমদাস বলেন—এবার তোমার মন শান্ত হয়েছে। বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এখন একটা কথা বলি। কি দেখে অস্থির হয়ে উঠলে?

পুষ্প সলজ্জ হেসে চুপ করে রইল। ক্ষেমদাস বলেন—না, বলে, বলতেই হবে। ভগবান কি নিষ্ঠুর—এই ভেবেছিল। না?

—হাঁ!

—তিনি কি নিষ্ঠুর—ওঃ! এই তো?

পুষ্প হাসি-হাসি মুখে নির্ঝাঁক।

ক্ষেমদাস বলেন—তোমার মত মেয়েরও বিস্মৃতি? তোমারও ভুল? একেই বলে মোহিনী মায়া। মায়ায় কে না ভোলে? ব্রহ্মা বিষ্ম তলিয়ে যান।

—কেন দেব, বলুন!

—না, তাই দেখি। নতুবা তোমারও ভুল!

—থাক্ আমার ব্যাখ্যা। আমি তুণের চেয়েও হীন। আপনি কি উপদেশ করছেন, তাই করুন না?

ক্ষেমদাস হাসিমুখে বলেন—ভগবান কার উপর নিষ্ঠুর হবেন? সবই তো তিনি। নিজেই নিজের লীলায় তন্ময় হয়ে আছেন বিভিন্ন রূপে। তিনিই সব। সে জ্ঞান যেদিন হবে সেদিন ওই নিকৃষ্ট লোকের নিকৃষ্ট জীব দেখেও বলে উঠবে আনন্দে—তেজো যৎ তে কল্যাণতমং তন্তে পশ্যামি, যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহংমস্মি—

ক্ষেমদাস চলে গেলেন। যাবার সময় বলেন—বৃন্দাবন থেকে ঘুরে আসি। তোমার সঙ্গে আবার শীঘ্রই দেখা করবো—একদিন চलो সেই সন্ন্যাসিনীর কাছে যাবো।

পুষ্প স্থির ভাবে বসে রইল শৈলশিখরে। এখানে তার যত্না আছে, কত জন্মের প্রিয় সাথী সে। তাকে কেলে কোথায় কোন্ লোক গিয়ে সুখ পাবে সে? একটি গোয়ালার মেয়ে দুধ ছুরে নিয়ে আসচে বাজারে। নরনারী প্রদীপ ভাসাচ্ছে গঙ্গাবক্ষে। দূর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে জলের ওপর।

বুড়শিবতলার পুরানো ঘাটের সামনে গঙ্গাবক্ষে পালতোলা নৌকোর দল চলেচে। গোখুরিরা আবছারা আকাশে শুভ্রপক্ষ বকের দল উড়ে চলেচে ওপারে হালিসহরের শ্রীমা-সুন্দরীর ঘাটের দিকে। প্রাচীন দেউলমন্দিরের চূড়া শঙ্কা দিগন্তের বননীল-রেখায় এখানে ওখানে যেন মিশে আছে।

পুষ্প ঘাটের রানায় বসে ক্ষেমদাসের সঙ্গে কথা বলছিল।

ক্ষেমদাস বৃন্দাবন থেকে এইরাত্রি ফিরেচেন। জ্যোৎস্নারাত্রি যমুনাতীরে কিছুক্ষণ বসে ছিলেন চীরঘাটের কাছে। আরতি দর্শন করবার পরে। মন ভ্রাম্যন্দে বিভোর।

পুষ্প বলে—কবি ক্ষুটিকের কথা কি বলছিলেন?

ক্ষেমানন্দ গঙ্গার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেন—ওই তাখো, রাঙা আকাশের ছায়া পড়েচে জলে। জল যদি ঘোলা হোত, আকাশের ছায়া পড়তো না। ক্ষুটিকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নির্মল হতে হবে, তবে আলো তার মধ্যে দিয়ে আসবে।

—অর্থ্যাৎ?

—অর্থ্যাৎ আত্মাতে যদি এতটুকু ক্রটি থাকে কোথাও, তবে ভগবানের আলো তার

মনে নামে না। সম্পূর্ণ নির্মল ক্ষটিক হওয়া চাই, এতটুকু খুঁৎ থাকলে চলবে না।

—ভগবানের দাবি এত বেশি কেন ?

—উপায় নেই। ভগবানের আলো যদি মনের দর্পণে ঠিক অখণ্ড ভাবে পেতে কেউ চায়, তাঁর জন্তে এই ব্যবস্থা। লোকে মুখে বলে সাধুতা ও পবিত্রতার কথা। কিন্তু জেনো এ দুটি বস্তু অতি ভীষণ, ভয়ঙ্কর।

পুষ্প বলে—বুঝতে পারছি কিছু কিছু। নিজের জীবনে দেখচেন কি ? তবুও বলুন।

—সাধুতা, পবিত্রতা—শুনতে খুব ভালো। কিন্তু এদের আবির্ভাব বিষয়ী লোকের পক্ষে কষ্টকর। কামনাকলুষিত আধারে ভগবানের জ্যোতি অবতরণ করবে কি ভাবে ? এ জন্তে আধার-শুদ্ধির প্রয়োজন। যাকে ভগবান কৃপা করেন, শুদ্ধ আধার করে নিতে তার সব কিছু ভোগ কামনার জিনিস ধ্বংস করে তাকে নিঃস্ব, রিক্ত করে দেন। ভগবানের কৃপা সেখানে বজ্রের মত কঠোর, নির্ধাম, ভয়ঙ্কর। সর্বনাশের মৃতি ধরে তা আসে জীবনে, ধ্বংসের মৃতিতে নামে। সে রকম কৃপার বেগ সামলাতে পারে ক'জন ?

পুষ্প চুপ করে রইল। এর সত্যতা সে নিজের জীবনে বুঝেছে।

ক্ষেমদাস বলেন—জাখো, আমি ভক্তিপথের পথিক, তুমি জানো। সন্ন্যাসী যে নিগূর্ণ ব্রহ্মের কথা বলে, তাঁকে বুঝতে হোলে জ্ঞানের পথ দরকার। জ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় না। আমি সাকারের উপাসক, মধুর ভাবে মধুর মৃতিতে তাঁকে পেতে চাই—তাই আমি বৃন্দাবনে গিয়ে সেই রস আবাদ করি। সন্ন্যাসী বলে, ও সব অপ্রাকৃত মূর্তির উপাসনা কর কেন ? আমি বলি, তোমার নিজে তুমি থাকো, আমার নিজে আমি থাকি। ও বলে, ব্রহ্ম আবৃত্তি হতে হতে জীব হয়েচে, জীব হয়ে স্বরূপ ভূলে গিয়েচে। ব্রহ্ম দেশ-কালের মধ্যে ধরা দিয়ে জীব হয়েচে। কেন হয়েচে ? লীলা। আমি বলি, বেশ, এক যখন বহু হয়েচেন লীলার আনন্দকে আনন্দ করতে, তখন আমিও তাঁর লীলাসহচর তো ? আমাকে বাদ দিয়ে তাঁর লীলা চলে না। এই তো প্রেমভক্তি এসে গেল। কেমন ?

পুষ্প বলে—বনের সেই সন্ন্যাসিনী কিন্তু প্রেমভক্তির কাঙাল। আমি সেবার রঘুনাথদাসের আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলাম, বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়েছিলাম—সেই থেকে গোপাল-বিগ্রহের ভক্ত হয়ে উঠেচেন।

—সে যে মেয়েমানুষ। শুদ্ধ জ্ঞানপথে সে তৃপ্তি পায় না—লীলারস আনন্দ করতে চায়। আমি চললাম খুকি, তুমি আজ তো বৃন্দাবনে গেলে না, কাল এসে নিয়ে যাবো। সন্ন্যাসী তোমাকেও কি বলেছিল না ?

—বলে'ছিলেন, এখনও এ অপ্রাকৃত লোক আঁকড়ে আঁছে কেন ? তোমার তো উচ্চ অবস্থা, উচ্চস্তরে চলো।

পৃথিবীর হিসেবে আজ কয়েক বছর হোল পুষ্প এই স্বরচিত বুড়োশিবতার ঘাটে সম্পূর্ণ এক। করুণাদেবী ও ওকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তত উচ্চস্তরে গমন করলে আর সে পৃথিবীতে যাতায়াত করতে পারবে না বলেই এই গঙ্গার ঘাট আঁকড়ে পড়ে আছে। এই তার পরম তীর্থ—তার মহলোক, জন-লোক, তপোলোক, সত্যলোক, ব্রহ্মলোক—লোকাভীত পরমকারণ পরব্রহ্মলোক। কোথাও পোষাবে না তার। কত সহস্র স্মৃতিতে ভরা এই প্রাচীন ভাঙা ঘাটটি।

কেউ নেই আজ এখানে।

যতীনলা চলে গিয়েচে আজ দশটি বছর।...

উজ্জ্বল যতদূর দৃষ্টি যায়—আজ এতকাল পরে তার কাছে শূন্য অর্থহীন!

এক এক সময়ে মনে হয় সেই ভ্রাম্যমাণ বহুদক দেবতা যদি আসেন! তাঁর মুখে বহু জগতের, বহু নক্ষত্রলোকের, বহু বিশ্বের গল্প শোনে। নিজে তিনি বেড়িয়ে দেখেচেন, এখনও দেখেচেন—শেষ করতে পারেন নি।

সন্ন্যাসী এসে প্রায়ই বলেন—মহলোকে তোমার আসন, এখানে কি নিয়ে পড়ে আছ কন্তে? সেই পৃথিবীর গঙ্গা, পৃথিবীর হালিসহর সাগর, নৌকো—এসব মায়িক কল্পনা তোমার সাজে না। ছি ছি—

পুষ্প সর্কোতুকে বলেছিল—নিয়ে যান না তাঁর চেয়েও উচ্চতর লোকে, যাচ্ছি এখনি।

সন্ন্যাসী বলে—জ্ঞান থাকবে না বেশিক্ষণ। কারণ এসব লোক আত্মিক অবস্থা মাত্র। কোনো স্থান নয়। সে উচ্চতর চৈতন্য জাগ্রত হোলে পৃথিবীতে জড়দেহধারী হলেও তুমি সত্যলোকের অধিবাসী। যেমন দেখেছিলে আবার সেই গুরুভাতাকে। চিদানন্দময় আত্মা সেখানে আপনার অস্তিত্বের আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে এক সুরে গাঁথা। মুখে বলা যায় না সে অমূল্যভূতির কথা।

পুষ্প বলে—বৃদ্ধবার ক্ষমতা নেই আমার দেব। তবে শুনলাম বটে। আপনার দয়া।

—বিধাতৃপুরুষদের ও উচ্চস্তরের দেবতাদের দেখা পাওয়ার জন্তে তপস্তা করতে হয় জানো তো? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাতজন বিধাতৃপুরুষ আছেন, এঁদের ওপর ঈশ্বর। বিধাতৃপুরুষেরা ইচ্ছা করলেই ভগবানের লোকে যেতে পারেন না—গেলে জ্ঞান হারিয়ে কেলেন। এজন্তে তপস্তা দ্বারা শক্তি অর্জন করতে হয়—তবে সেই সাময়িক তপস্তার সাময়িক শক্তি নিয়ে ঈশ্বর সমীপে যেতে পারেন। অথচ বিধাতৃপুরুষেরা স্থিতি স্থিতি প্রলয় করছেন।

—ভগবান তবে কি করছেন, তিনি কি হুঁটো জগন্নাথ?

—তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, কন্তে। একটা তৃণও নড়ে না তাঁর ইচ্ছা না হোলে।

—তিনি দয়ালু? ডাকলে সাড়া দেন?

—এখনও এ সন্দেহ? এইজন্তে আমি বলি, প্রার্থনা ক'রো না তাঁর কাছে কিছু। প্রার্থনা করলেই তিনি মঞ্জুর করেন। তিনি পরম করুণাময়। জীবের দুঃখ দেখে থাকতে পারেন না। হয়তো এমন অসঙ্গত প্রার্থনা করে বসলে, যা মঞ্জুর হোলে তোমার আত্মার অমঙ্গল।

এইজ্ঞে কিছু চাইতে নেই তাঁর কাছে—তিনি আমাদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে সব কিছু করে যাচ্ছেন বা বিধাতাপুরুষদের কর্ত্রে সম্মতি দিয়ে যাচ্ছেন। এইজ্ঞে অনেক সময় ভগবানকে নিঃশব্দ বলে মনে হয়। জীবের কল্যাণের জ্ঞে তিনি ব্যবস্থা করতেন, আমাদের তা মনঃপূত হচ্ছে না।

—ক্ষেমদাস তাই বলেন।

—কে? আমাদের কবি? ওর কথা বাদ দাও। আজ এত বছরেও ওর ভাবানুভূতি ওকে ছেলেবেলার ওপরে উঠতে দিলে না! গোপাল আর বুদ্ধাবন, আর আরতি, আর চোখের জল—আর তাঁদের আলো...

সন্ন্যাসী সেদিন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পুষ্পের হাসি পায় তাঁর সব কথা ভেবে। মেয়েমানুষের মনের কথা এরা কি করে জানবে? শূদ্র, বৃদ্ধ আত্মা ওরা—ব্রহ্মের মত হয়ে গিয়েছে। শত স্নেহ প্রেম প্রীতির বাধনে যে মেয়েমানুষের মন বাঁধা। এও সেই বিধাতা-পুরুষদেরই গড়া নিয়ম তো, সৃষ্টিছাড়া কিছু নয়।

পৃথিবীতে কি সন্ধ্যা হয়ে এসেছে?

পুষ্প একবার নীচের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর পৃথিবীর সন্ধ্যার দেহ মিলিয়ে নেমে এল কোলা-বলরামপুর গ্রামে। যতীনের মা রান্নাঘরে মধ্যে ভাত চড়িয়ে উজ্বনের পাশে বসে আলুবেগুন কুটচে। সে আর ঠিক তরুণী নয় এখন, বিগত-যৌবনের চিহ্ন সারা দেহে পরিস্ফুট। নতুন ধান এসেছে সামনের উঠানে, শীতের সন্ধ্যা, পাশের বাড়ীর আমতলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আগুন জ্বলে পোয়াচ্ছে।

যতীনের মা রান্নাঘর থেকে বলে—ও অভয়—কোথায় গেলি?

পাশের বাড়ীর আমতলার যে সব ছেলেমেয়ে আগুন পোয়াচ্ছে, তাদের ভেতর থেকে একটি আট-ন' বছরের বালক উত্তর দিলে—কেন, কি হয়েছে?

—ঠাণ্ডা লাগাস্ নি বাইরে। ঘরের মধ্যে আর।

বালকের এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সমবয়সীদের মজলিস ছেড়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকতে। সে বলে—আমি বাইরে বসে ধান চৌকি দিচ্ছি যে—

—না, তোমার ধানচৌকি দিতে হবে না। চলে আর ঘরে। এই উজ্বনের পাড়ে বসে আগুন পোয়া। ছেলের লেগেই আছে সর্দি কাসি—আবার রাত পজ্জন্ত বাইরে বসে থাক।

আর একটি ছেলে ওকে বলে—যা, কাকিমা বকবে—

অভয় মুখ ভার করে মায়ের কাছে উজ্বনের পাশে এসে বসলো। ওর মা বলে—সেই গরম জামাটা আজ গায়ে দিস্ নি?

—আহা হা—সে তো ছেঁড়া!

—তা হোক, নিয়ে আর, বড্ড শীত পড়েছে।

—না মা।

অভয়ের মা ছেলের গালে এক চড় কসিয়ে দিয়ে বলে—তোমার একগুঁয়েমিগিরি ঘুটিয়ে

দেবো আমি একেবারে। দুষ্টু ছেলে—এখনি বলবেন, মা আমার জ্বর এসেচে—তখন নিয়ে এসো সাবু, নিয়ে এসো ওষুধ—বা নিয়ে আর জামা, মাকের ঘরের আনলায় আছে—

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বলে—ও যতুদা, কেমন মজা? এ আমি নয় যে এককণ্ঠ্যেমি করে নিস্তার পাবে—

পুষ্প এই সময়টা মাঝে মাঝে এখানে এসে কাটায়। অভয়ের মা ছেলেকে খাওয়ার, কাছে বসে পড়ায়—প্রথমভাগ, ধারাপাত—পুষ্প বসে বসে দেখে। বেশ লাগে ওর।

স্বপ্নের মত মনে হয় সংসারের জীবন মৃত্যু...সন্ন্যাসীই জ্ঞানী, সব মায়া আর স্বপ্ন।

আশা বৌদিকেও একদিন সে দেখে এসেচে। সে এখন বহু দূর মুরশিদাবাদ জেলায় এক মাঝারি গোছের গেরস্তবাড়ীর ছোট একবছরের খুকি।

সে করুণাদেবীকে বলেছিল সেদিন—এরা মিলবে কি করে দেবী? কি করে জানবে এরা?

দেবী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—ওদের সাধ্য কি? আমরা সে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবো সময় এলে। দেখতেই পাবি, পুষ্প।

অভয়ের মা ছেলেকে বাইরে দাইয়ে পাশের ঘরে ঘুমতে পাঠায়। পুষ্প এসে সেই সময় খোকার শিররে এসে বলে—খোকা ঘুমল পাড়া জুড়ুল, ঘুমোও যতুদা, ঘুমোও—দুষ্টুমি করলে মায়ের হাতের চড় মনে আছে তো?

অভয় ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো এক একদিন কোনো রূপসী দেবীর স্বপ্ন দেখে, মায়ের মত স্নেহে তার শিররে বসে ঘুম পাড়াচ্ছে। মায়ের মতই বলে মনে হয় তাকে।

নৈশ আকাশ দিয়ে তারপর পুষ্প উড়ে চলে যায় তার নিজ লোকে। অগণ্য জ্যোতির্শৃঙ্খল, অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড মহাব্যোমে সর্বত্র ছড়িয়ে,—অগণ্য জীবকুল, অগণ্য জীবনমৃত্যুর প্রবাহ।

পুষ্পের মন বলে ওঠে—কোথায় আছ হে কার্ণার্ববশায়ী মহাবিশ্ব, মহাদেবতা, মুখের আবরণ অপসারণ কর—অপারুণ, অপারুণ আমরা তোমার স্বরূপ দেখি—ধ্বং কর আমাদের জন্মমরণ, দয়ালু দেবতা!

স্বর্গ ও মর্ত্তের সেই মোহনায় পুষ্প এসে দাঁড়ালো।

ওর কিছুদূরে নীল শূন্য আঙনের লেখা এঁকে বিরাট এক ধ্বংসাত্মক অগ্নিপুচ্ছ ছলিয়ে নিজের গৌ ভরে চলে গেল।—সে মহামর্ত্তের হিসেব নেই। ওদের পায়ের তলায় কোন গ্রহের এক নদীতীর, হয়তো বা পৃথিবীরই—শাস্ত্র অপরাহু, একদল সাদা বক মেঘের কোলে কোলে উড়চেন নলখাগড়া বনের উক্কে আকাশে।

আজ পুষ্প যেন দেখতে পেলে সেই দেবতাকে—নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় ভাসানো এই অপূর্ণ জীবন-উল্লাসের শ্রোতে সে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভেসে চলেচে যে মহাদেবতার ইচ্ছিতে। কোথায় যেন তিনি মহামুগ্ধিমগ্ন, তাঁর অপূর্ণ স্নন্দর মুখখানি, স্নন্দর চোখ দুটি ঘূমে অচেতন। কি স্নন্দর দেখাচ্ছে সেই স্বপ্নালসনির্মীলিত আয়ত চোখ দুটি! পুষ্প বলে—উনি উঠবেন কখন? চরণ বন্দনা করি।

পুষ্পের মনের মধ্যে থেকেই প্রশ্নের উত্তর এল—উনি ওঠেন না। অনন্ত শয্যার অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন উনি। এক এক নিশ্বাসে যুগযুগান্ত কেটে যায়। তুমি ওঁর চরণ বন্দনা করবে? ওঁর উপাসনা হয় না। কে করতে পারে ওঁর উপাসনা? উনি কাউকে দেখেন না, কারো উপাসনা গ্রহণ করেন না। বিশ্বজগৎ ওঁর স্বপ্ন—উনি ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে জগৎস্বপ্ন লয় হয়ে যাবে যে! সৃষ্টি অস্তুহিত হবে। কিন্তু তা হয় না—সৃষ্টিও অনন্ত, ওঁর সৃষ্টিও অনন্ত। উনিই বিশ্বের আদি কারণ—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। স্বীকৃতদশয়নশায়ী মহাদেবতা ব্রহ্মাণ্ডের। তুমি আমি, স্বর্গ নরক, জন্ম মরণ, দেব দেবী, ঈশ্বর, পাপ পুণ্য, দেশ ও কাল—সবই তাঁর স্বপ্ন। সব তিনি। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই—কে কার উপাসনা করবে? ওঁর স্বপ্ন ছাড়া আর উনি ছাড়া আর কি আছে?

ভক্তিরে প্রণাম করলে পুষ্প। উপাসনা হয় না তো হয় না।

ঘন ঘুমে অচেতন সেই দেবদেবের স্নানর চোপ দুটি, স্বর্গ ও মর্ত্যের দূরতম প্রান্তে, শুকতারার অন্তপথে, ছায়াছবির মত মিলিয়ে গেল।